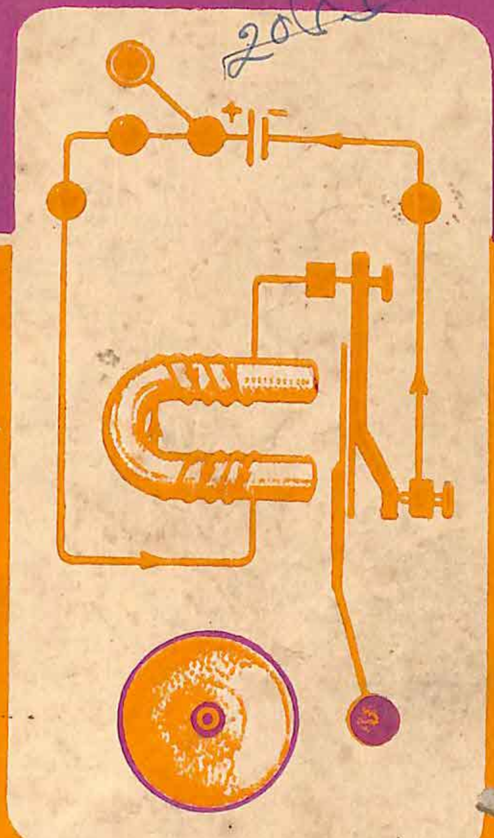


সরল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান





অভিনব প্রকাশন

সুখেন্দু মাইতি



পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রবর্তিত সিলেবাস অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যরূপে অনুমোদিত।

[Vide T.B. No. Syll/76/VIII/PS/40, dated 30. 12. 76]

সরল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

(অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য)

সুখেন্দু মাইতি, বি. এস্‌-সি. (অনার্স), বি. টি.
সহকারী প্রধান শিক্ষক, স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্যায়নভিত্তিক পরিমার্জিত
ত্রয়োদশ সংস্করণ—১৯৯০

অভিনব প্রকাশন
৩০এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক
সরস্বতী সাউ, বি. এস-সি.
৩০এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৭৪
সংশোধিত সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৭৬
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭
দ্বাদশ সংস্করণ ঃ মার্চ, ১৯৮৯
পরিমার্জিত ত্রয়োদশ সংস্করণ ঃ এপ্রিল, ১৯৯০

মূল্য ঃ পনেরো টাকা মাত্র

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুখবন্ধ

নতুন বছর নিয়ে আসছে নতুন পাঠ্যসূচী—সেই সঙ্গে আনছে শিক্ষক, ছাত্র এবং অভিভাবকদের মনে উদ্বেগ। পঠনীয় বিষয়গুলি কোথাও সংকুচিত হচ্ছে, আবার কোথাও বর্ধিত হচ্ছে ; অভিনব বিন্যাসে সজ্জিত হতে চলেছে পাঠক্রম। এই সন্ধিক্ষণে পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতার গুরুদায়িত্ব রয়েছে। এর জন্য চাই সহজ, সরল উপায়ে বিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্বগুলি ছাত্রদের সামনে উপস্থাপিত করা, সেই সঙ্গে চাই তথ্য ও দৃষ্টান্তের পর্যাপ্তি—চাই স্পষ্ট এবং যথাযথ রেখাচিত্রের সংস্থাপন। বেশী বলার প্রয়োজন নাই, সুধী শিক্ষকবৃন্দ এ সমস্তই অবগত আছেন।

দীর্ঘ একুশ বছর ধরে শিক্ষকতায় সম্পৃক্ত আছি, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষণের সমস্যাবলীর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে—জেনেছি প্রতিদিনের পঠন-পাঠনে কোথায় কোথায় বিপত্তি ঘটে, কৈশোরোচিত ধারণা-শক্তি কোথায় প্রতিহত হয়, ঠিক কোন্ স্থানে সংক্ষেপ প্রয়োজন, কোন্ কোন্ বিষয়গুলির বিশদ বিবরণ ছাত্রদের বোঝবার পক্ষে প্রয়োজন।

আত্মপ্রশংসা অনুচিত হবে ; বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞতর শিক্ষক-সমাজের সামনে আমার পরিকল্পনাটি শুধু নিবেদন করার জন্যই এই মুখবন্ধ। চিন্তার স্বচ্ছতা এবং ভাষার সারল্য, বিমূর্ত বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রয়োগের নমুনা প্রদান, বাহুল্য বর্জন অথচ সারবস্তুর বিস্তারিত পরিবেশনা এবং যথাযথ চিত্র সহযোগে দুরূহ প্রস্তাবনার প্রাঞ্জলীকরণ আমার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাফল্য বিচারের ভার বরেণ্য শিক্ষক-সমাজের উপর।

কৃতজ্ঞতাভাজন অনেকেই, তবু বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের সর্বজনশ্রদ্ধেয় কর্ণধার এবং জাতীয় শিক্ষক শ্রী এ. আর. রায় ও সহকর্মী সুহৃদ্বর শ্রীনীরদবরণ পতির নাম। প্রুফ পঠনে এবং নানাবিষয়ে উপদেশ-দানে, অনুজপ্রতিম শ্রীকান্ত মুখার্জী এবং শ্রীদিলীপ বর্মণ তাদের অকৃপণ সহায়তার জন্য আমার ধন্যবাদভাজন হয়ে রইল।

স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল
৭৩ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বিনীত
সুখেন্দু মাইতি

ত্রয়োদশ সংস্করণের ভূমিকা

কোন কাজে, বিশেষ করে সৃষ্টির কাজে সাফল্য লাভ করলে মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। আমার এই আনন্দ শতগুণে বর্ধিত হয়েছে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকসমাজ এবং স্নেহের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বইটির অদ্ভূত জনপ্রিয়তা দেখে। তাই পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার শিক্ষক-শিক্ষিকাকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং স্নেহাশীষ জানাই আমার আদরের ছাত্র-ছাত্রীদের।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষিকার পরামর্শ অনুযায়ী বর্তমান সংস্করণের প্রতিটি অধ্যায়ে কিছু কিছু নতুন তথ্য এবং চিত্র সংযোজন করা হল। এই সংযোজনের ফলে ছাত্রছাত্রীরা আরো বেশী উপকৃত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এখন থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা করার সময়, বিভিন্ন প্রশ্নের শ্রেণীবিন্যাস কিভাবে করতে হবে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর প্রশ্নগুলির অর্থ কি হবে সেই বিষয়গুলি জানানোর জন্য কর্মশালার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মধ্যশিক্ষা পর্যদের নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষার প্রশ্নগুলিকে জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক এবং দক্ষতামূলক বিভাগে ভাগ করতে হবে এবং প্রতি বিভাগের প্রশ্নের মধ্যে যথাসম্ভব অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী, সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী, রচনাধর্মী এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন রাখতে হবে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সুবিধার জন্য বর্তমান সংস্করণে প্রতি অধ্যায়ের প্রশ্নগুলিকে ঐভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমার একাজে অকুণ্ঠ সাহয্য করেছেন বিভিন্ন শিক্ষক এবং শিক্ষিকা—তাই সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা।

বইটির দ্বারা ছাত্রছাত্রীরা যেন আরো বেশী উপকৃত হয় তার জন্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকার অভিজ্ঞতাসম্মত উপদেশ সাদরে গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলাম।

স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল
কলিকাতা
এপ্রিল, ১৯৯০

বিনীত
সুখেন্দু মাইতি

SYLLABUS IN PHYSICAL SCIENCE FOR CLASS VIII

1. *Air*—Idea of Chemical Compounds—Individual properties of the constituents lost, new substances with new properties appear (Fe+S=FeS)—Air is not an element or a chemical compound, but a mechanical mixture—Composition of air —Principles involved in ventilation—Rusting—Combustion —Atmospheric conditions, pressure and temperature in the higher regions—Balloon and Aeroplane flight—story of Wright Brothers—preparation and study of simple properties of H_2, O_2—Burning in Oxygen, formation of Oxides —oxidation and reduction.

2. *Water*—Chemical compound—Electrolysis of water—Chemical Composition and Chemical Decomposition and symbols and formulae of certain common elements and compounds.

3. *Matter*—Elementary ideas—Chemical reaction—Atomic phenomena.

4. *Carbon*—Allotropic modifications—Coal, Diamond, Graphite, Charcoal, Soot—Carbon dioxide—Mention of the wide universal presence of Carbon compounds in various forms.

5. *Acids and Alkalis*—Elementary ideas of acids and alkalis— HCl, H_2SO_4, HNO_3, NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$.

6. *Heat & Temperature and transference of heat*—Heat and Temperature—Mercury-in-glass Thermometer. (avoid details of construction—clinical thermometer.) Conduction, Convection and Radiation of Heat—simple demonstrative experiments—Examples of good and bad conductors—Thermoflask—convection and air current— simple phenomena explained by difference in radiating ability.

7. *Magnets*—Different types of magnets—their general properties —Demonstrative experiments—How to magnetise a body ? —Magnetic Induction—experimental demonstration of Elementary Theory of Magnetism—Terrestrian magnetism. Use of magnetic compass.

8. *ELECTRICITY*—Electrostatics : Demonstration by combing hair and attracting small pieces of paper—production by

rubbing—Insulators and conductors—Explanation by electron theory—Two kinds of charges—Forces between charged bodies—short life-story of Coulomb.

8. *CURRENT ELECTRICITY*—Simple Voltaic cells—short life story of Volta. Dry cells—Idea of resistance—its influence on regulating current (non-quantitative discussion)—Heating and magnetic effects of currents (simple experiments—short life-stories of Joule—Faraday—Ampere—simple application of heating—magnetic effects of currents (simple experiments)—Electric bulb—Electric bell.

সূচীপত্র



প্রথম অধ্যায়

বায়ু

আমাদের পৃথিবী ভারী সুন্দর একটি গ্রহ, মহাশূন্যে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে চলেছে সূর্যের চারপাশে, ফলে আসে দিন, আসে রাত,—মাসের পর মাস আসে আর যায়, বছরের পর বছর শেষ হয়ে যায়। এইভাবে একটার পর একটা করে দিন চলে যায়। এক সময় তোমাদের ছাত্রজীবনও শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এর মধ্যে তোমরা কি একদিনের জন্যও চিন্তা করে দেখেছ যে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীটা কি দিয়ে তৈরি—কি কি জিনিস এর চারপাশে ছড়িয়ে আছে ?

বাড়ীর মধ্যেই দেখা যাক্—ছাদে লোহার বীম, কাঠের দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল, সিমেণ্টের মেঝে, রান্নাঘরে কয়লার উনুন জ্বলছে, মা রান্না করছেন—হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের সোনার চুড়িগুলি থেকে মিষ্টি একটা শব্দ বেরুচ্ছে। ছুটিতে বাইরে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পাও বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই বুকে নিয়ে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের সারি—কোথাও সীমাহীন সমুদ্রের নীল জল—ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। কখনো বা বনের ধারে বেড়াতে গিয়ে শুনবে পাতার ফাঁক দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়ার মর্মর ধ্বনি। এই কাঠ, সিমেণ্ট, কয়লা, লোহা, সোনা, বাতাস, জল, পাথর—সবই হল পদার্থ।

1.1 পদার্থ (Matter)

সংজ্ঞা ঃ যার ভর তথা ওজন আছে, যা কিছু স্থান দখল করে থাকে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যার অবস্থিতি আমরা অনুভব করতে পারি, তাকে পদার্থ বলে। আলো, তাপ, শব্দ ইত্যাদি পদার্থ নয় ; কারণ এদের ওজন নেই, কোন স্থান দখল করে না, এরা হল শক্তি। এটাই হল পদার্থ এবং শক্তির মধ্যে প্রধান পার্থক্য।

পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ঃ পৃথিবীতে যে সব পদার্থ ছড়িয়ে আছে তাদের তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(1) **মৌলিক পদার্থ**, (2) **যৌগিক পদার্থ** এবং (3) **মিশ্র পদার্থ**।

• **মৌলিক পদার্থ ঃ** যে পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে মূল পদার্থ ছাড়া পৃথক ধর্মবিশিষ্ট অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না, সেই পদার্থকে মৌলিক পদার্থ বা মৌল বলে।

পৃথিবীতে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা 105। স্বাভাবিক অবস্থায় এদের মধ্যে কতকগুলি কঠিন, কতকগুলি তরল, আবার কতকগুলি গ্যাসীয়। যেমন—

কঠিন মৌল—সোনা, রুপা, তামা, জিঙ্ক, আয়রন, টিন ইত্যাদি।

তরল মৌল—পারদ, ব্রোমিন।

গ্যাসীয় মৌল—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ক্লোরিন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি।

মৌলগুলিকে আবার তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের উপর ভিত্তি করে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—(1) **ধাতু**, (2) **অধাতু**, (3) **ধাতুকল্প**।

(1) **ধাতুঃ** যে মৌল (i) সাধারণ অবস্থায় কঠিন, (ii) উজ্জ্বল ও চক্‌চকে, (iii) ওজনে ভারী, (iv) যাকে আঘাত করলে ধাতব শব্দ উৎপন্ন হয়, (v) যা তাপ ও বিদ্যুতের পরিবাহী, সেই মৌলকে ধাতু বলে। যেমন—ক্যালসিয়াম, সোনা, রূপা, তামা, জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন ইত্যাদি।

(2) **অধাতুঃ** যে মৌল (i) সাধারণ অবস্থায় কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়, (ii) যা ওজনে হালকা, (iii) যা উজ্জ্বল বা চক্‌চকে নয়, (iv) যা গঠনে ভঙ্গুর, (v) যাকে আঘাত করলে শব্দ উৎপন্ন হয় না, (vi) যা তাপ ও বিদ্যুতের অপরিবাহী, সেই মৌলকে অধাতু বলে। যেমন—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার, কার্বন ইত্যাদি।

(3) **ধাতুকল্পঃ যে মৌলের মধ্যে ধাতু এবং অধাতু উভয়ের গুণই বর্তমান থাকে, তাকে ধাতুকল্প বলে।** যেমন—আর্সেনিক, অ্যাণ্টিমনি।

ব্যতিক্রম—পারদ ধাতু হলেও তরল, সোডিয়াম ধাতু জলের চেয়ে হালকা। কার্বন এবং সালফার অধাতু হলেও কঠিন।

গ্রাফাইট (কার্বন) অধাতু হলেও তড়িৎ পরিবাহী।

হীরক (কার্বন) উজ্জ্বল এবং কঠিনতম পদার্থ। আয়োডিন অধাতু হলেও চক্‌চকে।

● **যৌগিক পদার্থঃ যে পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়, তাকে যৌগিক পদার্থ বলে।**

অন্যভাবে বলা যায়, দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ, নির্দিষ্ট ওজনে রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা পরস্পর যুক্ত হয়ে যে নতুন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন করে, তাকেই যৌগিক পদার্থ বলে।

(i) যৌগিক পদার্থের মধ্যে যে যে মৌলিক পদার্থ থাকে, তাদের নিজস্ব কোন গুণ বর্তমান থাকে না। যেমন জল একটি যৌগিক পদার্থ। জলকে বিশ্লেষণ করলে দুটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। **18 গ্রাম জলকে বিশ্লেষণ করলে 16 গ্রাম অক্সিজেন ও 2 গ্রাম হাইড্রোজেন পাওয়া যায়।** অক্সিজেন জ্বলতে সাহায্য করে, নিঃশ্বাসের

সঙ্গে অক্সিজেন নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি। জল অক্সিজেন দিয়ে তৈরি, অথচ জল দিয়ে আমরা আগুন নিবাই, আর জলে ডুবে গেলে নিঃশ্বাস নিতে না পেরে আমরা মরেই যাবো। হাইড্রোজেন গ্যাস নিজেই জ্বলে, অথচ জলে আগুন দাও, দেখবে আগুন ধরবে না। এর দ্বারা বোঝা যায় জল, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে তৈরি হলেও জলের মধ্যে ওদের ধর্ম সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। (ii) যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলিকে সহজে পৃথক করাও যায় না। (iii) যৌগিক পদার্থ সর্বদা সমসত্ত্ব হয়।

আমরা যে নুন খাই তা হল সোডিয়াম ক্লোরাইড। এর একটি অণুর মধ্যে এক পরমাণু সোডিয়াম এবং এক পরমাণু ক্লোরিন থাকে। (i) সোডিয়াম একটি ধাতু—সোডিয়াম জলের সঙ্গে তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। সোডিয়াম ক্লোরাইড জলে দ্রবীভূত হয় কিন্তু জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। (ii) ক্লোরিন ব্লিচিং পাউডারের গন্ধবিশিষ্ট সবুজাভ হলুদ বর্ণের গ্যাস। ক্লোরিনের বিরঞ্জন ধর্ম আছে—এর মধ্যে লাল ফুল ধরলে সাদা হয়ে যায়। ক্লোরিন গ্যাসপূর্ণ একটি গ্যাসজারের মধ্যে জ্বলন্ত সোডিয়াম ধাতু প্রবেশ করালে সোনালী শিখায় জ্বলতে থাকে এবং সোডিয়ামের সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড কিন্তু একটি কঠিন এবং সাদা রঙের কেলাসিত পদার্থ। লাল ফুলকে এর মধ্যে রাখলে ফুলটির বর্ণ সাদা হয় না, অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের বিরঞ্জন ধর্ম নেই। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে সোডিয়াম বা ক্লোরিনের কোন ধর্ম বর্তমান নেই। সোডিয়াম এবং ক্লোরিন পরমাণু রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা যুক্ত হয়ে নতুন ধর্মবিশিষ্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করেছে। সোডিয়াম ক্লোরাইড হল একটি যৌগ।

ফসফরাস একটি সাদা রঙের মৌল। ফসফরাস কার্বন টেট্রাক্লোরাইডে দ্রবীভূত হয়। আয়োডিন একটি চক্‌চকে কালো রঙের মৌল। একে উত্তপ্ত করলে সুন্দর বেগুনী বর্ণের গ্যাসে পরিণত হয়। এখন একটি বেসিনে সাদা ফসফরাস নিয়ে এর সঙ্গে আয়োডিন মেশালে দেখা গেল আয়োডিন ফসফরাসের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে ওঠে এবং তীব্র বিক্রিয়া শুরু হয়। বিক্রিয়া শেষে দেখা যায় যে, লাল বর্ণের একটি পদার্থ বেসিনে পড়ে আছে। এটি হল একটি যৌগ—ফসফরাস ট্রাই-আয়োডাইড। এই যৌগটি কার্বন টেট্রাক্লোরাইডে দ্রবীভূত হয় না—একে উত্তপ্ত করলে বেগুনী বর্ণের গ্যাস উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ এর মধ্যে ফসফরাস বা আয়োডিনের কোন ধর্ম বর্তমান নাই। এটি সম্পূর্ণ নতুন ধর্মবিশিষ্ট একটি যৌগ।

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে দুই

বা তার বেশী সংখ্যক পৃথক ধর্মবিশিষ্ট মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। যৌগিক পদার্থের মধ্যে ওর উপাদান মৌলগুলির ধর্ম বর্তমান থাকে না।

অ্যাসিড, ক্ষার, লবণ, চিনি, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, প্রভৃতি হল যৌগিক পদার্থ।

• **মিশ্র পদার্থ**ঃ (i) একটি পরিষ্কার বীকারে খানিকটা ঘোলা জল নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রেখে দাও—দেখবে, কাদার সূক্ষ্ম কণাগুলি বীকারের তলায় থিতিয়ে পড়েছে—উপরের অংশে পরিষ্কার জল রয়েছে—**ঘোলা জল হল সূক্ষ্ম কাদা ও জলের মিশ্রণ**। (ii) এক কাপ জলে দুই চামচ চিনি দিয়ে নাড়তে থাক—দেখবে, চিনি অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু জলের স্বাদ নিয়ে দেখ বেশ মিষ্টি লাগছে। তাহলে জলের মধ্যে অদৃশ্য হলেও চিনির গুণ ঠিকই বর্তমান আছে। এটি হল জল ও চিনির মিশ্রণ।

সংজ্ঞাঃ দুই বা ততোধিক মৌলিক বা যৌগিক পদার্থকে যে কোন ওজন-অনুপাতে মেশালে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাকে মিশ্র পদার্থ বা সাধারণ মিশ্রণ বলে।

• মিশ্র পদার্থের উদাহরণঃ

বায়ু—O_2, N_2, CO_2 এবং জলীয় বাষ্পের মিশ্রণ।
বারুদ- -পটাসিয়াম নাইট্রেট, সালফার এবং কাঠকয়লার মিশ্রণ।
ধোঁয়া—বাতাস ও কার্বনের সূক্ষ্ম কণার মিশ্রণ।
পিতল—তামা ও জিঙ্কের মিশ্রণ।
শরবত—চিনি ও জলের মিশ্রণ।
সোডাওয়াটার—CO_2 এবং জলের মিশ্রণ।

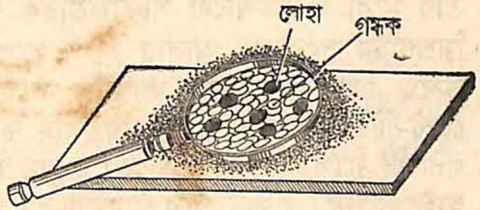
মিশ্র পদার্থের মধ্যে উপাদানগুলির **নিজের নিজের ধর্ম** বর্তমান থাকে। তাছাড়া, মিশ্র পদার্থ থেকে ওর উপাদানগুলিকে সহজে পৃথক করা যায়। মিশ্রণের মধ্যে উপাদানগুলি পাশাপাশি অবস্থান করে। এবার হাতেনাতে পরীক্ষা করে দেখ।



পরীক্ষা—1ঃ একটি খলের মধ্যে সামান্য **গন্ধক** আর **লোহাচুর** নিয়ে একটি নোড়া দিয়ে বেশ করে নেড়ে মিশিয়ে দাও। এখন যে জিনিসটি তৈরি হল, সেটি হল একটি সাধারণ মিশ্রণ।

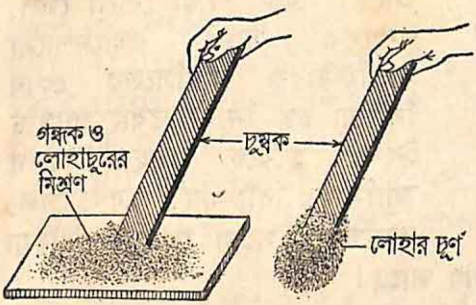
(A) এইবার এই মিশ্রণের সামান্য একটু নিয়ে একটা সাদা কাগজের উপর ছড়িয়ে দাও, তারপর একটা

উত্তল লেন্স চোখের সামনে নিয়ে দেখ। স্পষ্ট দেখতে পাবে, গন্ধকের **হলুদ রঙের ছোট ছোট কণা আর লোহার কালো রঙের কণাগুলি পাশাপাশি অবস্থান করছে।**



মিশ্রণে লোহা ও গন্ধকের কণাগুলিকে পাশাপাশি দেখা যায়।

(B) ঐ মিশ্রণের কিছু অংশ নিয়ে কাগজের উপর ছড়িয়ে দাও। এইবার একটি দণ্ড-চুম্বক নিয়ে মিশ্রণটির মধ্যে নাড়তে থাক, দেখবে সমস্ত লোহাচুর আকৃষ্ট হয়ে দণ্ড-চুম্বকের গায়ে আটকে রয়েছে, হলুদ রঙের গন্ধকের কণাগুলি কিন্তু কাগজেই পড়ে আছে। **লোহার ধর্ম চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া।** তাহলে বোঝা গেল—(i) **মিশ্রণটির মধ্যে লোহার এই ধর্ম পুরোমাত্রায় বজায় আছে।** তাছাড়া আরো দেখা গেল যে, (ii) **মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলিকে খুব সহজেই পৃথক করা যায়।**

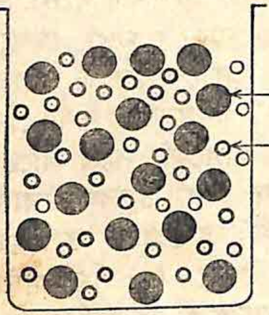


চুম্বকের সাহায্যে মিশ্রণ থেকে লোহাচুর পৃথকীকরণ।

(C) একটি টেস্ট-টিউবে মিশ্রণের সামান্য অংশ নিয়ে, ওর মধ্যে **কার্বন ডাই-সালফাইড** ঢেলে বেশ করে ঝাঁকিয়ে দাও। এইবার ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়ে পরিস্রাবণ কর, দেখবে লোহার কণাগুলি ফিল্টার কাগজে আটকে গেছে। পরিস্রুতটিকে একটি ওয়াচ-গ্লাসে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দাও। দেখবে কার্বন ডাই-সালফাইড বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে গেছে আর ওয়াচ-গ্লাসে পড়ে আছে হলুদ রঙের গন্ধক। গন্ধক, কার্বন ডাই-সালফাইডে দ্রাব্য আর লোহা ঐ তরলে অদ্রাব্য। কাজেই দেখা গেল, **মিশ্রণের মধ্যে গন্ধকের ধর্মও পুরোপুরি বজায় আছে।**



(D) একটি টেস্ট-টিউবের মধ্যে এই মিশ্রণের কিছু অংশ নিয়ে, তার মধ্যে **জলমেশানো সালফিউরিক অ্যাসিড** ঢেলে দাও। অ্যাসিড, মিশ্রণটির সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখবে যে, গ্যাসের বুদ্‌বুদ উঠছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ণহীন গন্ধহীন একটি গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে। টেস্ট-টিউবের মুখে একটি দেশলাই কাঠি জেবলে ধর, দেখবে উৎপন্ন গ্যাসটি নীল শিখায় জ্বলছে। এতে বোঝা গেল, উৎপন্ন গ্যাসটি হাইড্রোজেন। একটু পরে গ্যাসের বুদ্‌বুদ ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। দেখা যাবে, টেস্ট-টিউবের মধ্যে লোহাচুর নেই—তার বদলে হলুদ রঙের গন্ধক টেস্ট-টিউবের তলায় পড়ে আছে। এর দ্বারা বোঝা গেল, গন্ধকের সঙ্গে জলমেশানো সালফিউরিক অ্যাসিডের কোন বিক্রিয়া হয় নি, সুতরাং গ্যাসটি উৎপন্ন হয়েছে লোহার সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়ায়। দেখা গেল, **অ্যাসিডের সঙ্গে লোহার বিক্রিয়া করার ধর্মটিও পুরোমাত্রায় বজায় আছে।**



লোহা ও গন্ধকের মিশ্রণ।

এই পরীক্ষাগুলি করে আমরা নিচের সিদ্ধান্তে আসতে পারিঃ

• **সিদ্ধান্তঃ** (i) **মিশ্রণে ওর উপাদানের কণাগুলি পাশাপাশি থাকে।** (ii) **মিশ্রণে ওর উপাদানগুলির ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না—ওদের নিজের নিজের ধর্ম পুরোমাত্রায় বর্তমান থাকে।** (iii) **খুব সহজেই মিশ্রণ থেকে ওর উপাদানগুলিকে পৃথক করা যায়।** (iv) **যে কোন ওজন-অনুপাতে দুই বা ততোধিক মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ মেশালেই মিশ্র পদার্থ তৈরি হয়।** (v) **মিশ্র পদার্থ সাধারণত অসমসত্ত্ব হয়। (ব্যতিক্রম—দ্রবণ)**



পরীক্ষা—*2*ঃ 7 **গ্রাম লোহাচূর** ও 4 **গ্রাম গন্ধক** নিয়ে একটা খলে ভাল করে মেশাও। একটা টেস্ট-টিউবের মধ্যে ঐ মিশ্রণের কিছুটা নিয়ে বার্নার দিয়ে বেশ করে গরম কর। দেখবে মিশ্রণটি তাপ উৎপন্ন করে গলে

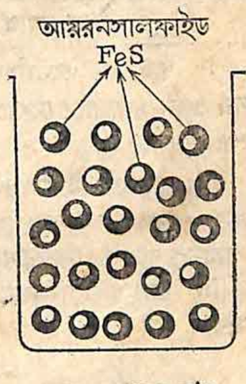
গেল। বার্নার থেকে সরিয়ে টেস্ট-টিউবটিকে ঠাণ্ডা করে ভেতরের পদার্থটিকে বের করে খলে রেখে গুঁড়ো কর।

(A) এইবার এই গুঁড়োর কিছু পরিমাণ সাদা কাগজের উপর রেখে তোমার **উত্তল লেন্সটি** দিয়ে দেখ। এখন আর আগের মত হলুদ রঙের গন্ধকের কণা বা লোহার কণাকে পাশাপাশি দেখা যাবে না—নতুন এক-রকম কালো রঙের কণা চারদিকে ছড়িয়ে আছে দেখতে পাবে।

(B) এইবার একটি চুম্বকদণ্ড নিয়ে এই গুঁড়োর মধ্যে ঘোরাও, চুম্বকদণ্ডটিকে অনেকক্ষণ ধরে নাড়লেও দেখবে, লোহার এতটুকু কণা তার গায়ে আটকালো না।

এর দ্বারা বোঝা গেল, ঐ কালো গুঁড়োর মধ্যে লোহার ধর্ম লোপ পেয়েছে, কারণ লোহার ধর্ম বর্তমান থাকলে চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হতো।

(C) এখন একটি টেস্ট-টিউবের মধ্যে এই গুঁড়ো নিয়ে **কার্বন ডাই-সালফাইড** ঢেলে বেশ করে ঝাঁকুনি দিয়ে ফিল্টার কর, আর পরিস্রুতকে নিয়ে ওয়াচ-গ্লাসে রেখে দাও ; কার্বন ডাই-সালফাইড উবে গেলে দেখবে, ওয়াচ-গ্লাসে কোন হলুদ বর্ণের পদার্থ পড়ে নেই—তার মানে নতুন পদার্থ থেকে গন্ধক কার্বন ডাই-সালফাইডে দ্রবীভূত হয় নি অর্থাৎ গন্ধকের ধর্ম লোপ পেয়েছে।



লোহা ও গন্ধকের যৌগ

(D) এখন টেস্ট-টিউবে এই গুঁড়ো কিছুটা নিয়ে জলমেশানো সালফিউরিক অ্যাসিড ঢাল, দেখবে বুদ্‌বুদ কেটে গ্যাস বের হচ্ছে, আর পচা ডিমের দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে টেস্ট-টিউবের মুখে ধরে দেখবে গ্যাসটি জ্বলছে না। তাহলে বোঝা গেল, এখন আর হাইড্রোজেন উৎপন্ন হচ্ছে না—নতুন একটি গ্যাস উৎপন্ন হয়েছে—নাম তার **হাইড্রোজেন সালফাইড** (H_2S)। এই গ্যাসের গন্ধ পচা ডিমের মত। তাহলে দেখা গেল, গন্ধক আর লোহাচুরের মিশ্রণকে তাপ দিলে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তা হল যৌগিক পদার্থ ; কারণ এই নতুন পদার্থটি উৎপন্ন হওয়ার সময় (i) **তাপ উৎপন্ন হয়েছিল,** (ii) নতুন পদার্থের মধ্যে ওর **উপাদানগুলির অর্থাৎ লোহা বা গন্ধকের কোন ধর্মই বর্তমান নেই,** (iii) সম্পূর্ণ নতুন ধর্মবিশিষ্ট নতুন এক পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে। এই পরীক্ষাগুলি করে পরপৃষ্ঠার সিদ্ধান্তে আসা যায়ঃ

- **সিদ্ধান্তঃ**

(i) দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ নির্দিষ্ট ওজন-অনুপাতে মিশিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটালে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়।

(ii) যৌগিক পদার্থ উৎপন্নের সময়—তাপ শোষিত হয় কিংবা তাপ উৎপন্ন হবেই।

(iii) যৌগিক পদার্থের মধ্যে ওর উপাদানগুলির সমস্ত ধর্ম লোপ পায়।

(iv) যৌগিক পদার্থের ধর্ম, ওর উপাদানগুলির ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

(v) যৌগিক পদার্থ সমসত্ত্ব হয়।

(vi) যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলিকে সহজ উপায়ে পৃথক করা যায় না।

মিশ্র পদার্থ ও যৌগিক পদার্থের পার্থক্যঃ

মিশ্র পদার্থ	যৌগিক পদার্থ
(i) দুই বা ততোধিক পদার্থ যে কোন ওজন-অনুপাতে মেশালে মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হয়।	(i) যৌগিক পদার্থে উপাদানগুলির ওজনের অনুপাত সব সময় স্থির থাকে।
(ii) মিশ্রণে উপাদানগুলির ভৌত ধর্মের পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন হয় না।	(ii) যৌগিক পদার্থে উপাদানগুলির নিজ নিজ রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটে।
(iii) মিশ্রণে উপাদানগুলি পাশাপাশি অবস্থান করে।	(iii) যৌগিক পদার্থে উপাদানগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে অন্য পদার্থে পরিণত হয়।
(iv) মিশ্রণ তৈরি করার সময় তাপের তারতম্য হতে পারে আবার নাও হতে পারে।	(iv) যৌগিক পদার্থ উৎপন্নে তাপের তারতম্য হবেই অর্থাৎ হয় তাপ উৎপন্ন হবে—না হয় তাপ শোষিত হবে।*
(v) মিশ্র পদার্থ সমসত্ত্ব বা অসমসত্ত্ব—দুই-ই হতে পারে।	(v) যৌগিক পদার্থ সব সময় সমসত্ত্ব হয়।
(vi) উপাদানগুলির নিজের নিজের ধর্ম বজায় থাকে।	(vi) উপাদানগুলির নিজস্ব ধর্ম লোপ পায় এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট নতুন পদার্থে পরিণত হয়।
(vii) নির্দিষ্ট স্ফুটনাঙ্ক বা গলনাঙ্ক নেই।	(vii) নির্দিষ্ট স্ফুটনাঙ্ক বা গলনাঙ্ক আছে।
(viii) উপাদানগুলিকে সহজ উপায়ে পৃথক করা যায়।	(viii) উপাদানগুলিকে সহজ উপায়ে পৃথক করা যায় না।

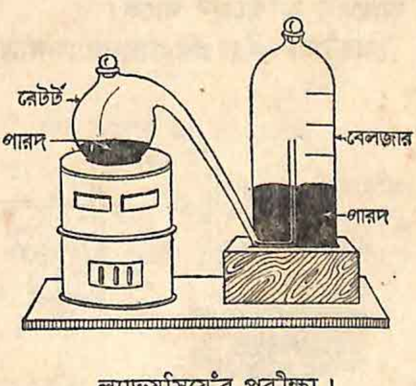
* অক্সিজেনের মধ্যে কার্বনকে পোড়ালে কার্বন ডাই-অক্সাইড যৌগ উৎপন্ন হয়। এই যৌগটি উৎপন্নের সময় তাপ উৎপন্ন হয়। আবার কার্বনের সঙ্গে সালফারের বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-সালফাইড উৎপন্ন হয়। এই যৌগটি উৎপন্নের সময় তাপ শোষিত হয়।

1.2 বায়ুর গঠন (Composition of air)

প্রাচীন হিন্দু এবং গ্রীক দার্শনিকেরা বায়ুকে একটি মৌলিক পদার্থ বলে মনে করতেন। প্রাচীনকালে চীনদেশের লোকেরা ভাবতো বায়ুর মধ্যে দুটি দৈত্য বাস করে—একজনের নাম 'ইন' আর একজনের নাম 'ইয়ঙ'। 'ইন' খুব নিরীহ, কারো সাতে-পাঁচে থাকে না—কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসে না। আর 'ইয়ঙ' ছিল ভীষণ রাক্ষুসে —যাকে পায় তাকেই গিলে খায়। এর অনেক বছর পর আঠারোশ' শতাব্দীতে **শীলে, প্রিস্টলী** ও **ল্যাভয়সিয়ে** নামে তিনজন বিজ্ঞানী, বিশেষ করে ল্যাভয়সিয়ে'র গবেষণার ফলে এই 'ইন' আর 'ইয়ঙ'-এর সত্যিকারের পরিচয় জানা যায়। 1775 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে পরীক্ষা করে দেখান যে, 'ইন' হল বায়ুর মধ্যে থাকা **নিষ্ক্রিয় গ্যাস—নাইট্রোজেন** ; আর 'ইয়ঙ' হল বায়ুর মধ্যে থাকা **সক্রিয় গ্যাস—অক্সিজেন।** তিনি এই পরীক্ষায় দেখান যে, বায়ু হল **অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন** গ্যাসের মিশ্রণ। বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের আয়তন অনুপাত হল 1 : 4। কেমন করে তিনি এটা আবিষ্কার করলেন তা নিচে বর্ণনা করা হলঃ

1.3 ল্যাভয়সিয়েঁর পরীক্ষা (Lavoisier's Experiment)

পরীক্ষা—1ঃ (i) ল্যাভয়সিয়ে একটি রেটর্ট (বকযন্ত্র) তৈরি করান—রেটর্টের মুখটি লম্বা আর উপর দিকে উঁচু করা। (ii) এর মধ্যে তিনি 4 **আউন্স পারদ** ভর্তি করে, রেটর্টের লম্বা মুখটি পারদ-ভর্তি আর একটি পাত্রের উপর রেখে, একটা লম্বা বেলজার দিয়ে রেটর্টের লম্বা উঁচু মুখটি ঢেকে দেন। এর ফলে বেলজারের মধ্যস্থ বায়ুর সঙ্গে বকযন্ত্রের মধ্যে রাখা পারদের সংযোগ ঘটানো হল। (iii) বেলজারের মধ্যে যে আয়তনের বায়ু আছে, বেলজারের গায়ে 5টি **দাগ কেটে সেই আয়তনের বায়ুকে পাঁচটি সমান অংশে ভাগ করে** সবকিছু ঠিকঠাক সাজিয়ে তিনি রেটর্টটিকে একটি উনুনের উপর বসিয়ে 12 দিন ধরে একটানা উত্তপ্ত করেন এবং লক্ষ্য করেন যে প্রতিদিন বেলজারের ভেতরের বায়ু ক্রমশ কমে যাচ্ছে যার ফলে সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য বেলজারের



ল্যাভয়সিয়েঁর পরীক্ষা।

মধ্যে পারদতল ক্রমশ উপরে উঠে যাচ্ছে। তিনি আরো লক্ষ্য করেন যে রেটর্টের মধ্যস্থ পারদের উপর লাল বর্ণের একটি আস্তরণ পড়ছে। 12 দিন পর যখন বেলজারের মধ্যস্থ বায়ু আর কমছে না তখন তিনি রেটর্টটিকে ঠাণ্ডা করেন।

• **পর্যবেক্ষণঃ** এই পরীক্ষাটি করে ল্যাভয়সিয়ে যা পর্যবেক্ষণ করেন, সেগুলি নিচে দেওয়া হলঃ

(i) **রেটর্টের মধ্যে রাখা রুপোর মত চকচকে পারদের উপরে কঠিন লাল রঙের একরকম সরের মত আস্তরণ পড়েছে।**

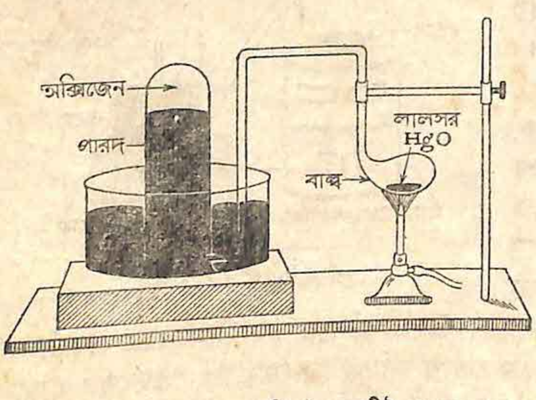
(ii) **রেটর্টে অবশিষ্ট যে পারদ আছে তার ওজন কমে গেছে।**

(iii) বেলজারের মধ্যের যে বায়ুকে সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছিল—**এই পাঁচ আয়তনের মধ্যে এক আয়তন বায়ু কমে গেছে; ফলে পাত্রের পারদ দ্বারা বেলজারের ঐ শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে গেছে, সেইজন্য পাঁচটি দাগের মধ্যে এক দাগ পর্যন্ত পারদ উঠে গেছে।**

(iv) বেলজারের মধ্যে যে বায়ু অবশিষ্ট ছিল তার মধ্যে তিনি একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে ধরলেন—দেখলেন **মোমবাতির শিখাটি নিভে গেল।** ঐ অবশিষ্ট বায়ুর মধ্যে তিনি একটি জ্যান্ত ইঁদুর রাখলেন; দেখা গেল, ইঁদুরটি **নিঃশ্বাস নিতে না পারায় ছটফট করে মরে গেল।**

• **সিদ্ধান্তঃ** এই পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, (i) বেলজারের মধ্যে পড়ে থাকা অবশিষ্ট বায়ুর মধ্যে আগুন জ্বলে না, শ্বাস নেওয়া চলে না। বাতাসের এই অবশিষ্ট অংশের নাম দিলেন **নিষ্ক্রিয় বায়ু বা অ্যাজোট।** পরে এই অ্যাজোটের নাম দেওয়া হয় **নাইট্রোজেন।** (ii) **5 আয়তন বায়ুর মধ্যে 4 আয়তন নাইট্রোজেন আর 1 আয়তন অক্সিজেন থাকে।**

পরীক্ষা—2ঃ এর পর ল্যাভয়সিয়ে আর একটি পরীক্ষা করেন (i) তিনি পারদের উপরের ঐ লাল সরটি সাবধানে তুলে নিয়ে একটি কাচের বাল্‌বে ভর্তি করেন। (ii) বাল্‌বের মুখের সঙ্গে একটি লম্বা নির্গম-নল লাগিয়ে দেন। নির্গম-নলের শেষ প্রান্তটিকে পারদ-ভরা আর একটি পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে, পারদভর্তি একটি গ্যাসজারকে নির্গম-নলের শেষ প্রান্তের



উপর উপুড় করে দেন। (iii) এইবার কাচের বাল্‌বে রাখা লাল পদার্থকে বার্নার দিয়ে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করেন। (iv) দেখা গেল, উত্তপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসজারে একটি বর্ণহীন গ্যাস জমা হচ্ছে। যতক্ষণ ধরে গ্যাস বেরুল ততক্ষণ ধরে তিনি বাল্‌বটিকে উত্তপ্ত করে চললেন। পরীক্ষার পর যন্ত্রপাতি সব ঠান্ডা করে তিনি যা পর্যবেক্ষণ করলেন সেগুলি নিচে দেওয়া হলঃ

● **পর্যবেক্ষণঃ** (i) **বাল্‌বের লাল সরটি আবার চক্‌চকে পারদে পরিণত হয়েছে। বাল্‌বে উৎপন্ন পারদ, আর রেটর্টে অবশিষ্ট পারদের ওজন যোগ করে দেখা গেল 4 আউন্স হচ্ছে।** এই 4 আউন্স পারদ নিয়েই পরীক্ষা শুরু হয়েছিল।

(ii) লাল সরকে গরম করে **যে গ্যাস পাওয়া যায় তার আয়তন হল, বেলজারে যে আয়তন বায়ু ছিল তার 5 আয়তনের 1 আয়তন, অর্থাৎ রেটর্টের পারদ, বেলজারের বায়ুর যে অংশকে শোষণ করে লাল সর উৎপন্ন করেছিল, বায়ুর সেই অংশটি গ্যাসজারে ফেরত পাওয়া গেল।**

(iii)গ্যাসজারের মধ্যে যে গ্যাস আছে, দেখা গেল ওর মধ্যে **মোমবাতি খুব উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে।**

(iv) এই গ্যাস **শ্বাস নিতে সাহায্য করে।**

এই দুটি পরীক্ষায় ল্যাভয়সিয়ে বায়ুকে বিশ্লেষণ করে নিচের সিদ্ধান্তে আসেনঃ

● **সিদ্ধান্তঃ**

(i) **বায়ু মোটামুটি দুটি গ্যাসের মিশ্রণ, যথা—নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন।**

(ii) **5 আয়তন বায়ুর মধ্যে 4 আয়তন নাইট্রোজেন ও 1 আয়তন অক্সিজেন আছে।**

নাইট্রোজেন নিষ্ক্রিয় গ্যাস, নিজে জ্বলে না বা অপরকে জ্বলতে সাহায্য করে না, শ্বাসকার্যে সাহায্য করে না।

লাল সর থেকে পাওয়া গ্যাসটির নাম তিনি দেন অক্সিজেন। **অক্সিজেন খুব সক্রিয় গ্যাস, সব পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করে,** জ্বলতে সাহায্য করে এবং শ্বাসকার্যে সাহায্য করে।

উপরের দুটি পরীক্ষায় যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি ঘটে সেগুলি হলঃ

প্রথম পরীক্ষাঃ

$2Hg$	$+$	O_2	$=$	$2HgO$
(রেটর্টের চক্‌চকে পারদ)		(বাতাসের অক্সিজেন)		(মারকিউরিক অক্সাইড) রেটর্টের লাল সর

দ্বিতীয় পরীক্ষা ঃ

$$2HgO = 2Hg + O_2$$

(মারকিউরিক অক্সাইড) (চক্‌চকে পারদ) (অক্সিজেন)
বাল্‌বের লাল সর

1.4 বায়ুর উপাদান (Ingredients of air)

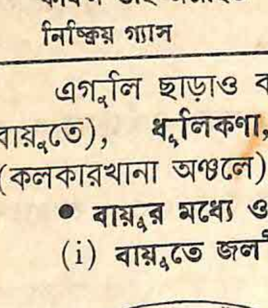
এখন জানা গেছে যে, বায়ু কতকগুলি গ্যাসের মিশ্রণ। এই গ্যাস-গুলির মধ্যে প্রধান হল **অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন**। এছাড়া বায়ুর মধ্যে **কার্বন ডাই-অক্সাইড**, জলীয় বাষ্প, আর খুব সামান্য পরিমাণে **হিলিয়াম, নিয়ন, আরগন, ক্রিপ্‌টন, জেনন, রেডন**—এই ছয়টি নিষ্ক্রিয় গ্যাস বর্তমান আছে। আয়তন ও ওজন হিসাবে বায়ুর উপাদানগুলির মোটা-মুটি শতকরা পরিমাণ নিচে দেওয়া হলঃ

বায়ুর উপাদান	ওজন হিসাবে শতকরা পরিমাণ	আয়তন হিসাবে শতকরা পরিমাণ
নাইট্রোজেন	75·50	77·16
অক্সিজেন	23·10	20·60
জলীয় বাষ্প	0·06	1·40
কার্বন ডাই-অক্সাইড	0·04	0·04
নিষ্ক্রিয় গ্যাস	1·30	0·80

এগুলি ছাড়াও বায়ুর মধ্যে **সামান্য ওজোন** (O_3) (**সমুদ্রতীরের** বায়ুতে), **ধূলিকণা, কার্বন-মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন-সালফাইড** (কলকারখানা অঞ্চলে) থাকে।

● **বায়ুর মধ্যে ওর উপাদানগুলির উপস্থিতি দেখানোর পরীক্ষা ঃ**

(i) **বায়ুতে জলীয় বাষ্প আছেঃ** বায়ুর মধ্যে যে অদৃশ্য জলীয় বাষ্প আছে তা সহজেই দেখানো যায়। একটি শুষ্ক কাচের গ্লাস নেওয়া হল। লক্ষ্য রাখা হল, যেন গ্লাসের বাইরের গা একেবারে শুষ্ক থাকে। এইবার কয়েক টুকরো বরফ নিয়ে গ্লাসটির ভেতর রেখে দেওয়া হল ; ফলে গ্লাসটির গা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল গ্লাসের বাইরের গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমছে। বায়ুর জলীয় বাষ্প, ঠাণ্ডা গ্লাসের সংস্পর্শে এসে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে গ্লাসের বাইরের গায়ে তরল হয়ে জমেছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্প আছে।

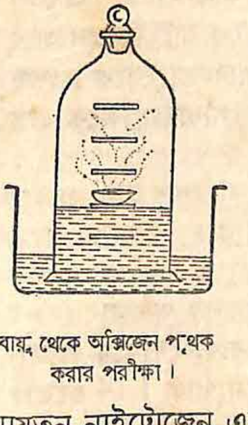


বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি দেখানোর পরীক্ষা।

(ii) **বায়ুর মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড আছেঃ** বায়ুর মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে দেখাতে হলে নিচের পরীক্ষাটি করা হয়।

একটি চওড়া পাত্রে স্বচ্ছ চুনজল নিয়ে রেখে দেওয়া হল। একদিন পর দেখা যাবে স্বচ্ছ চুনজলের উপর সাদা সর পড়েছে। বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড চুনজলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই সর উৎপন্ন করেছে। এই সাদা সরটি হল ক্যালসিয়াম কার্বনেট। বায়ুর মধ্যস্থ কার্বন ডাই-অক্সাইড, চুনজল অর্থাৎ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সাদা রঙের অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) উৎপন্ন করে। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে বায়ুর মধ্যে CO_2 আছে।

(iii) **বায়ুর মধ্যে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের উপস্থিতি দেখানোর পরীক্ষাঃ** একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে সাদা ফসফরাস সমেত একটি পোর্সেলিন বোট ভাসিয়ে, একটি ছিপিসমেত বেলজার দিয়ে পোর্সেলিন বোটটি ঢেকে দেওয়া হল। বেলজারের ছিপি খুলে বেলজারের ভেতর এবং বাইরের জলতল এক করে, বেলজারের গায়ে জলতলের সমরেখায় একটি দাগ কাটা হল। এইবার বেলজারের উপরের বায়ু-ভরা অংশকে দাগ কেটে সমান 5 ভাগে ভাগ করা হল্। একটি লোহার তারকে গরম করে বেলজারের উপরের মুখ দিয়ে ফসফরাসের গায়ে স্পর্শ করিয়ে, তারটি বের করে সঙ্গে সঙ্গে ছিপি বন্ধ করা হল। গরম তারের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফসফরাস জ্বলতে শুরু করে। জ্বলতে জ্বলতে বেলজারের ভেতরে থাকা বায়ুর মধ্যে যে অক্সিজেন থাকে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ফসফরাস পেণ্টক্সাইড উৎপন্ন করে। এইভাবে উৎপন্ন ফসফরাস পেণ্টক্সাইড জলের সঙ্গে মিশে যায়। কিছুক্ষণ পর বেলজারের ভেতরে বায়ুর অক্সিজেন শেষ হয়ে গেলে ফসফরাসটি নিভে যায়। এইবার বেলজারটি ঠাণ্ডা হলে দেখা যাবে যে বেলজারের ভেতরে থাকা 5 আয়তন বায়ুর মধ্যে 1 আয়তন জায়গায় জল ভরে গেছে। একটি জ্বলন্ত পাটকাঠি বেলজারের মধ্যে ঢোকালে নিভে যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হল, বেলজারের বায়ুর মধ্যে আর অক্সিজেন নেই—আছে নাইট্রোজেন। তাহলে দেখা গেল, বায়ুর 5 আয়তনের মধ্যে 4 আয়তন নাইট্রোজেন এবং 1 আয়তন অক্সিজেন থাকে।



বায়ু থেকে অক্সিজেন পৃথক করার পরীক্ষা।

1.5 বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ (Air is a mechanical mixture)

বায়ু যৌগিক পদার্থ নয়—একটি মিশ্র পদার্থ—এটা নিচের যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

(i) **বায়ু উৎপন্নের সময় তাপের তারতম্য হয় না**। যৌগিক পদার্থ উৎপন্নের সময় তাপ উৎপন্ন কিংবা তাপ শোষিত হবেই। 4 আয়তন নাইট্রোজেনের সঙ্গে 1 আয়তন অক্সিজেন মেশালেই বায়ু তৈরি হয়। গ্যাস দুটি মেশাবার সময় দেখা গেছে উষ্ণতার কোন তারতম্য হয় না। **বায়ু যৌগিক পদার্থ হলে, উৎপন্ন হওয়ার সময় উষ্ণতার তারতম্য ঘটতোই।**

(ii) **বায়ুর উপাদানগুলির ওজন-অনুপাত স্থির নয়**। যৌগিক **পদার্থে উপাদানগুলির ওজন-অনুপাত স্থির থাকে—যৌগিক পদার্থটিকে যে কোনভাবেই প্রস্তুত করা হোক না কেন**। নানা জায়গার বায়ু নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শহরের বায়ুর চেয়ে সমুদ্রের বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশী থাকে। শহরের বায়ুতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী থাকে। **বায়ু যৌগিক পদার্থ হলে, বায়ুর উপাদানগুলির ওজন-অনুপাত সর্বদা স্থির থাকতো।**

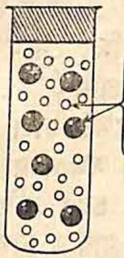
(iii) **তরল বায়ুকে বাষ্পীভূত করলে অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন একসঙ্গে বাষ্পীভূত হয় না**। বায়ুকে খুব চাপ দিয়ে খুব ঠান্ডা করলে বায়ু তরল হয়ে যায়। এই তরল বায়ুকে আবার বাষ্পীভূত করলে দেখা যায়, আগে নাইট্রোজেন বাষ্পীভূত হয়, পরে অক্সিজেন বাষ্পীভূত হয়, যেহেতু অক্সিজেনের চেয়ে নাইট্রোজেন বেশী উদ্বায়ী। **বায়ু যৌগিক পদার্থ হলে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন একই সঙ্গে বাষ্পীভূত হতো।**

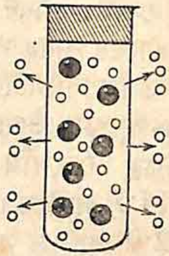
(iv) **বায়ুর উপাদানগুলিকে সহজে পৃথক করা যায়।** আগের পরীক্ষায় দেখা গেল, ল্যাভয়সিয়ে কি করে বায়ু থেকে নাইট্রোজেন আর অক্সিজেনকে পৃথক করেছিলেন। **মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলিকে সহজে পৃথক করা যায়। বায়ু যৌগিক পদার্থ হলে ওর উপাদানগুলিকে এত সহজে পৃথক করা যেত না।**

(v) জলে নাইট্রোজেনের চেয়ে অক্সিজেন বেশী দ্রবীভূত হয়। জলের সঙ্গে কিছু বায়ু সবসময় দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। জলকে গরম করলে জলে দ্রবীভূত বায়ু বেরিয়ে আসে। এই বায়ুকে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, ওর মধ্যে নাইট্রোজেনের চেয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশী থাকে। **বায়ু যৌগিক পদার্থ হলে জল থেকে যে বায়ু বেরিয়ে এলো, তার মধ্যে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের আয়তনের অনুপাত 1 : 4 হতো।** তা হলে দেখা গেল, বায়ুর মধ্যে উপাদানগুলির ধর্ম বদলায় নি।

(vi) একটি সচ্ছিদ্র চীনামাটির পাত্রের মধ্যে কিছু বায়ু ভর্তি

করে রেখে দিলে দু-একদিন পর দেখা যাবে, **পাত্রের মধ্যে যে বায়ু রয়েছে তার মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমে গেছে।** তার মানে সচ্ছিদ্র পাত্রের মধ্য দিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস বেশী বেরিয়ে গেছে—অক্সিজেন গ্যাস অতটা বেরোতে পারেনি। বায়ু যৌগিক পদার্থ হলে এমনটা হতো না।





সচিছদ্র পাত্র থেকে N_2 বেরিয়ে আসে।

(vii) বায়ুর ঘনত্ব সব জায়গায় এক নয়। অর্থাৎ বায়ু হল অসমসত্ত্ব। বায়ু যৌগ হলে সমসত্ত্ব হতো, সব জায়গায় বায়ুর ঘনত্ব একই হতো।

(viii) বায়ুর মধ্যে উপাদানগুলির ধর্ম লোপ পায় না। বায়ুর ধর্ম হল উপাদানগুলির ধর্মের সমষ্টি। বায়ুর মধ্যে ওর মধ্যস্থ উপাদানগুলির ধর্ম বর্তমান থাকে। যেমন অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন উভয়ে বর্ণহীন ও গন্ধহীন গ্যাস, বায়ুও বর্ণহীন এবং গন্ধহীন গ্যাস। O_2 জ্বলতে সাহায্য করে, বায়ুও জ্বলতে সাহায্য করে। বায়ু যৌগিক পদার্থ হলে এর মধ্যে O_2 বা N_2-এর কোন ধর্ম বজায় থাকতো না—লোপ পেতো।

1.6 বায়ুমণ্ডলের অবস্থা (Atmospheric condition)

আমাদের ভূ-পৃষ্ঠ বিশাল বায়ু-সমুদ্রের মধ্যে ডুবে আছে। পৃথিবীকে ঘিরে বায়ুর যে বিরাট অদৃশ্য আবরণ আছে, তাকে **বায়ু-মণ্ডল** বলে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলের সঠিক উচ্চতা এখনো জানা যায়নি, তবে বেতার-তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে মোটামুটি 200 মাইল (322 কি. মি.) উপরেও বায়ুর অস্তিত্ব আছে। মোট বায়ুর শতকরা 99 ভাগ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 70 কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করে। তারপর যতই উপরে ওঠা যায় ততই বায়ুস্তর হালকা হতে থাকে।

(i) **বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে বায়ুর চাপঃ** বায়ুর ওজন আছে—তাই একটি নির্দিষ্ট বায়ুস্তরের উপর, ওর উপরে থাকা বায়ুস্তরের ওজন পড়ে।

কোন বিন্দুর চারপাশে একক ক্ষেত্রফলে লম্বভাবে বায়ুমণ্ডলের যে ওজন পড়ে, তাকেই ঐ বিন্দুতে বায়ুমণ্ডলের চাপ বলে। বায়ুমণ্ডলের

সবচেয়ে নিচে ভূ-পৃষ্ঠে আছে—তাই ভূ-পৃষ্ঠের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ সবচেয়ে বেশী এবং ভূ-পৃষ্ঠ-সংলগ্ন বায়ুস্তর সবচেয়ে বেশী ঘন। ভূ-পৃষ্ঠের যত উপরে ওঠা যায় বায়ুর চাপ ততই কমতে থাকে এবং বায়ুর স্তরও তত পাতলা হতে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের দু মাইল উপরে বায়ুর চাপ 50 সেমি. পারদ স্তম্ভের ওজনের সমান। 900 ফুট উপরে উঠলে ব্যারোমিটারের পারদ স্তম্ভ এক ইঞ্চি বা 2·5 সেমি. নেমে যায়। দেখা গেছে, প্রতি কিলোমিটার উপরে উঠলে বায়ুর চাপ প্রায় 6·5 সেমি. কমে যায়। **ভূ-পৃষ্ঠের উপরে সমুদ্র-পৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে 76 সেমি. পারদ স্তম্ভের ওজনের সমান বা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 14·7 পাউণ্ড।** এভারেস্টের উপর বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় 2·9 পাউণ্ড মাত্র। যত উপরে ওঠা যায় বায়ুর চাপ তত কমতে থাকে বলে, যত উপরে ওঠা যায় জলের স্ফুটনাঙ্ক তত কমতে থাকে। তাই এই কম উষ্ণতায় চাল, ডাল, মাংস সেদ্ধ হয় না। এইসব উঁচু জায়গায় রান্নার জন্য প্রেসার কুকার ব্যবহার করা হয়। উপরে বায়ুর চাপ কম বলে অনেক উপরে উঠলে আমাদের শ্বাসকষ্ট হয়।

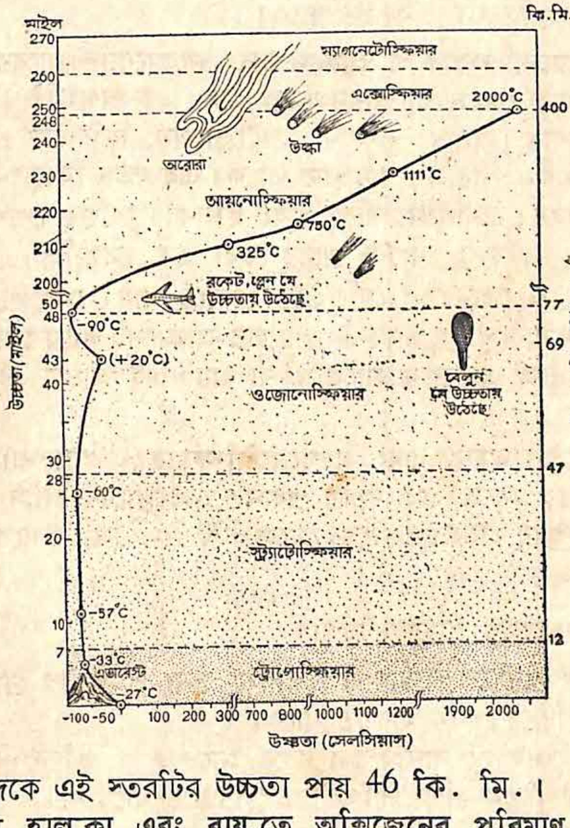
(ii) **বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতাঃ** পৃথিবীতে তাপ আসে সূর্য থেকে—এই তাপ **বিকিরণ প্রণালীতে আসে।** এর ফলে তাপ যে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আসে—সেই মাধ্যমকে উত্তপ্ত করে না—তাই সূর্য থেকে বায়ু-মণ্ডলের ভেতর দিয়ে তাপ এলেও ঊর্ধ্বাকাশ উত্তপ্ত হয় না। সূর্যরশ্মি পৃথিবীর বুকে এসে পড়লে ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুস্তর পরিচলন প্রণালীতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে—তবে এই তাপের পরিমাণ খুব কম। ভূ-পৃষ্ঠের অনেক উপরে থাকা বায়ুর মধ্যে ধূলিকণা থাকে না। তাই উপরের বায়ুর সূর্যের তাপ শোষণ ক্ষমতা কমে যায়। তাই দেখা যায়, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যত উপরে ওঠা যায় উষ্ণতা তত কমতে থাকে। 10,000 ফুট উপরের বায়ুর উষ্ণতা 0°C। তাই এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি পর্বতশৃঙ্গগুলি চিরতুষারময়।

নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর দেখা গেছে বায়ুর তাপ, চাপ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে এই বায়ুমণ্ডলকে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়। যেমন—

(1) **ট্রপোস্ফিয়ার বা ঘনমণ্ডলঃ** ভূ-পৃষ্ঠের সঙ্গে স্পর্শ করে আছে যে বায়ুস্তরটি, সেই স্তর **সবচেয়ে ঘন ও ভারী।** এর উপরের দিকের বায়ুস্তরগুলি ক্রমশ হালকা হয়ে গেছে। **ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 10-16 কিলোমিটার (8 থেকে 10 মাইল) পর্যন্ত উপরে বায়ুমণ্ডলের যে স্তর আছে, তাকে ট্রপোস্ফিয়ার** বা **ঘনমণ্ডল** বলে। এই স্তরে বায়ুর মধ্যে

ধূলিকণা, জলীয় বাষ্প, মেঘ প্রভৃতি থাকে। এই স্তরের মধ্যেই ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি ঘটে। এই স্তরের বায়ুর মধ্যে **উষ্ণতার তারতম্য ঘটে।** প্রতি কিলোমিটার উচ্চতার জন্য উষ্ণতা প্রায় 10°C কমে যায়। এই স্তরের সর্বনিম্ন উষ্ণতা (−56°C)। সবচেয়ে নিচে আছে বলে এই অঞ্চলের **বায়ুর চাপ এবং ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী।** এই স্তরের সবচেয়ে নিচে ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুর চাপ প্রায় 76 সেমি পারদস্তম্ভ। আমরা এই স্তরেই বাস করি।

(2) **স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বা শান্তমণ্ডল**ঃ ট্রপোস্ফিয়ারের উপরের স্তরকে **স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বা শান্তমণ্ডল** বলে। ট্রপোস্ফিয়ারের



উপরের দিকে এই স্তরটির উচ্চতা প্রায় 46 কি. মি.। **এই স্তরের বায়ু খুব হাল্‌কা এবং বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কম।** সেইজন্য এই স্তরে গেলে আমাদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে। এখানে জলীয় বাষ্প নেই বললেই চলে। তাই এখানে মেঘ নেই। এই অঞ্চলের বায়ুর **উষ্ণতার বেশী তারতম্য হয় না।** সেইজন্য এখানে **বায়ু-প্রবাহ হয় না,** এখানকার বায়ু শান্ত। এখানে মেঘ নেই, সেইজন্য এখানে ঝড়,

বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয় না। **এখানকার বায়ুর উষ্ণতা প্রায়** (– 56°C) **থেকে** (– 60°C)।

(3) **ওজোনোস্ফিয়ার** বা **ওজোনমণ্ডল**ঃ এই স্তর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উপরে প্রায় 30 কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরের বায়ুর মধ্যে **ওজোন নামে একরকম গ্যাস দেখা যায়**, সেইজন্য এই অঞ্চলকে **ওজোনোস্ফিয়ার** বা **ওজোনমণ্ডল** বলে। ওজোন গ্যাসের তাপ শোষণ করার ক্ষমতা অন্যান্য গ্যাসের চেয়ে বেশী, সেইজন্য এই স্তর **সূর্য-রশ্মির** (অতি বেগুনী রশ্মি) **অনেকটা শোষণ করে নেয়, ফলে এই অঞ্চলের উষ্ণতা বেশী**। এই স্তরের উপরের দিকের উষ্ণতা প্রায় 90°C। এই স্তর শব্দ প্রতিফলিত করতে পারে।

(4) **আয়নোস্ফিয়ার** বা **আয়নমণ্ডল**ঃ ওজোনোস্ফিয়ারের উপরের স্তরটিকে **আয়নোস্ফিয়ার** বা **আয়নমণ্ডল** বলে। এই **অঞ্চলটি তড়িৎবাহী ছোট ছোট কণায়** (আয়ন) ভর্তি। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও ওজোন গ্যাসগুলি এখানে আয়নিত অবস্থায় থাকে। **এই স্তর বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে**। এখানকার বায়ু খুবই হালকা। রেডিও স্টেশন থেকে যে সব গান, কবিতা, নাটক প্রচার করা হয় সেগুলি এই স্তরে প্রতিফলিত হয়ে তোমাদের রেডিওতে পৌঁছে যায়। মেরুপ্রদেশে ছয় মাস ধরে যখন রাত থাকে তখন ঐ অঞ্চলের আকাশের গায়ে **মেরুজ্যোতি** (Aurora) নামে একরকম আলো দেখা যায়। এই আলো এই স্তরেই উৎপন্ন হয়।

(5) **এক্সোস্ফিয়ার এবং ম্যাগনেটোস্ফিয়ার**ঃ আয়নোস্ফিয়ারের উপরে এই স্তর আছে। এই স্তরে প্রধানত হাইড্রোজেন গ্যাস আংশিক আয়নিত অবস্থায় থাকে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 400 কি. মি. উপরের উষ্ণতা প্রায় 2000°C।

- **বায়ুমণ্ডলের প্রয়োজনীয়তাঃ**
  - (i) পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল থাকার জন্য পৃথিবীর প্রাণী এবং উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারে।
  - (ii) পৃথিবীকে বায়ুমণ্ডল ঘিরে আছে বলে ক্ষতিকারক মহা-জাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে না।
  - (iii) বায়ুমণ্ডলই দিনের গরম এবং রাতের ঠাণ্ডা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে।
  - (iv) মহাকাশের জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড ভূ-পৃষ্ঠের উপর পড়ার আগেই বায়ুমণ্ডলে ঘর্ষণের ফলে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায়।

(v) বায়ুমণ্ডলে বায়ুপ্রবাহের জন্য পৃথিবীর বুকে ঝড়-বৃষ্টি হয়।

● বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরের উষ্ণতা ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতার চেয়ে কম হয় কেন?

ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতার চেয়ে উপরের বায়ুস্তরের উষ্ণতা কম, এর কারণ হল—

(i) উপরের বায়ুস্তরের ঘনত্ব অনেক কম, তাই যে সামান্য তাপ ঐ স্তর শোষণ করে, সেই তাপ সহজে বিকিরিত হয়ে যায়।

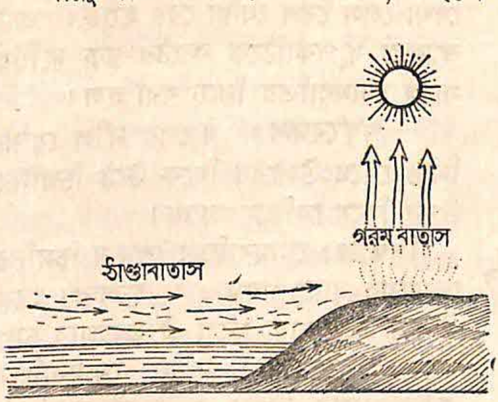
(ii) সূর্য থেকে বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ পৃথিবীতে আসে, তাই সূর্যকিরণে মাঝের বায়ুস্তর উত্তপ্ত হয় না।

(iii) বায়ুস্তরের উপরের অংশে ধূলিকণা এবং জলীয় বাষ্প কম থাকে, তাই ঐ স্তরে কম তাপ শোষিত হয়।

1.7 বায়ুর চলাচল (Ventilation)

বায়ু আমাদের **জীবন**। বায়ুর মধ্যে যে অক্সিজেন আছে, সেই অক্সিজেন গ্যাস দিয়েই আমরা নিঃশ্বাস নিই আর কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দিই।

বায়ু যদি স্থির হয়ে থাকতো, তাহলে যেখানে আমরা আছি—শ্বাস নেওয়ার ফলে শীঘ্রই সেখানের বায়ুর অক্সিজেন শেষ হয়ে যেতো, আর সেই জায়গা কার্বন ডাই-অক্সাইডে ভর্তি হয়ে যেতো। ঐ দূষিত বায়ু থেকে আমরা আর শ্বাস নিতে পারতাম না। তখন আমাদের অন্য জায়গায় গিয়ে



ওখানকার বায়ুর অক্সিজেন নিতে হতো—বায়ুর বদলে আমাদেরই ছুটোছুটি করতে হতো—এক জায়গায় স্থির থাকলে অক্সিজেনের অভাবে মারা যেতাম। বায়ুপ্রবাহ হয় বলে আমাদের এই অসুবিধা হয় না।

• **বায়ুপ্রবাহের কারণঃ**

(i) **বায়ু গরম হয়ে গেলে তার ঘনত্ব কমে যায়, ফলে হাল্‌কা হয়ে যায়। তখন ঐ হাল্‌কা বায়ু উপরে উঠে যায়।**

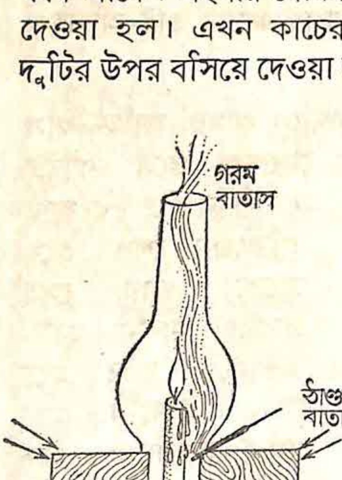
(ii) **বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী হলেও বায়ু হাল্‌কা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়।**

(iii) **এইভাবে গরম বায়ু বা জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু হাল্‌কা হয়ে উপরে উঠে গেলে ঐ জায়গার চাপ কমে যায় অথচ আশে-পাশের ঠাণ্ডা বায়ুর চাপ বেশী থাকে। জলের মত চাপের সমতা রাখার জন্য আশেপাশের ঠাণ্ডা ও ভারী বায়ু ঐ জায়গার দিকে ছুটে আসে। এইভাবে বায়ুপ্রবাহ হয়।**

• **বায়ু গরম হলে হাল্‌কা হয়ে উপরে উঠে যায়, আর ঠাণ্ডা বায়ু সেই জায়গায় ছুটে আসে**—এটা প্রমাণ করার জন্য নিচের পরীক্ষাটি করে দেখতে পার।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিঃ একটি কাচের চিমনি, একটি মোমবাতি, দুটি কাঠের ব্লক, একটি ধূপকাঠি।

পরীক্ষাঃ দুটি কাঠের ব্লক পাশাপাশি রাখা হল, যেন মাঝে কিছুটা ফাঁক থাকে। এইবার মোমবাতিটিতে দুটি কাঠের মাঝে বসিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হল। এখন কাচের চিমনিটি নিয়ে মোমবাতিটিকে ঘিরে কাঠ দুটির উপর বসিয়ে দেওয়া হল। দেখা গেল, মোমবাতিটি বেশ ভালভাবেই জ্বলছে। এখন ধূপকাঠিটি জ্বালিয়ে দেখা গেল বেশ ধোঁয়া বের হচ্ছে। এই জ্বলন্ত ধূপকাঠিকে কাঠের ব্লক দুটির মাঝে মোমবাতির নিচে ধরা হল।



পর্যবেক্ষণঃ ধূপের নীল ধোঁয়া নিচে নেমে উপরের দিকে উঠে চিমনির উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ মোমবাতির শিখায় চিমনির ভেতরের বায়ু গরম এবং হাল্‌কা হয়ে উপরে উঠে যায়, ফলে ঐ জায়গার চাপ অনেক কমে যায়। এখন মোমবাতির আশেপাশের ঠাণ্ডা ও ভারী বায়ু ঐ শূন্য জায়গা ভর্তি করতে ছুটে আসে। এইভাবে একটা বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। ধূপের ধোঁয়ার গতি দেখে এই বায়ুপ্রবাহের গতি বোঝা যায়।

• **স্বাস্থ্যরক্ষায় বায়ু চলাচলঃ** মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু আমাদের শরীরে

সজীবতা আনে, মন আনন্দে ভরে দেয়। তাই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বাসস্থানে বায়ু চলাচলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা দরকার।

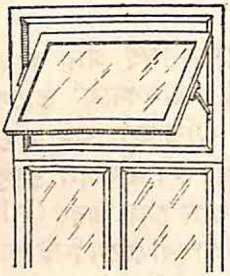
শ্বাস নেওয়ার সময় আমরা বায়ুর অক্সিজেন টেনে নিই আর কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প ছেড়ে দিই। এই শ্বাসকার্যে তাপের সৃষ্টি হয়। সুতরাং দেখা যায়, পরিত্যক্ত বায়ুতে অক্সিজেন কম থাকে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প বেশী থাকে। একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক লোক প্রতি ঘণ্টায় 0·49 ঘন মিটার বায়ু শ্বাস নেয় এবং 0·17 ঘন মিটার কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়। যে বায়ু আমরা টেনে নিই তার মধ্যে প্রায় 20·6% অক্সিজেন এবং 0·04% কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে। শ্বাস নেওয়ার পর যে বায়ু আমরা ছেড়ে দিই তার মধ্যে প্রায় 15·9% অক্সিজেন এবং 3·7% কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে।

• **ভেণ্টিলেশনের ব্যবস্থাঃ** ঘরের মধ্যে বা শ্রেণী-কক্ষের মধ্যে যেখানে অনেক লোক থাকে সেখানে একসঙ্গে অনেক মানুষের শ্বাসকার্য চলার ফলে ঐ ঘরের বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক কমে যায় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যায়। এর ফলে ঐ বায়ু দূষিত হয়ে পড়ে এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়। অনেকক্ষণ ধরে ঐ রকম ঘরে থাকলে মাথা ধরে, গা বমি বমি করে। সেখানকার গরম হয়ে ওঠা এই দূষিত বায়ু হাল্‌কা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। তাই ঘরে ভালভাবে বায়ু চলাচলের জন্য এই গরম বায়ুকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ করে দিতে হবে। সুতরাং, **ঘরের উপরের অংশের দেওয়ালে ঘুলঘুলি বা ফাঁক রাখলে ঘরের গরম বায়ু ঐ পথ দিয়ে বেরিয়ে যাবে আর বাইরের ঠাণ্ডা অক্সিজেনভরা ভারী বায়ু ঐ জায়গা দখল করতে ছুটে আসবে। এখন এই ঠাণ্ডা ভারী বায়ুকে ভেতরে আসার পথ করে দিতে হবে ঘরের দেওয়ালের নিচের অংশে বড় বড় দরজা-জানালা তৈরি করে।** এইভাবে ঘরের ভেতরের দূষিত বায়ুকে বাইরে বের করে দেওয়া এবং বাইরের বিশুদ্ধ বায়ুকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করানোর ব্যবস্থাকে বায়ু-চলাচল ব্যবস্থা বা **ভেণ্টিলেশন** বলে। আমাদের শরীরের সজীবতা এবং মনে প্রফুল্লতা আনার জন্য ঘরের মধ্যে বায়ু চলাচল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।



বায়ু-নিষ্কাশক বৈদ্যুতিক পাখা।

● **কৃত্রিম ভেণ্টিলেশন ব্যবস্থাঃ** আজকাল অনেক জায়গায় বড় বড় হল ঘরে, সিনেমা বা কারখানায়, পরীক্ষাগারে ঘুলঘুলির বদলে দেওয়ালের উপর অংশে **বায়ু-নিষ্কাশক বৈদ্যুতিক পাখা লাগিয়ে ভেতরের দূষিত বায়ুকে বাইরে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।** এর ফলে দূষিত বায়ু বেরিয়ে যায় এবং সেই শূন্যস্থান বিশুদ্ধ বায়ু দ্বারা পূর্ণ হয়। ঘরের উষ্ণতা মোটামুটি 60°F ও বায়ুর আর্দ্রতা 40% থাকলে এবং সেই সঙ্গে বায়ু চলাচলের সুন্দর ব্যবস্থা থাকলে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে আরামদায়ক হবে।



[শীতকালে দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে হ্যারিকেন বা জ্বলন্ত উনুন রেখে ঘুমোলে, ঘরের মধ্যস্থ বায়ুর অক্সিজেন ফুরিয়ে যায়, কেরোসিন বা কয়লার দহনে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। বন্ধ ঘরে বায়ু চলাচল না ঘটার জন্য ঐ বিষাক্ত গ্যাসের ক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটতে পারে। তাই এইরকম ঘরে ভাল ভেণ্টিলেশনের ব্যবস্থা থাকা উচিত।]

1.8 বেলুন (Balloon)

নীল আকাশে সুন্দর সাদা মেঘ ভেসে যায়। এই দেখে আগেকার কয়েকজন বিজ্ঞানীর ধারণা হয় যে, পাতলা থলির মধ্যে মেঘ ভর্তি করে ছেড়ে দিলে থলিটি মেঘের মত ভাসতে থাকবে। এর থেকেই বেলুনের আবিষ্কার।

আর্কিমিডিস সূত্রঃ স্থির তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে কোন বস্তুকে আংশিক বা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করলে, বস্তুটির যে অংশ ডুবে থাকে তার সমান আয়তন তরল বা গ্যাস অপসারিত হয়; ফলে বস্তুটির ওজন কমে যায় বলে মনে হয়। এই কমে যাওয়া ওজন, বস্তু দ্বারা ঐ অপসারিত তরল বা গ্যাসের ওজনের সমান হয়।

বেলুন বাতাসে ভেসে থাকার সময় বেলুনের উপর ঐ বেলুন দ্বারা অপসারিত বায়ু একটা ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে—এই বলকে **প্লবতা** (W_1) বলে।

(i) বেলুন এবং বেলুনের সঙ্গে আটকানো বস্তুর মোট ওজন (W_2) বায়ুর প্লবতার (W_1) চেয়ে কম হলে বেলুনটি উপরের দিকে উঠে যাবে।

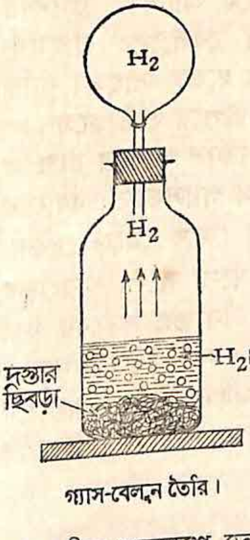
(ii) বেলুনের ওজন = অপসারিত বায়ুর ওজন হলে অর্থাৎ—

$W_2 = W_1$ হলে বেলুনটি আর উপরের দিকে না উঠে বায়ুর মধ্যেই কোন জায়গায় ভারশূন্য অবস্থায় ভাসতে থাকবে।

(iii) বেলুনের ওজন W_2, বেলুন দ্বারা অপসারিত বায়ুর ওজনের (W_1) চেয়ে বেশী হলে বেলুনটি নিচের দিকে নেমে যেতে থাকবে।

এখন বেলুনের মধ্যে বায়ুর চেয়ে হাল্‌কা গ্যাস—যেমন, **হাইড্রোজেন বা হিলিয়াম গ্যাস** ভর্তি থাকে ; যেহেতু এই গ্যাসভর্তি বেলুনের চেয়ে ওর সমআয়তন বায়ুর ওজন বেশী হয়, তাই বায়ুর প্লবতা অর্থাৎ ঊর্ধ্বচাপ বেলুনটিকে উপরের দিকে উঠিয়ে দেয়। এখন একটা গ্যাস-বেলুন তৈরি করা যাক্‌।

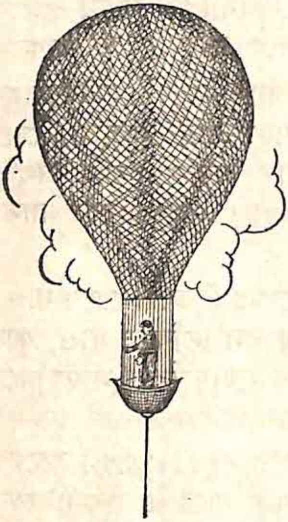
একটা বোতল নাও। বোতলটির মধ্যে জিঙ্কের টুকরো রেখে দাও। এইবার একটি কর্কের মধ্য দিয়ে একটা কাচের নল ঢুকিয়ে দাও, কাচ নলের উপরের দিকের মুখটি একটা বেলুনের মধ্যে ঢুকিয়ে সুতা দিয়ে বেঁধে দাও। তারপর বোতলের মধ্যে জল-মেশানো সালফিউরিক অ্যাসিড ঢেলে, বোতলের মুখটি ঐ কর্ক দিয়ে বন্ধ করে দাও। লক্ষ্য রেখো, নলটির নিচ প্রান্ত যেন অ্যাসিডতলের বেশ উপরে থাকে ও কর্কটি যেন বেশ শক্ত করে বন্ধ করা থাকে। এইবার দেখ, বেলুনটি ক্রমে ফুলছে। জিঙ্ক আর অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হচ্ছে। ঐ হাইড্রোজেন গ্যাস নলের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে বেলুনে জমছে—ফলে বেলুনটি ফুলে উঠছে। বেলুন যখন অনেকটা ফুলে উঠবে তখন বেলুনটিকে নল থেকে বের করে সুতা দিয়ে মুখটি বন্ধ করে ওকে নিয়ে বাইরে এসো, তারপর আকাশের দিকে ছেড়ে দাও—দেখ কেমন নাচতে নাচতে তোমার লাল বেলুনটি নীল আকাশে উড়ে যাচ্ছে। হাইড্রোজেন বায়ুর চেয়ে বেশী হাল্‌কা, তাই দেখতে দেখতে বেলুনটি অনেক উপরে চলে গেল। এখন ওকে ছোট্ট একটা লাল বিন্দুর মত দেখাচ্ছে—পরে আর দেখাই গেল না। নীল আকাশে তোমার বেলুনটি মিলিয়ে গেল।



গ্যাস-বেলুন তৈরি।

• **মানুষবাহী বেলুনঃ** সত্যিকারের বেলুন—যে বেলুনে চড়ে মানুষ আকাশে ওড়ে, সেটি একটি **সিল্কের** থলি। এর বাইরের দিকটা রবারের আস্তরণ দিয়ে বায়ু-নিরুদ্ধ করা থাকে। এই ব্যাগের

মধ্যে নিষ্ক্রিয় **হিলিয়াম গ্যাস ভর্তি** করে দেওয়া হয়। **হিলিয়াম বায়ুর চেয়ে অনেক হাল্‌কা** এবং **অদাহ্য**। ফলে এই গ্যাসভর্তি বেলুনটি আকাশে উড়ে যায়। বেলুনের সঙ্গে বাঁধা একটি আসনে যাত্রীরা বসে। প্রথম অবস্থায় বেলুনের নিচের অংশে বালির বস্তা রাখা থাকে। যাত্রীরা বেলুনটিতে উঠে বসার পর কয়েকটা বালির বস্তা ফেলে দেওয়া হয়। তখন বেলুনটি যাত্রীদের নিয়ে উপরের দিকে উঠে চলে। হাল্‌কা গ্যাসভর্তি বেলুনের ওজনের চেয়ে বেলুন দ্বারা অপসারিত বায়ুর ওজন বেশী হয়। তাই বেলুনটির উপর বায়ুর ঊর্ধ্বচাপ অর্থাৎ **প্লবতা** কাজ করে, ফলে বেলুনটি উপরের দিকে উঠে যায়। আবার একটি ছিদ্রপথ দিয়ে বেলুনের গ্যাস কিছুটা বের করে দিলে বেলুনের আয়তন কমে যায়। এই অবস্থায় বেলুনের ওজন বায়ুর প্লবতার চেয়ে বেশী হয়, ফলে বেলুনটি ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসে। ফ্রান্সের বিজ্ঞানী **রোজিয়ার, সর্বপ্রথম** 1783 খ্রীষ্টাব্দে বেলুনের সাহায্যে আকাশে ওড়েন। পরে **গ্লেসার ও কক্সওয়েল** নামে দুজন সাহসী ব্যক্তি বেলুনে চড়ে প্রায় 29,000 ফুট (8,700 মিটার) উপরে উঠেছিলেন।



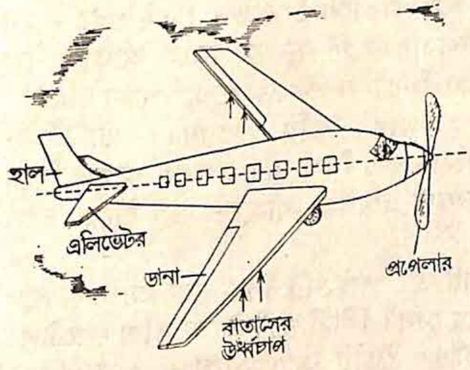
বেলুন।

বর্তমানে **বেলুনের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের চাপ ও উষ্ণতা সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়েছে।** হিলিয়াম গ্যাসভর্তি রবারের বেলুনে স্বয়ংক্রিয় ব্যারোমিটার এবং থার্মোমিটার রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়। বেলুনটি ক্রমে উপরের দিকে উঠতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় ব্যারোমিটার এবং থার্মোমিটার যন্ত্র বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার বায়ুচাপ ও উষ্ণতার পাঠ বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর উপর গ্রাহক যন্ত্রে পাঠায়। বর্তমানে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের চাপ, উষ্ণতা, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ইত্যাদি জানা সম্ভব হয়েছে।

1.9 এরোপ্লেন বা উড়োজাহাজ (Aeroplane)

উড়োজাহাজের ওজন, ওর সমান আয়তন বায়ুর ওজনের চেয়ে অনেক বেশী—কাজেই বেলুনের মত প্লবতার জন্য এর উপরের দিকে উঠে যাওয়া সম্ভব নয়। উড়োজাহাজ কি করে আকাশে ওঠে জানতে

হলে এর বিভিন্ন অংশের গঠন এবং কার্য জানা প্রয়োজন।



(i) **প্রপেলারঃ** এতে ব্লেডযুক্ত চাকা থাকে। এই প্রপেলারগুলিকে যন্ত্রের সাহায্যে প্রচণ্ড গতিতে ঘোরানো হয়, ফলে প্রপেলার-গুলি সামনের বায়ুকে ঠেলে পেছনের দিকে সরিয়ে দেয়। এর ফলে **যে বিপরীতমুখী বলের সৃষ্টি হয়, তার দ্বারা এরোপ্লেনটি সামনের দিকে তীব্র বেগে এগিয়ে যায়।**

(ii) **ডানাঃ** এরোপ্লেনের ডানা থাকে। উড়োজাহাজের গতির অভিমুখের সঙ্গে সামান্য কোণ করে ডানাগুলি অবস্থান করে। উড়োজাহাজের গতিবেগ বাড়ার জন্য এরোপ্লেনের গতির বিপরীত দিকে প্রবল বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই বায়ুপ্রবাহ তখন **এরোপ্লেনের ডানার উপর একটি প্রচণ্ড ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে।** এই ঊর্ধ্বমুখী বলের ক্রিয়ায় ডানার সাহায্যে বায়ুর মধ্যে এটা উড়তে পারে। **তীব্র সম্মুখগতির জন্য এই আকাশযান পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলকে অতিক্রম করে উপরে উঠে যায়।**

(iii) **হালঃ** উড়োজাহাজের পেছনদিকে একটি হাল থাকে—এর সাহায্যে উড়োজাহাজের গতিপথ পরিবর্তন করা যায়।

(iv) **এলিভেটারঃ** উড়োজাহাজের পেছনদিকে এলিভেটার থাকে। এর সাহায্যে উড়োজাহাজের মুখ উপরের দিকে বা নিচের দিকে করা যায়।

বর্তমানে জেট প্লেনে, প্রপেলারের বদলে পেছনদিকে প্রচণ্ড ধাক্কা সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে—এতে হাউইয়ের মত পেছনদিকে প্রচণ্ড বেগে গ্যাস বেরোয়, ফলে প্রতিক্রিয়া বলের প্রভাবে তীব্রবেগে প্লেনটি সামনের দিকে ছুটে যায়। একেই জেট প্লেন বলে। বর্তমানে শক্তিশালী জেট ব্যবহার করে শব্দের বেগে জেট প্লেন আকাশে উড়তে পারে।

1.10 রাইট ভ্রাতৃদ্বয়

অরভিল রাইট (জন্ম—1871 খ্রীষ্টাব্দ এবং মৃত্যু—1948 খ্রীষ্টাব্দ) এবং **উইলবার রাইট** (জন্ম—1867 খ্রীষ্টাব্দ এবং মৃত্যু—1912 খ্রীষ্টাব্দ)ঃ এঁরা দুই ভাই। উইলবার **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানা** রাজ্যে 1867 খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁর ভাই অরভিল **ওহিও** রাজ্যে 1871 খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা সাধারণ ঘরের ছেলে—ডাটন শহরে

এঁদের একটা সাইকেল মেরামতির দোকান ছিল। 1895 খ্রীষ্টাব্দে একদিন এক অদ্ভুত খবর শোনা গেল—'অটো লিলিয়েনথ্যাল নামে এক জার্মান এঞ্জিনিয়ার ডানা তৈরি করে আকাশে উড়েছেন'। এই খবর শুনে অরভিল রাইট ও তাঁর দাদা উইলবার রাইট দুজনে মিলে আকাশে কি করে ওড়া যায় এই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে শুরু করেন। 1900 খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা দুই ভাই গ্লাইডার তৈরি করেন। এটা ছিল উড়োজাহাজেরই মত, শুধু চালাবার যন্ত্র ছিল না। তোমরা কাগজ দিয়ে যে উড়োজাহাজ তৈরি কর অনেকটা ঐরকম—বায়ুতে ভর দিয়ে ভেসে চলতো।

ফিটিহক নামে এক জায়গায় ঐ গ্লাইডার বিমানকে আকাশ-পথে চালিয়ে তাঁরা সবাইকে অবাক করে দেন। 1903 খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা পেট্রোল-চালিত ইঞ্জিন দিয়ে একটি বাইপ্লেন তৈরি করে আকাশে ওড়েন। এর পর আরো উন্নত ধরনের বিমান তাঁরা তৈরি করেন। 1908 খ্রীষ্টাব্দে উইলবার তাঁদের তৈরি বিমানে একজন আরোহী নিয়ে এক ঘণ্টারও বেশী সময় আকাশে উড়ে বেড়ান। অরভিল রাইট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিমানবিদ্যা উপদেষ্টা সংস্থার সদস্য হন। তিনি জাতীয় বিমান একাডেমির সদস্য ছিলেন।

হাইড্রোজেন (Hydrogen)

চিহ্ন—H   পারমাণবিক গুরুত্ব—1   আণবিক সঙ্কেত—H_2

হাইড্রোজেন গ্যাস হল সবচেয়ে হালকা মৌল। হাইড্রোজেনের অণু 2টি পরমাণু দ্বারা গঠিত। পেট্রোলিয়ামের খনিতে হাইড্রোজেনকে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। 1630 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী **ভ্যান হেলমট** সর্বপ্রথম হাইড্রোজেন আবিষ্কার করেন।

1.11 হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রস্তুতি (Preparation of Hydrogen)

• পরীক্ষাগার প্রস্তুতিঃ

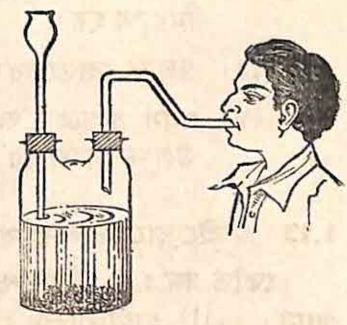
(A) **নীতিঃ** সাধারণ উষ্ণতায় **জিঙ্কের ছিবড়ার সঙ্গে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের** রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{জিঙ্ক}}{Zn} + \underset{\text{লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড}}{H_2SO_4} = \underset{\text{জিঙ্ক সালফেট}}{ZnSO_4} + \underset{\text{হাইড্রোজেন}}{H_2\uparrow}$$

(B) **পদ্ধতিঃ** (i) একটি উল্‌ফ বোতলে কিছু জিঙ্কের ছিবড়া নিয়ে, উল্‌ফ বোতলটির এক মুখে কর্কের মধ্য দিয়ে একটি দীর্ঘনল ফানেল প্রবেশ করানো হল। দীর্ঘনল ফানেলের শেষ প্রান্তটি যেন

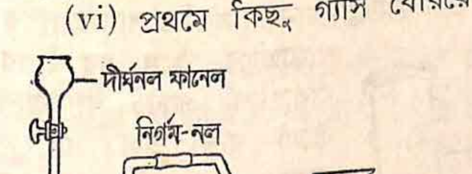
বোতলের তলের কাছাকাছি পোঁছায়। (ii) বোতলের অপর মুখে কর্কের মধ্য দিয়ে একটি নির্গম-নল লাগানো হল। নির্গম-নলটি উল্‌ফ বোতলের মধ্যে সামান্য একটু ভেতরে প্রবেশ করানো থাকে। (iii) এখন দীর্ঘনল ফানেলের মধ্য দিয়ে উল্‌ফ বোতলের মধ্যে কিছু জল ঢালা হল—লক্ষ্য রাখা হল জিঙ্কের ছিবড়া এবং দীর্ঘনল ফানেলের শেষ প্রান্তটি যেন জলে ডুবে থাকে।

(iv) এখন উল্‌ফ বোতলটি বায়ুনিরুদ্ধ হয়েছে কি না পরীক্ষা করার জন্য নির্গম-নলের শেষ প্রান্তে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দেওয়া হল—দেখা গেল দীর্ঘনল ফানেলের মধ্যে কিছু জল উপরে উঠে গেল। এখন নির্গম-নলের শেষ প্রান্তটিকে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে বন্ধ করা হল। এই অবস্থায় দীর্ঘনল ফানেলে উঠে আসা জলস্তম্ভটি যদি এক জায়গায় স্থির থাকে, তবে বুঝতে হবে যে, বোতলটি বায়ুনিরুদ্ধ হয়েছে।



(v) এইবার দীর্ঘনল ফানেলের সাহায্যে কিছু পরিমাণ লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড উল্‌ফ বোতলের মধ্যে ঢালা হল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, জিঙ্কের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস বেরুতে শুরু করলো।

(vi) প্রথমে কিছু গ্যাস বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয়—এইভাবে বোতলের ভেতরের বাতাস সব বেরিয়ে গেলে পর নির্গম-নলের শেষ প্রান্তটিকে জলভর্তি একটি গ্যাসদ্রোণীর মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হল। (vii) এই অবস্থায় জলভর্তি একটি গ্যাসজারকে নির্গম-নলের শেষ প্রান্তের উপর উপুড় করে বসানো হল।



হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুতি।

(C) **সংগ্রহঃ** যেহেতু হাইড্রোজেন গ্যাস জলে অদ্রাব্য তাই জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা গ্যাসজারে হাইড্রোজেন গ্যাস জমা হয়।

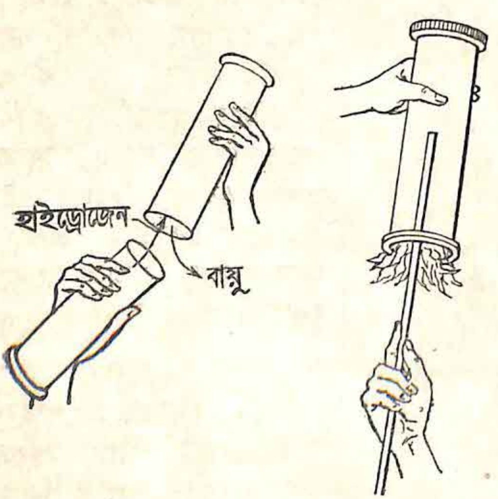
- **হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুতির সময় সতর্কতাঃ**
  (i) দীর্ঘ-নল ফানেলের শেষ প্রান্তটি এবং জিঙ্কের টুকরাগুলি যেন অ্যাসিডের মধ্যে ডুবে থাকে।
  (ii) যে গ্যাসজারে H_2 সংগ্রহ করা হয় তার মধ্যে যেন বাতাস না থাকে।
  (iii) কর্ক এবং নলযুক্ত উল্‌ফ বোতলটি যেন সম্পূর্ণ বায়ু-নিরুদ্ধ হয়।
  (iv) উল্‌ফ বোতলের কাছাকাছি যেন আগুন না থাকে।
  (v) গ্যাস সংগ্রহের আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে যেন উল্‌ফ বোতলের মধ্যের বাতাস সব বেরিয়ে যায়।

1.12 হাইড্রোজেনের ধর্ম (Properties of Hydrogen)

ভৌত ধর্মঃ (i) বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন গ্যাস। (ii) হাইড্রোজেন জলে অদ্রাব্য। (iii) **হাইড্রোজেন সবচেয়ে হাল্‌কা মৌল।** একটা বেলুনের মধ্যে হাইড্রোজেন ভর্তি করে ছেড়ে দাও, দেখবে তোমার বেলুনটি হেলতে-দুলতে আকাশের দিকে উঠে গেল।

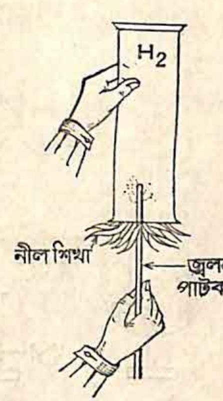
হাইড্রোজেন বায়ুর চেয়ে হাল্‌কাঃ

পরীক্ষাঃ একটি ঢাকনা দেওয়া হাইড্রোজেন গ্যাসভর্তি গ্যাসজারকে খাড়াভাবে রেখে এর উপর বায়ুপূর্ণ একটি গ্যাসজার উল্টে রাখা হল। এইবার মাঝের ঢাকনাটি সরিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে উপরের গ্যাসজারটি সরিয়ে ওর মধ্যে একটি জ্বলন্ত পাটকাঠি প্রবেশ করালে ভেতরের গ্যাসটি শব্দ করে নীল শিখায় জ্বলে উঠলো। হাইড্রোজেন গ্যাস বায়ুর চেয়ে হাল্‌কা বলে উপরের জারে উঠে গেছে। এতে প্রমাণিত হল যে, হাইড্রোজেন বায়ুর চেয়ে হাল্‌কা।



রাসায়নিক ধর্ম ঃ

(i) **হাইড্রোজেন গ্যাস নিজে জ্বলে কিন্তু অপর পদার্থকে জ্বলতে সাহায্য করে না।** হাইড্রোজেন গ্যাসভর্তি একটি গ্যাসজারকে উপুড় করে ধরে ওর মধ্যে একটি জ্বলন্ত পাটকাঠি ঢুকিয়ে দাও, দেখবে পাটকাঠিটি নিভে গেল **অথচ হাইড্রোজেন গ্যাস সামান্য নীল শিখার সঙ্গে জ্বলতে থাকলো।**



H_2 নিজে জ্বলে কিন্তু জ্বলতে সাহায্য করে না।

(ii) **হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের মিশ্রণে আগুন দিলে বিস্ফোরণ সহ বিক্রিয়া ঘটে।**

একটি বাটিতে সাবান-জল রাখ। একটি নলের মধ্য দিয়ে এর মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস চালাও, দেখবে অনেক বুদ্‌বুদ তৈরি হয়েছে। এবার আর একটি নলের মধ্য দিয়ে এই বুদ্‌বুদগুলির মধ্যে অক্সিজেন গ্যাস চালাও, তারপর ঐ **ফেনায়** আগুন দাও, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চমকে উঠবে সবাই।

(iii) **হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন গ্যাস মিশিয়ে আলোতে রাখলে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস তৈরি হয়।**

$$\underset{\text{হাইড্রোজেন}}{H_2} + \underset{\text{ক্লোরিন}}{Cl_2} = \underset{\text{হাইড্রোজেন ক্লোরাইড}}{2HCl}$$

(iv) **গন্ধক গরম করে,** ওর উপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করলে **পচা ডিমের মত গন্ধবিশিষ্ট হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।**

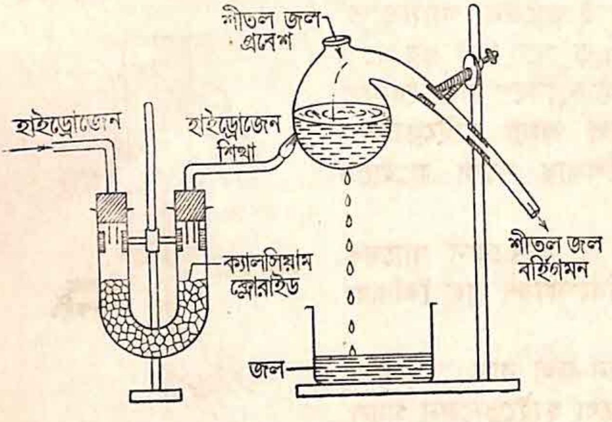
$$\underset{\text{হাইড্রোজেন}}{H_2} + \underset{\text{গন্ধক}}{S} = \underset{\text{হাইড্রোজেন সালফাইড}}{H_2S}$$

(v) **হাইড্রোজেন গ্যাস বাতাসের মধ্যে জ্বলার সময়, বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল উৎপন্ন হয়।**

$$\underset{\text{হাইড্রোজেন}}{2H_2} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{O_2} = \underset{\text{জল}}{2H_2O}$$

পরীক্ষা ঃ হাইড্রোজেন গ্যাসকে অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের মধ্য দিয়ে চালিয়ে জলশূন্য করে একটি সরু মুখবিশিষ্ট কাচনলের মুখ থেকে বের করিয়ে আগুন ধরানো হল। দেখা গেল, হাইড্রোজেন বাতাসের মধ্যে

নীল শিখায় জ্বলছে। এই শিখাটিকে একটি বকযন্ত্রের গায়ে লাগানো হল, আর বকযন্ত্রের মধ্যে ঠান্ডা জলের ধারা চালানো হল। দেখা গেল, বকযন্ত্রের বাইরের গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমছে, আর ফোঁটার আকারে নিচের বীকারে জমা হচ্ছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হাইড্রোজেন গ্যাস বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল উৎপন্ন করে।



বাতাসের হাইড্রোজেন পুড়ে জল উৎপন্ন করে।

(vi) 550°C **উষ্ণতায় 200 বায়ুমণ্ডল চাপে নাইট্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। লৌহচূর্ণ অনুঘটক-রূপে ব্যবহৃত হয়।**

$$N_2 + 3H_2 = 2NH_3$$

নাইট্রোজেন — অ্যামোনিয়া

(vii) উত্তপ্ত **সোডিয়াম** ধাতুর সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম হাইড্রাইড উৎপন্ন হয়।

$$2Na + H_2 = 2NaH$$

সোডিয়াম — সোডিয়াম হাইড্রাইড

(viii) **বিজারণ ধর্ম: উচ্চ উষ্ণতায় হাইড্রোজেন গ্যাস বিজারণ করে।**

উত্তপ্ত কালো রঙের কিউপ্রিক অক্সাইডের উপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করলে কালো কিউপ্রিক অক্সাইড বিজারিত হয়ে লাল রঙের ধাতব কপার উৎপন্ন করে।

$$CuO + H_2 = Cu + H_2O$$

কিউপ্রিক অক্সাইড — হাইড্রোজেন — কপার — জল

(ix) **অন্তর্ধৃতি: লোহা, প্যালাডিয়াম, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু হাইড্রোজেন গ্যাসকে শোষণ করে। এই ঘটনাকে অন্তর্ধৃতি বলে।**

(x) **জায়মান হাইড্রোজেনঃ** রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যখন কোন যৌগ থেকে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়, তখন সদ্য উৎপন্ন হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি মুক্ত অবস্থায় থাকে। এই সদ্যোজাত হাইড্রোজেনকে জায়মান হাইড্রোজেন বলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পর যুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন অণুতে পরিণত হয়। একেই সাধারণ হাইড্রোজেন বলে। জায়মান হাইড্রোজেন সাধারণ হাইড্রোজেনের চেয়ে বেশী সক্রিয়।

হলুদ বর্ণের ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণে সাধারণ হাইড্রোজেন গ্যাস অনেকক্ষণ ধরে চালনা করলেও দ্রবণের বর্ণের কোন পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ কোন বিক্রিয়া হয় না। এখন একটি টেস্ট-টিউবে হলুদ বর্ণের ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ নিয়ে ওর মধ্যে একটুকরা জিঙ্ক এবং লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করলে সদ্যোজাত হাইড্রোজেন নির্গত হয়, যা ফেরিক ক্লোরাইডকে বর্ণহীন ফেরাস ক্লোরাইডে পরিণত করে, ফলে দ্রবণের হলুদ বর্ণ বর্ণহীন হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জায়মান হাইড্রোজেন সাধারণ হাইড্রোজেনের চেয়ে বেশী সক্রিয়।

অক্সিজেন (Oxygen)

চিহ্ন—O পারমাণবিক গুরুত্ব—16 আণবিক সঙ্কেত—O_2

অক্সিজেন খুব সক্রিয় মৌল। প্রায় সব পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেন বিক্রিয়া করে বলে অক্সিজেনকে যৌগ রূপে প্রকৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন মৌল রূপে অবস্থান করে। দুটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে অক্সিজেন অণু গঠন করে। তিনটি করে অক্সিজেন পরমাণু পরস্পর যুক্ত হয়ে ওজোন (O_3) গ্যাসের অণু গঠন করে। এই গ্যাসের আঁসটে গন্ধ আছে।

1.13 অক্সিজেন গ্যাসের প্রস্তুতি (Preparation of Oxygen)

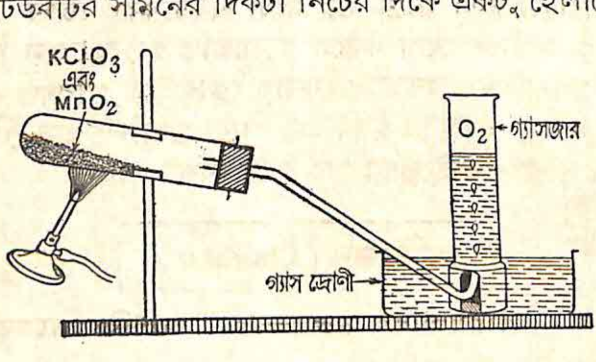
• **পরীক্ষাগার প্রস্তুতিঃ**

(A) **নীতিঃ পটাসিয়াম ক্লোরেটকে খুব উত্তপ্ত করলে** (630°C) **পটাসিয়াম ক্লোরাইড** এবং **অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে** ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড মেশালে অল্প তাপে (230°C—250°C) এবং তাড়াতাড়ি অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় **ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইডের** কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না অথচ উপস্থিত থেকে বিক্রিয়াটিকে দ্রুত করে, তাই এই বিক্রিয়ায় **ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড** (MnO_2) একটি অনুঘটকরূপে ব্যবহৃত হয়।

$$2KClO_3 + [MnO_2] \xrightarrow{\text{উত্তপ্ত}} 2KCl + 3O_2 + [MnO_2]$$

পটাসিয়াম ক্লোরেট ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড পটাসিয়াম ক্লোরাইড অক্সিজেন

(B) **পদ্ধতিঃ** (i) **চার ভাগ ওজনের পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে এক ভাগ ওজনের বিশুদ্ধ ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড ভাল করে মিশিয়ে** মিশ্রণটিকে একটা হার্ডগ্লাস টেস্ট-টিউবের মধ্যে অর্ধেকটা ভর্তি করা হল। (ii) টেস্ট-টিউবটির মুখে কর্কের মধ্য দিয়ে একটি নির্গম-নল টেস্ট-টিউবটির মধ্যে সামান্য প্রবেশ করানো হল। নির্গম-নলের শেষ প্রান্তটি একটি জলভর্তি গ্যাসদ্রোণীর মধ্যে ডোবানো থাকে। (iii) **টেস্ট-টিউবটিকে** ক্ল্যাম্পের সাহায্যে দণ্ডের সঙ্গে এমনভাবে আটকানো হল যেন টেস্ট-টিউবটির সামনের দিকটা নিচের দিকে একটু হেলানো থাকে।



অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুতি।

(iv) এখন টেস্ট-টিউবটিকে বার্নার দিয়ে সমানভাবে উত্তপ্ত করা হল। দেখা গেল, নির্গম-নলের শেষ প্রান্তে গ্যাস বেরোচ্ছে। (v) কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, টেস্ট-টিউবের ভেতরের সব বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার পর একটি জলভর্তি গ্যাসজারকে নির্গম-নলের শেষ প্রান্তের উপরে উপুড় করে রাখা হল।

(C) **সংগ্রহঃ** অক্সিজেন গ্যাস বায়ুর চেয়ে সামান্য ভারী এবং জলে খুব সামান্য দ্রাব্য, তাই জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা গ্যাসজারে এই গ্যাস জমা হয়। সমস্ত গ্যাসজারটি অক্সিজেন গ্যাস দ্বারা ভর্তি হলে পর গ্যাসজারের মুখটি জলের নিচে রেখেই ঢাকনি দিয়ে বন্ধ করে গ্যাস-জারটিকে জলের বাইরে এনে সোজাভাবে রাখা হয়।

● **সতর্কতাঃ** (i) ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড এবং পটাসিয়াম ক্লোরেটের মিশ্রণটিকে ভাল করে মেশাতে হবে।

(ii) ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইডের মধ্যে যেন চারকোল অশুদ্ধি না থাকে তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(iii) টেস্ট-টিউবের মিশ্রণটিকে সমভাবে উত্তপ্ত করতে হবে। প্রবল বেগে গ্যাস বের হলে বার্নার সরিয়ে নিতে হবে।

(iv) টেস্ট-টিউবটিকে নির্গম-নলের দিকে একটু কাত করে রাখতে হবে যেন উৎপন্ন O_2 গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার পথ পায়।

(v) পরীক্ষার পর নির্গম-নলটিকে জলের উপর রাখতে হবে। তা না হলে গরম টেস্ট-টিউবের মধ্যে জল ঢুকে ওকে ফাটিয়ে দেবে।

(vi) টেস্ট-টিউবে রাখা মিশ্রণের উপরের দিকে কিছুটা জায়গা খালি রাখতে হবে।

• **অনুঘটক এবং অনুঘটনঃ যে রাসায়নিক পদার্থ কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উপস্থিত থেকে বিক্রিয়ার বেগ বাড়ায় বা কমায়, অথচ বিক্রিয়া শেষে যার নিজের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না, তাকে অনুঘটক বলে।** দেখা গেছে শুধু পটাসিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করলে 630°C উষ্ণতায় খুব ধীরে ধীরে পটাসিয়াম ক্লোরেট বিয়োজিত হয়ে সামান্য O_2 গ্যাস দেয়, কিন্তু পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে MnO_2 উপস্থিত থাকলে কম উষ্ণতায় (230°C) $KClO_3$-এর দ্রুত বিয়োজন ঘটে বেশী পরিমাণ O_2 উৎপন্ন করে। এখানে $KClO_3$-এর বিয়োজনে MnO_2 উপস্থিত থেকে বিক্রিয়ার গতি বাড়ায় কিন্তু নিজের রাসায়নিক ধর্ম বা ওজনের কোন পরিবর্তন হয় না, তাই এখানে MnO_2 একটি **অনুঘটক**। এই ঘটনাকে অনুঘটন বলা হয়।

1.14 অক্সিজেনের ধর্ম (Properties of Oxygen)

(A) **ভৌত ধর্মঃ** (i) অক্সিজেন গ্যাসের কোন বর্ণ নেই, গন্ধ নেই, কোন স্বাদও নেই।

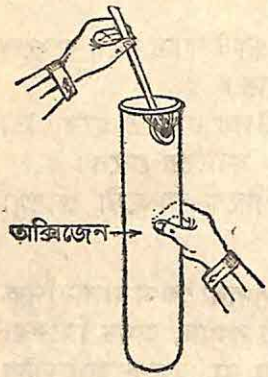
(ii) এই গ্যাস বাতাসের চেয়ে সামান্য ভারী, জলে সামান্য দ্রবীভূত হয়।

(iii) অক্সিজেন গ্যাস আমাদের শ্বাসকার্যে সাহায্য করে।

(B) **রাসায়নিক ধর্মঃ** (i) **অক্সিজেনে দহন ও অক্সাইড গঠনঃ** অক্সিজেন গ্যাস নিজে জ্বলে না, কিন্তু অন্য পদার্থকে জ্বলতে সাহায্য করে, অর্থাৎ অক্সিজেন দহনের সহায়ক।

(a) **অধাতুর দহন—আম্লিক অক্সাইড উৎপাদনঃ কার্বন, গন্ধক, ফসফরাস** প্রভৃতি মৌলগুলিকে অধাতু বলে। অক্সিজেনের সঙ্গে এই অধাতুগুলির রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে অক্সাইড নামে একরকম যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। **অধাতুর অক্সাইডগুলিকে আম্লিক অক্সাইড বলে,** কারণ এইগুলি জলে দ্রবীভূত হলে অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

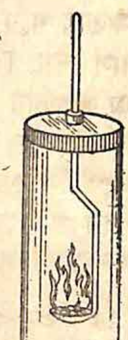
পরীক্ষাঃ (i) **একটা উজ্জ্বলন চামচে একটুকরো কাঠকয়লা** রেখে বার্নার দিয়ে ওতে আগুন ধরিয়ে অক্সিজেন-ভর্তি একটা গ্যাসজারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। দেখা গেল কাঠ-কয়লার টুকরাটি আরো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। অক্সিজেনের মধ্যে কাঠকয়লাটি পুড়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। এখন উজ্জ্বলন চামচটি সরিয়ে সামান্য জল গ্যাসজারের মধ্যে ঢেলে ভাল করে নেড়ে দিলে কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এই জলের সামান্য একটু জিভে নিয়ে স্বাদ নিলে দেখা যাবে একটু টক লাগছে। **নীল লিটমাস দ্রবণ যোগ করলে দেখা গেল—লাল হয়ে গেল।** এর দ্বারা প্রমাণিত হল, উৎপন্ন **কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে মিশে কার্বনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে,** তাই নীল লিটমাস লাল হয়ে যায়।



$$C + O_2 = CO_2$$
কার্বন + অক্সিজেন = কার্বন ডাই-অক্সাইড

$$CO_2 + H_2O = H_2CO_3$$
কার্বন ডাই-অক্সাইড + জল = কার্বনিক অ্যাসিড

(ii) **একটুকরা গন্ধক** বার্নারে জ্বালিয়ে অক্সিজেন গ্যাসভর্তি গ্যাসজারের মধ্যে প্রবেশ করানো হল; দেখা গেল যে, **গন্ধক সুন্দর নীল শিখায় জ্বলছে।** গন্ধক, অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে **জ্বলে সালফার ডাই-অক্সাইড** নামে ঝাঁঝালো গন্ধবিশিষ্ট বর্ণহীন গ্যাস উৎপন্ন করে। গ্যাসজারের মধ্যে সামান্য জল ঢেলে নেড়ে দিলে সালফার ডাই-অক্সাইড জলে মিশে **সালফিউরাস অ্যাসিড** উৎপন্ন করে। এর মধ্যে নীল লিটমাস দিলে লাল হয়ে যাবে।



O_2—এর মধ্যে গন্ধকের দহন।

$$S + O_2 = SO_2$$
গন্ধক + অক্সিজেন = সালফার ডাই-অক্সাইড

$$SO_2 + H_2O = H_2SO_3$$
সালফার ডাই-অক্সাইড + জল = সালফিউরাস অ্যাসিড

(ii) **একটুকরা ফসফরাসে** আগুন ধরিয়ে অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে প্রবেশ করালে উজ্জ্বল শিখা উৎপন্ন করে জ্বলতে

থাকে। ফসফরাস পুড়ে **ফসফরাস পেণ্টক্সাইড** উৎপন্ন করে এবং এর সাদা ধোঁয়ায় গ্যাসজার ভর্তি হয়ে যায়। গ্যাসজারের মধ্যে সামান্য জল ঢেলে ভাল করে নেড়ে ওর মধ্যে নীল লিটমাস দ্রবণ যোগ করলে লাল হয়ে যায়, কারণ P_2O_5 জলে মিশে ফসফরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

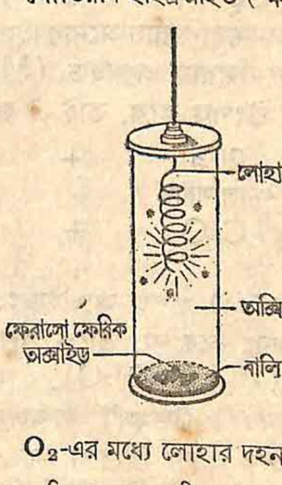
$4P$	+	$5O_2$	=	$2P_2O_5$
ফসফরাস		অক্সিজেন		ফসফরাস পেণ্টক্সাইড

(b) **ধাতুর দহন—ধাতব অক্সাইড বা ক্ষারকীয় অক্সাইড উৎপাদনঃ** সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন প্রভৃতি ধাতুগুলি উত্তপ্ত অবস্থায় অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ধাতব অক্সাইড উৎপন্ন করে। এই জাতীয় অক্সাইডকে **ক্ষারকীয় অক্সাইড বলে।** কারণ এই জাতীয় অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হলে ক্ষার উৎপন্ন করে।

(i) একটি উজ্জ্বলন চামচে **একটুকরো সোডিয়াম** নিয়ে গরম করে অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে প্রবেশ করানো হল। দেখা গেল, **সোডিয়াম সোনালী শিখা উৎপন্ন করে জ্বলছে।** সোডিয়ামের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় **সোডিয়াম মনোক্সাইড** উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে জল দিলে সোডিয়াম মনোক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয়ে **সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড** নামে ক্ষার উৎপন্ন করে, যা লাল লিটমাসকে নীল করে দেয়।

$4Na$	+	O_2	=	$2Na_2O$
সোডিয়াম		অক্সিজেন		সোডিয়াম মনোক্সাইড
Na_2O	+	H_2O	=	$2NaOH$
সোডিয়াম মনোক্সাইড		জল		সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (ক্ষার)

(ii) **একটা লোহার তারকে** লোহিত-তপ্ত করে অক্সিজেনপূর্ণ একটা গ্যাস-জারের মধ্যে প্রবেশ করানো হল। দেখা গেল, ফুলঝুরির মত আগুনের ফুলকি উৎপন্ন করে লোহার তারটি জ্বলছে। বিক্রিয়া শেষ হলে বাদামী রঙের **ফেরোসোফেরিক অক্সাইড** উৎপন্ন হয়।



$3Fe$	+	$2O_2$	=	Fe_3O_4
লোহা		অক্সিজেন		ফেরোসোফেরিক অক্সাইড

O_2-এর মধ্যে লোহার দহন।

(iii) একটি জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর ফিতাকে অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে প্রবেশ করালে তীব্র আলো উৎপন্ন করে জ্বলতে থাকে।

ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে সাদা রঙের ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে।

$$2Mg \quad + \quad O_2 \quad = \quad 2MgO$$

1.15 অক্সাইড এবং অক্সাইডের শ্রেণীবিভাগ

অক্সাইডঃ কোন মৌল, অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা যুক্ত হয়ে যে দ্বিযৌগ উৎপন্ন করে, তাকে ঐ মৌলের অক্সাইড বলে। অক্সাইডকে মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(i) **আম্লিক অক্সাইডঃ যে অক্সাইড ক্ষার বা ক্ষারকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে এবং যে অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হলে অ্যাসিড উৎপন্ন করে, তাকে আম্লিক অক্সাইড বলে।**

অধাতুর সঙ্গে O_2-এর বিক্রিয়ায় এই জাতীয় অক্সাইড উৎপন্ন হয়। যেমন—সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), ফসফরাস পেণ্টক্সাইড (P_2O_5) ইত্যাদি। এরা জলে দ্রবীভূত হয়ে অ্যাসিড উৎপন্ন করে, তাই এদের জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল করে।

$$\underset{\text{কার্বন}}{C} + O_2 = \underset{\text{কার্বন ডাই-অক্সাইড}}{CO_2} \qquad CO_2 + H_2O = \underset{\text{কার্বনিক অ্যাসিড}}{H_2CO_3}$$

(ii) **ক্ষারকীয় অক্সাইডঃ যে অক্সাইড অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে এবং যে অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হলে ক্ষার উৎপন্ন করে, তাকে ক্ষারকীয় অক্সাইড বলে।**

ধাতুর সঙ্গে O_2-এর বিক্রিয়ায় এই জাতীয় অক্সাইড উৎপন্ন হয়। যেমন—সোডিয়াম মনোক্সাইড (Na_2O), ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO), ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (MgO) ইত্যাদি। এরা জলে দ্রবীভূত হলে ক্ষার উৎপন্ন করে, তাই ঐ জলীয় দ্রবণ লাল লিটমাসকে নীল করে।

$$\underset{\text{ক্যালসিয়াম}}{2Ca} \quad + \quad O_2 \quad = \quad \underset{\text{ক্যালসিয়াম অক্সাইড}}{2CaO}$$

$$CaO \quad + \quad H_2O \quad = \quad \underset{\text{ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড (ক্ষার)}}{Ca(OH)_2}$$

(iii) **প্রশম অক্সাইডঃ যে অক্সাইড অ্যাসিড বা ক্ষারকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না, তাকে প্রশম অক্সাইড বলে।** যেমন—নাইট্রিক অক্সাইড (NO), জল (H_2O), কার্বন মনোক্সাইড (CO) ইত্যাদি।

(iv) **উভধর্মী অক্সাইডঃ যে অক্সাইড অ্যাসিড অথবা ক্ষারক উভয়ের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে, তাকে উভধর্মী অক্সাইড বলে।** অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3), জিঙ্ক অক্সাইড (ZnO) এই জাতীয় অক্সাইড।

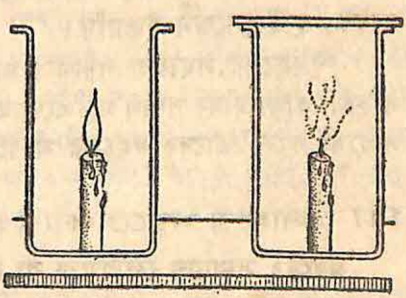
(v) **পারক্সাইডঃ** যে অক্সাইড লঘু অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং লবণ উৎপন্ন করে, তাকে **পারক্সাইড** বলে। যেমন—বেরিয়াম পারক্সাইড (BaO_2)।

1.16 দহন (Combustion)

একটি ম্যাগনেসিয়াম ফিতাকে বার্নারের মধ্যে ধর, দেখবে ম্যাগনেসিয়াম ফিতায় আগুন ধরে গেল, আর চোখ-ধাঁধানো সাদা আলো এবং তাপ উৎপন্ন করে ফিতাটি পুড়তে লাগলো। কাগজ, কাঠ, কেরোসিন, পেট্রোল প্রভৃতি পদার্থে আগুন ধরালে ঐগুলি জ্বলতে থাকে এবং আলোক ও তাপ সৃষ্টি করে।

● **দহনঃ দুই বা ততোধিক পদার্থের মধ্যে দ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হলে, ঐ বিক্রিয়াকে দহন বলে।** কাপড় পোড়ালে জ্বলে ওঠে, মোমবাতি জ্বলে, ক্লোরিনের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বলে—এইগুলি সবই দহনের উদাহরণ। সাদা ফসফরাস বায়ুর সংস্পর্শে এলে নিজে থেকে জ্বলে উঠে—এই পদার্থ-গুলিকে দাহ্য পদার্থ বলে এবং জ্বলন প্রক্রিয়াকে **দহন** বলে। বায়ুর মধ্যে জ্বলার সময় পদার্থগুলি বায়ুর O_2-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন অক্সাইডে পরিণত হয়।

পরীক্ষাঃ একটি গ্যাসজারের মধ্যে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি রেখে জারের মুখটি ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল—বাতিটি নিভে গেল। এখন ঐ গ্যাসজারের মধ্যে **একটা জলন্ত পাটকাঠি** প্রবেশ করানো হল—কাঠিটি নিভে গেল। এতে প্রমাণিত হল গ্যাসজারের মধ্যে আর O_2 নেই। গ্যাসজারটি ঠান্ডা হলে দেখা গেল, ওর গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমেছে। মোমবাতিটি বের করে গ্যাসজারের মধ্যে স্বচ্ছ চুনজল যোগ করে নেড়ে দিলে দেখা গেল, চুনজল ঘোলা হয়ে গেল। এতে প্রমাণিত হল, গ্যাসজারের মধ্যে CO_2 উৎপন্ন হয়েছে।



মোমবাতির দহন।

সিদ্ধান্তঃ এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হল যে, মোমবাতির দহনে মোমবাতির মধ্যস্থ কার্বন এবং হাইড্রোজেন, বাতাসের O_2-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জল

উৎপন্ন করে। গ্যাসজারের মধ্যে বাতাসের O_2 শেষ হয়ে গেলে মোমবাতিটি নিভে যায়। অর্থাৎ দহনে অক্সিজেন গ্যাসের প্রয়োজন হয়।

● **বৈদ্যুতিক বাতি যখন জ্বলে তখন তাপ এবং আলো উৎপন্ন হয়—এটা কি দহন?** বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলার সময় তাপ এবং আলো উৎপন্ন করলেও একে দহন বলা যায় না। কারণ বৈদ্যুতিক বাতির মধ্যে অক্সিজেন বা বাতাস থাকে না—থাকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস। বিদ্যুৎ চালনার সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যস্থ টাংস্টেন তারটি খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং আলো বিকীর্ণ করতে থাকে—অক্সিজেন বা দহনের সহায়ক কোন গ্যাস থাকে না বলে ঐ তারটির কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না।

● **বাতাস বা অক্সিজেন ছাড়াও দহন হতে পারেঃ** (i) একটি ক্লোরিন গ্যাসপূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে অ্যান্টিমনির গুঁড়া ফেললে প্রত্যেকটি কণা গ্যাসটির সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে ওঠে এবং স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করে। (ii) উত্তপ্ত সোডিয়াম ক্লোরিনের সংস্পর্শে এলে সোনালী শিখাসহ জ্বলতে থাকে এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডে পরিণত হয়। (iii) আয়োডিন সাদা ফসফরাসের সংস্পর্শে এলেই জ্বলে ওঠে ফসফরাস ট্রাই-আয়োডাইড নামে লাল বর্ণের যৌগ উৎপন্ন করে। পদার্থটি জ্বলার সময় প্রচুর তাপ এবং আলো উৎপন্ন করে।



● **দাহ্য পদার্থঃ এক শ্রেণীর পদার্থ আছে, যেগুলি পুড়ে তাপ ও আলো দেয়—এদের দাহ্য পদার্থ বলে; যেমন—কাঠ, খড়, কাগজ, কয়লা, গন্ধক, হাইড্রোজেন ইত্যাদি।**

● **দহনের সহায়ক পদার্থঃ** আর এক শ্রেণীর পদার্থ আছে, **যাদের সাহায্য ছাড়া দাহ্য পদার্থগুলিতে আগুন ধরে না। যে পদার্থগুলি দহনে সাহায্য করে, তাদের দহনের সহায়ক পদার্থ বলে; যেমন—অক্সিজেন।**

1.17 লোহায় মরচে ধরা (Rusting of Iron)

মরচেঃ সাধারণ লোহাকে বা লোহার তৈরি কোন জিনিসকে আর্দ্র বাতাসের মধ্যে রেখে দিলে কিছুদিনের মধ্যে লোহার গায়ে লালচে-বাদামী রঙের একটা পাতলা আস্তরণ পড়ে। এই বাদামী রঙের আস্তরণকেই **মরচে** বলে।

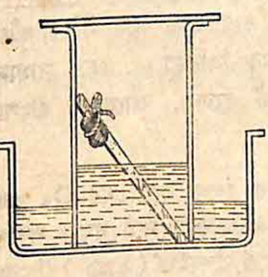
লোহা এবং মরচে এক পদার্থ নয়। (i) লোহা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট

হয়, মরচে কিন্তু চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। (ii) লোহার সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় H_2 নির্গত হয় কিন্তু মরচের সঙ্গে তা হয় না। (iii) লোহা মৌল কিন্তু মরচে একটি যৌগ। মরচে হল **লোহার একরকম জলযুক্ত অক্সাইড** ($2Fe_2O_3$, $3H_2O$)।

মরচে ধরার কারণঃ

লোহা, বাতাসের অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সঙ্গে খুব ধীরে ধীরে বিক্রিয়া করে মরচে উৎপন্ন করে। বাতাসের মধ্যে জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেন—এই দুটির কোন একটি না থাকলে কিন্তু লোহায় মরচে পড়ে না। **লোহার সঙ্গে অক্সিজেনের এইভাবে যুক্ত হওয়ার সময় আলোক উৎপন্ন হয় না, তবে খুব সামান্য তাপ উৎপন্ন হয়। এইজন্য মরচে পড়াকে লোহার মৃদু দহন বলে।**

● **পরীক্ষাঃ** একটি কাচদণ্ডের একপ্রান্তে একটি ভিজে কাপড়ের থলির মধ্যে নির্দিষ্ট ওজনের কয়েকটি চক্‌চকে লোহার পেরেক রেখে, থলিটিকে কাচদণ্ডের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। এইবার একটি গ্যাসজারকে একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে উপুড় করে রাখা হল এবং কাচদণ্ডটিকে জারের মধ্যে এমনভাবে বসানো হল, যেন গ্যাসজারের ভেতরের জলতল ও পাত্রের জলতল একই তলে থাকে এবং কাপড়ের থলিটি যেন জলের উপরতলের কিছু উপরে থাকে। এই অবস্থায় গ্যাসজারটিকে কয়েকদিন রেখে দেওয়া হল।



লোহায় মরচে ধরা।

পর্যবেক্ষণঃ কয়েকদিন পর দেখা গেল যে, (i) গ্যাসজারের ভেতরের জলতল কিছুটা উপরে উঠে গেছে। মেপে দেখা গেল, জারের মধ্যে যে বাতাস ছিল তার $\frac{1}{5}$ অংশ স্থান জল অধিকার করেছে। (ii) গ্যাসজারের ভেতরে জ্বলন্ত পাটকাঠি প্রবেশ করানো হল—সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল। সুতরাং প্রমাণিত হল জারের মধ্যে অক্সিজেন নেই। (iii) এখন থলিটি খুলে দেখা গেল চক্‌চকে পেরেকগুলির গায়ে বাদামী রঙের মরচে পড়েছে। (iv) পেরেকগুলিকে শুষ্ক করে ওজন নিলে দেখা যাবে, এদের ওজন আগের চেয়ে বেড়েছে।

● **সিদ্ধান্তঃ** (i) লোহায় মরচে ধরার জন্য **জলীয় বাষ্প** এবং **অক্সিজেনের** দরকার। (ii) লোহায় মরচে ধরলে, লোহার রাসায়নিক **পরিবর্তন** ঘটে নতুন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ (মরচে) উৎপন্ন হয়। (iii) গৃহীত লোহার ওজনের চেয়ে উৎপন্ন পদার্থের **ওজন বেড়ে যায়।**

• **মরচে নিবারণের উপায়ঃ** লোহার সংস্পর্শে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস এলেই লোহায় মরচে ধরে, ফলে লোহা নষ্ট হয়ে যায়।

নিচের কয়েকটি উপায়ে লোহায় মরচে ধরা বন্ধ করা যায়ঃ

(1) লোহার গায়ে **আলকাতরা** বা **তেল** রং লাগালে,

(2) লোহার উপরে **জিঙ্কের** বা **টিনের প্রলেপ** দিলে,

(3) তড়িৎ-বিশ্লেষণ প্রণালীতে লোহার উপর **নিকেল** বা **ক্রোমিয়ামের** প্রলেপ দিলে।

(4) ইস্পাতের সঙ্গে ক্রোমিয়াম ধাতু মিশিয়ে স্টেইনলেস **স্টীল নামে** একরকম ইস্পাত তৈরি করা হয়। এই ইস্পাতে **মরিচা ধরে** না।

দহন ও মরচে ধরার পার্থক্যঃ

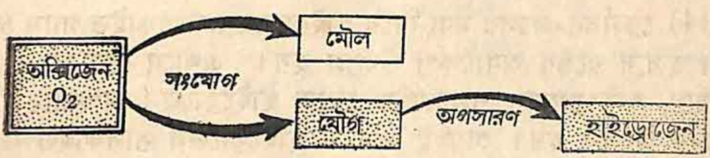
দহন	মরচে ধরা
(i) দহন একটি দ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়া। দহনে দাহ্য পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেন বা অন্য কোন দহনের সহায়ক পদার্থের দ্রুত বিক্রিয়া ঘটে।	(i) মরচে ধরা হল খুব ধীরে ধীরে ঘটা রাসায়নিক বিক্রিয়া। এতে সামান্য তাপের সৃষ্টি হলেও, আলোক উৎপন্ন হয় না।
(ii) বাতাসের মধ্যে দহনের সময়, দাহ্য পদার্থের সঙ্গে বাতাসের O_2 যুক্ত হয়ে নতুন পদার্থ অক্সাইড উৎপন্ন করে।	(ii) লোহার সঙ্গে বাতাসের O_2 এবং জলীয় বাষ্পের বিক্রিয়া ঘটে নতুন পদার্থ লোহার জলযুক্ত অক্সাইড (মরচে) উৎপন্ন হয়।
(iii) দহনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাইরে থেকে আগুন জ্বালাতে হয়।	(iii) মরচে ধরার ক্ষেত্রে বাইরে থেকে আগুনের দরকার হয় না।
(iv) অক্সিজেন ছাড়াও দহন সম্ভব।	(iv) O_2 এবং জলীয় বাষ্প উপস্থিত না থাকলে মরচে পড়ে না।
(v) দহনে তাপ এবং আলোকের সৃষ্টি হয়।	(v) মরচে ধরায় খুব সামান্য তাপ সৃষ্টি হলেও আলোক উৎপন্ন করে না।

1.18 জারণ ও বিজারণ (Oxidation and Reduction)

• **জারণঃ যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোন মৌল বা যৌগের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয় বা কোন যৌগ থেকে হাইড্রোজেন অপসারিত হয়, সেই প্রক্রিয়াকে সাধারণভাবে জারণ বলে।**

যে পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয় বা যে পদার্থ থেকে হাইড্রোজেন অপসারিত হয়, সেই পদার্থটি জারিত হয়েছে বলা হয়।

জারণ



পরীক্ষাঃ (1) একটি উজ্জ্বলন চামচে একটুকরা জ্বলন্ত কাঠকয়লা নিয়ে অক্সিজেনভর্তি একটা গ্যাসজারে প্রবেশ করানো হল, দেখা গেল উজ্জ্বল আলো উৎপন্ন করে কাঠকয়লাটি পুড়ছে। কিছুক্ষণ পর জ্বলন্ত কাঠকয়লাটি নিভে যাবে। জারের ভেতরের সব অক্সিজেন শেষ হয়ে গেলে কাঠকয়লাটি নিভে যায়। এখানে কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়াটি হল জারণ; এখানে **কার্বন জারিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে।**

জারণ

$$C + O_2 = CO_2$$

(2) একটা টেস্ট-টিউবের মধ্যে সামান্য তামার কুচি নিয়ে ওর মধ্যে নাতিগাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড ঢেলে সামান্য গরম করা হল, দেখা গেল একটা বর্ণহীন গ্যাস বেরোচ্ছে—গ্যাসটি টেস্ট-টিউবের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাদামী হয়ে যাচ্ছে। কপারের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় বর্ণহীন নাইট্রিক অক্সাইড (NO) উৎপন্ন হয়—এই নাইট্রিক অক্সাইড টেস্ট-টিউবের বাইরে বাতাসের সংস্পর্শে আসায়, বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাদামী রঙের নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) উৎপন্ন করে।

$$2NO + O_2 = 2NO_2$$

জারণ

এখানে নাইট্রিক অক্সাইড জারিত হয়ে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

(3) এইভাবে জ্বলন্ত **গন্ধক, ফসফরাস** অক্সিজেনে পোড়ার সময়

অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যথাক্রমে সালফার ডাই-অক্সাইড ও ফসফরাস পেণ্টক্সাইড উৎপন্ন করে। এখানে গন্ধক ও ফসফরাস জারিত হয়।

জারণ জারণ

$$S + O_2 = SO_2, \quad 4P + 5O_2 = 2P_2O_5$$

(4) ক্লোরিন-জলের মধ্য দিয়ে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করলে হলুদ রঙের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয়। এখানে ক্লোরিনের সঙ্গে বিক্রিয়ায়, হাইড্রোজেন সালফাইড থেকে হাইড্রোজেন অপসারিত হয়ে সালফার উৎপন্ন হয়। কাজেই এখানে হাইড্রোজেন সালফাইড জারিত হয়ে সালফারে পরিণত হয়েছে।

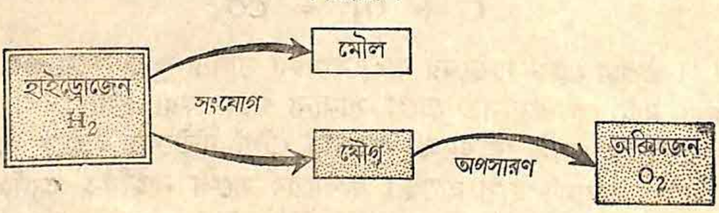
$$H_2S + Cl_2 = 2HCl + S\downarrow$$

জারণ

● **বিজারণঃ যে প্রক্রিয়ায় কোন মৌল বা যৌগের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয় বা কোন যৌগ থেকে অক্সিজেন অপসারিত হয়, সেই প্রক্রিয়াকে সাধারণভাবে বিজারণ বলে।**

যে পদার্থের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয় বা যে পদার্থ থেকে অক্সিজেন অপসারিত হয়—সেই পদার্থ বিজারিত হয়েছে বলা হয়।

বিজারণ



পরীক্ষাঃ (1) উত্তপ্ত কালো কপার অক্সাইডের উপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করলে দেখা যাবে লাল রঙের ধাতব কপার উৎপন্ন হয়েছে। এখানে কপার অক্সাইড থেকে অক্সিজেন অপসারিত হওয়ায়, কপার অক্সাইড বিজারিত হয়ে ধাতব কপারে পরিণত হয়েছে।

$$CuO + H_2 = Cu + H_2O$$

বিজারণ

(2) লাল রঙের ব্রোমিন জলের ভেতর দিয়ে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করলে ব্রোমিন-জলের লাল রঙ বর্ণহীন হয়ে যায়, আর হলুদ অধঃক্ষেপ পড়ে। ব্রোমিনের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে

হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এই অ্যাসিড বর্ণহীন, তাই ব্রোমিনের লাল রঙ বর্ণহীন হয়ে যায়। এখানে **ব্রোমিন, হাইড্রোজেন সালফাইড দ্বারা বিজারিত হয়।**

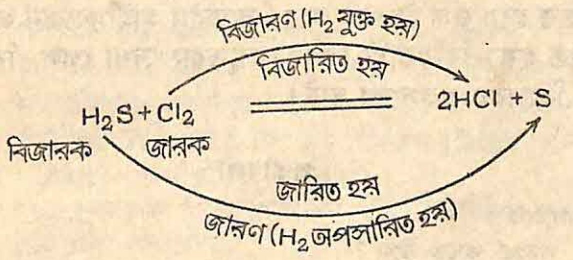
$$\overbrace{Br_2 + H_2S}^{\text{বিজারণ}} = 2HBr + S\downarrow$$

• **জারক পদার্থ:** যে পদার্থ অন্য পদার্থকে জারিত করে নিজে বিজারিত হয়, তাকে **জারক পদার্থ** বলে।

যেমন—অক্সিজেন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, নাইট্রিক অ্যাসিড, গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড, পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ইত্যাদি জারক পদার্থ।

• **বিজারক পদার্থ:** যে পদার্থ অন্য পদার্থকে বিজারিত করে নিজে জারিত হয়, তাকে **বিজারক পদার্থ** বলে।

যেমন—হাইড্রোজেন, কার্বন, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি।



উপরের বিক্রিয়ায় Cl_2 জারক পদার্থ—কারণ H_2S থেকে হাইড্রোজেনকে অপসারিত করে H_2S-কে জারিত করে সালফারে পরিণত করে। অপরদিকে ঐ হাইড্রোজেনকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করে নিজে বিজারিত হয়ে HCl-এ পরিণত হয়। অপরদিকে H_2S বিজারক পদার্থ—কারণ Cl_2-কে বিজারিত করে নিজে জারিত হয়ে সালফারে পরিণত হয়।

• **জারণ এবং বিজারণ একই সঙ্গে ঘটে:** জারণ-বিজারণের বিক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, জারণের সময় জারক পদার্থ নিজে বিজারিত হয় আর বিজারণের সময় বিজারক পদার্থ নিজে জারিত হয়। (i) যেমন—$H_2S + Br_2 = 2HBr + S\downarrow$ —এই বিক্রিয়াটিতে H_2S থেকে হাইড্রোজেন অপসারণের ফলে H_2S জারিত হয়ে সালফারে পরিণত হয়েছে, সেইসঙ্গে Br_2 হাইড্রোজেন গ্রহণ করে নিজে বিজারিত হয়ে HBr উৎপন্ন করেছে। কাজেই বলা যায়, **জারণ-বিজারণ এক**

সঙ্গেই ঘটে থাকে। কোন বিক্রিয়ায় শুধু জারণ বা শুধু বিজারণ ঘটে না—জারণ হলেই বিজারণ হবে।

জারণ

$$H_2S + Br_2 = 2HBr + S$$

বিজারণ

(ii) উত্তপ্ত কপার অক্সাইডের উপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করলে ধাতব কপার এবং জল উৎপন্ন হয়।

বিজারণ

$$CuO + H_2 = Cu + H_2O$$

জারণ

এখানে কপার অক্সাইড (CuO) থেকে অক্সিজেন অপসারিত হয়ে ধাতব কপার উৎপন্ন করে। সুতরাং কপার অক্সাইড বিজারিত হয়ে ধাতব কপারে পরিণত হয়। বিক্রিয়াটি বিজারণ। আবার হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে জল উৎপন্ন করে। সুতরাং হাইড্রোজেন জারিত হয়ে জলে পরিণত হয়। বিক্রিয়াটি জারণ। সুতরাং দেখা গেল, বিক্রিয়াটিতে জারণ এবং বিজারণ একসঙ্গে ঘটে।

প্রশ্নাবলী

I. জ্ঞানমূলক ঃ

(i) পদার্থ কাকে বলে ?

(ii) মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের সংজ্ঞা লেখ।

(iii) মিশ্র পদার্থ কাকে বলে ?

(iv) প্লবতা কি ?

(v) বায়ুর মধ্যে কোন্ গ্যাস দহন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করে এবং কোন্ গ্যাস নিষ্ক্রিয় ?

(vi) অ্যাজোট কোন্ গ্যাস ?

(vii) সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রতি বর্গ সেমি. এবং প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে বায়ুর চাপ কত ?

(viii) ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কত উপর পর্যন্ত স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার আছে ?

(ix) এরোপ্লেন আবিষ্কার করেন কে ?

(x) সবচেয়ে হালকা মৌল কোন্‌টি ?

(xi) পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন প্রস্তুতির জন্য কি কি রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন ?

(xii) পরীক্ষাগারে O_2 প্রস্তুতির জন্য রাসায়নিক দ্রব্যগুলির নাম কর।

(xiii) অনুঘটক কাকে বলে ? একটি অনুঘটকের নাম কর।

(xiv) কোন্ গ্যাস দহন এবং মরচে ঘটায় ?

(xv) অন্তর্ধৃতি কি ?

(xvi) অক্সাইড কাকে বলে ? কয়েকটি অক্সাইডের নাম কর। আম্লিক অক্সাইড এবং ক্ষারীয় অক্সাইডের সংজ্ঞা লেখ।

(xvii) জারণ এবং বিজারণের সংজ্ঞা লেখ।

(xviii) বায়ুর উপাদানগুলির নাম লেখ।

(xix) রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবনী সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(xx) আর্কিমিডিসের সূত্রটি বিবৃত কর।

(xxi) দহন বলতে কি বোঝ ? বায়ুর কোন্ উপাদানটি দহনের কাজে লাগে ? মৃদু দহন বলতে কি বোঝ ?

(xxii) পরীক্ষাগারে O_2 প্রস্তুতিতে ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইডের কাজ কি ? এই জাতীয় পদার্থকে কি বলা হয় ?

(xxiii) মরচে কি ? মরচে ধরে কেন ? মরচে কিভাবে রোধ করা যায় ?

(xxiv) যৌগিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য কি ?

(xxv) দাহ্য এবং দহনের সহায়ক বলতে কি বোঝ ?

(xxvi) জায়মান হাইড্রোজেন কাকে বলে ?

II. বোধমূলক :

(i) পদার্থকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়—কি কি ?

(ii) মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের দুটি করে উদাহরণ দাও।

(iii) ল্যাভয়সিয়ের পরীক্ষায় চক্‌চকে পারদের উপর যে লাল বর্ণের সর পড়েছিল সেটি কি ? কি করে উৎপন্ন হয়েছিল ? লাল সরটিকে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করলে কি হবে ?

(iv) স্বচ্ছ চুনজলকে খোলা বাতাসের মধ্যে কয়েকদিন রেখে দিলে কি হবে এবং কেন হবে ?

(v) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারকে শান্ত বলয় বলা হয় কেন ?

(vi) ওজোনোস্ফিয়ারের উষ্ণতা বেশী কেন ?

(vii) বেলুন বায়ুর মধ্যে উপরে উঠে যায় কেন ?

(viii) মিশ্র পদার্থ এবং যৌগিক পদার্থের মধ্যে পার্থক্যগুলি দেখাও।

(ix) যুক্তি দিয়ে প্রমাণ কর যে বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ।

(x) বায়ুপ্রবাহ হয় কেন ? বায়ুপ্রবাহ না হলে কি হতো ?

(xi) ঘরের মধ্যে বায়ু চলাচল না হলে কি অসুবিধা হতো ?

(xii) এরোপ্লেন বায়ুর চেয়ে অনেক ভারী তবু বাতাসের মধ্যে ওড়ে কি করে ?

(xiii) বায়ুমণ্ডলকে কয়টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে ? প্রত্যেকটি অঞ্চলের বর্ণনা কর।

(xiv) জারণ এবং বিজারণ প্রক্রিয়া উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

(xv) $H_2S + Br_2 = 2HBr + S$—এই বিক্রিয়ায় কোন্‌টি জারিত এবং কোন্‌টি বিজারিত হয়েছে বুঝিয়ে দাও।

(xvi) ক্ষারীয় অক্সাইড এবং আম্লিক অক্সাইডের উদাহরণ দাও।

(xvii) কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়—এখানে কোন্ পদার্থ জারিত এবং কোন্‌টি বিজারিত হয়েছে যুক্তিসহ বল।

(xviii) একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার উল্লেখ করে দেখাও যে জারণ বিজারণ একসঙ্গে ঘটে।

(xix) দহন এবং মরচে ধরা কি একই রকম বিক্রিয়া ?

(xx) জায়মান হাইড্রোজেন যে সাধারণ হাইড্রোজেনের চেয়ে বেশী সক্রিয় কি করে তুমি বুঝবে ?

(xxi) অক্সাইড কয়টি মৌল নিয়ে গঠিত ?

III. প্রয়োগমূলক ঃ

(i) লোহা, জল, চক, লবণ, হাইড্রোজেন, চিনির জলীয় দ্রবণ, এবং অ্যাসিড—এদের মধ্যে কোন্‌টি মৌলিক পদার্থ, কোন্‌টি যৌগিক পদার্থ এবং কোন্‌টি মিশ্রণ বল।

(ii) সাধারণ লবণ, লোহাচুর এবং গন্ধকের মিশ্রণ থেকে কি করে উপাদানগুলিকে পৃথক করবে বর্ণনা কর।

(iii) 7 গ্রাম লোহা এবং 4 গ্রাম গন্ধক মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে কি পদার্থ উৎপন্ন হবে ? এই পদার্থ থেকে লোহা ও গন্ধককে সহজে পৃথক করা যাবে কি ?

(iv) অক্সিজেনকে অ্যাসিড উৎপাদক বলা হয় কেন ?

(v) কপারের সঙ্গে O_2-এর বিক্রিয়ায় কিউপ্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়—এতে কপারের জারণ না বিজারণ হয় ?

(vi) বায়ুর মধ্যে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প আছে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর।

(vii) মিশ্র পদার্থ এবং যৌগিক পদার্থ কাকে বলে একটি পরীক্ষা দ্বারা বুঝিয়ে দাও।

(viii) ঘরের মধ্যে বায়ু চলাচলের উপায় কি ভাবে করা যায় ? কয়েকটি ব্যবস্থার উল্লেখ কর।

(ix) বায়ুমণ্ডলে উপরের অংশের বায়ুস্তরের চাপ এবং উষ্ণতা নিচের বায়ুস্তরের চাপ এবং উষ্ণতার চেয়ে কম থাকে কেন ?

(x) বায়ুমণ্ডলের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

(xi) অক্সিজেন গ্যাসের প্রধান ধর্মগুলি দেখাবার জন্য কয়েকটি পরীক্ষার বর্ণনা কর।

(xii) গন্ধক, ফসফরাস, কার্বন এবং সোডিয়ামকে অক্সিজেনের মধ্যে দহন করলে যে যৌগগুলি উৎপন্ন হয় তাদের নাম লেখ। এই যৌগগুলিকে কি বলা হয় ?

(xiii) মরচে ধরার সময় বাতাসের জলীয় বাষ্প এবং অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়—পরীক্ষা দ্বারা দেখাও। মরচে কিভাবে বন্ধ করা যায় ?

(xiv) অক্সিজেনকে অ্যাসিড উৎপাদক বলে কেন ? দেখাও যে অক্সিজেন ক্ষারও উৎপন্ন করে।

(xv) একটুকরো সালফারে আগুন ধরিয়ে O_2 গ্যাসপূর্ণ একটি গ্যাসজারে প্রবেশ করানো হল। এর ফলে যে গ্যাসটি উৎপন্ন হল তার নাম কি? ঐ গ্যাসকে জলে দ্রবীভূত করে নীল লিটমাস দিলে রঙের পরিবর্তন হবে কি? জলে দ্রবীভূত হয়ে যে যৌগটি উৎপন্ন হল তার নাম কি?

(xvi) কালো রঙের কপার অক্সাইডকে উত্তপ্ত করে ওর উপর দিয়ে H_2 গ্যাস চালনা করায় লাল রঙের একটি অবশেষ পাওয়া গেল—লাল রঙের পদার্থটি কি? এই বিক্রিয়ায় কোন্‌টি জারিত এবং কোন্‌টি বিজারিত হয়?

(xvii) একটি বর্ণহীন গন্ধহীন গ্যাসের মধ্যে জ্বলন্ত চারকোল প্রবেশ করালে চারকোলটি তীব্রভাবে জ্বলে ওঠে। বিক্রিয়ার পর বর্ণহীন এবং গন্ধহীন একটি গ্যাস পাওয়া গেল যার জলীয় দ্রবণের সঙ্গে নীল লিটমাস দিলে লাল হয়। গ্যাসটির নাম কর। গ্যাসটির সঙ্গে চারকোলের বিক্রিয়ায় কি গ্যাস উৎপন্ন হয়? উৎপন্ন গ্যাসটি জলে মিশে কি উৎপন্ন করে?

(xviii) জিঙ্ক টুকরার সঙ্গে লঘু H_2SO_4-এর বিক্রিয়ায় যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তার নাম কি? একটি পরীক্ষা দ্বারা দেখাও যে, গ্যাসটি O_2-এর মধ্যে জ্বলে জল উৎপন্ন করে।

(xix) নিচের কোন্‌গুলি আম্লিক অক্সাইড এবং কোন্‌গুলি ক্ষারীয় অক্সাইড বল—

CuO, MgO, Na_2O, CO_2, SO_2, NO_2, CaO।

(xx) চাঁদে বেলুন বা এরোপ্লেন ওড়ান সম্ভব কি? কারণ সহ উত্তর দাও।

(xxi) একটি গ্যাসের মধ্যে জ্বলন্ত পাটকাঠি দেওয়া হল, পাটকাঠি নিভে গেল কিন্তু গ্যাসটি জ্বলতে থাকলো—গ্যাসটির নাম কি?

(xxii) লাল বর্ণের ব্রোমিন-জলে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালানো হল, ফলে ব্রোমিন-জল বর্ণহীন হয়ে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড ও সালফার উৎপন্ন করে। এখানে কোন্‌টি জারিত এবং কোন্‌টি বিজারিত হয়েছে বল।

(xxiii) একটি অক্সাইডকে জলে দ্রবীভূত করে নীল লিটমাস দিলে লাল হয়। অক্সাইডটি কি জাতীয়?

(xxiv) পর্বতশৃঙ্গে বেশী ঠাণ্ডা কেন?

(xxv) বেলুনে হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি করা বিপদজনক কেন? কোন্ গ্যাস ভর্তি করা উচিত?

(xxvi) একটি বেলুনের ওজন, বেলুনের সমআয়তন বাতাসের যে ওজন হয়, তার চেয়ে ভারী। বেলুনটি আকাশে উড়বে কি?

(xxvii) একটি সাদা গুঁড়ার সঙ্গে MnO_2 মিশিয়ে তাপ দিলে একটি বর্ণহীন গন্ধহীন গ্যাস (A) উৎপন্ন হয়। গ্যাসটির মধ্যে শিখাহীন জ্বলন্ত পাটকাঠি প্রবেশ করালে তীব্রভাবে জ্বলে ওঠে। ঐ গ্যাসের মধ্যে জ্বলন্ত গন্ধক প্রবেশ করালে পোড়া বারুদের গন্ধবিশিষ্ট বর্ণহীন

গ্যাস (B) উৎপন্ন হয়। (B)-কে জলে মেশালে (C) অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। A, B এবং C কে সনাক্ত কর।

(xxviii) নিচের বিক্রিয়াগুলিতে কোন্‌টি জারিত ও কোন্‌টি বিজারিত হয়েছে বল ঃ

(a) $2H_2S + O_2 = 2H_2O + 2S$, (b) $CuO + H_2 = Cu + H_2O$, (c) $2Pb + O_2 = 2PbO$, (d) $H_2S + I_2 = 2HI + S$

(xxix) নিচের কোন্‌গুলি জারক এবং কোন্‌গুলি বিজারক বল ঃ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ক্লোরিন, হাইড্রোজেন সালফাইড, গাঢ় H_2SO_4, সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন।

(xxx) পরীক্ষাগারে H_2 প্রস্তুতির সময় যান্ত্রিক ব্যবস্থা বায়ু নিরুদ্ধ হয়েছে কি না পরীক্ষা করা হয় কেন?

(xxxi) বেলুনের সাহায্যে যে কোন উচ্চতায় ওঠা যায় না কেন?

(xxxii) দার্জিলিং-এ রান্নার কাজে প্রেসার কুকার ব্যবহার করা হয় কেন?

(xxxiii) উনুনে কয়লা জ্বলে—এখানে কোন্‌টি দাহ্য পদার্থ এবং কোন্‌টি দহনের সহায়ক উল্লেখ কর।

(xxxiv) উড়োজাহাজে প্রপেলারের কাজ কি?

IV. দক্ষতামূলক ঃ

(i) চিত্রসহ ল্যাভয়সিয়ের পরীক্ষাটি বর্ণনা কর। পরীক্ষায় প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্তগুলি লেখ।

(ii) একটি চিত্র অঙ্কন করে বায়ু চলাচলের কারণ বুঝিয়ে দাও।

(iii) পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন গ্যাস কি করে তৈরি করা হয় যন্ত্রের ছবি এঁকে বর্ণনা কর।

(iv) চিত্রের সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা দেখাও যে হাইড্রোজেন বায়ুর মধ্যে জ্বলে জল উৎপন্ন করে।

(v) প্রয়োজনীয় যন্ত্রের চিত্র অঙ্কন করে পরীক্ষাগারে অক্সিজেন প্রস্তুতির বর্ণনা কর।

Objective type Questions :

[A] শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(i) — এর সঙ্গে লঘু — এর বিক্রিয়ায় H_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়।

(ii) বায়ু গরম হলে — হয়।

(iii) গরম বায়ু — দিকে উঠে যায়।

(iv) মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলিকে সহজে পৃথক করা —।

(v) অধাতুর সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় — অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

(vi) — এর সঙ্গে — মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে O_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়।

(vii) লোহাকে — এবং — সংস্পর্শে রাখলে মরচে পড়ে।

(viii) — সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় আম্লিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

(ix) সবচেয়ে হালকা মৌলের নাম —।

(x) — উপাদানগুলিকে সহজে পৃথক করা যায় না।

[B] সঠিক উত্তরগুলিতে টিক (√) চিহ্ন দাও :

(i) যত উপরের দিকে ওঠা যায় বায়ুর চাপ তত কমে/বেড়ে যায়।

(ii) অতি বেগুনী রশ্মি শোষণ করে—স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার/আয়নোস্ফিয়ার/ওজোনোস্ফিয়ার।

(iii) কোন পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হওয়াকে জারণ/বিজারণ বলে।

(iv) গন্ধককে বায়ুতে পোড়ালে, গন্ধক জারিত/বিজারিত হয়ে সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে।

(v) শুষ্ক বাতাসের মধ্যে লোহাকে রাখলে মরচে ধরে/ধরে না।

(vi) কপারের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে কপার অক্সাইড উৎপন্ন করে, এখানে কপার জারিত/বিজারিত হয়।

(vii) কোন পদার্থের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়াকে জারণ/বিজারণ বলে।

(viii) $H_2S + Cl_2 = 2HCl + S$—এখানে H_2S জারিত হয়েছে/বিজারিত হয়েছে।

(ix) দহনকার্যে সাহায্য করে নাইট্রোজেন/কার্বন ডাই-অক্সাইড/অক্সিজেন।

(x) জিঙ্কের সঙ্গে লঘু H_2SO_4-এর বিক্রিয়ায় অক্সিজেন/হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।

[C] নিচের ক্ষেত্রগুলিতে কি ঘটবে লেখ :

(i) একটি টেস্ট-টিউবে গন্ধক এবং লোহাচুরের মিশ্রণ উত্তপ্ত করা হল।

(ii) জিঙ্কের সঙ্গে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করা হল।

(iii) ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণে জায়মান হাইড্রোজেন চালনা করা হল।

(iv) ম্যাগনেসিয়াম তারকে অক্সিজেনের মধ্যে পোড়ান হল।

(v) উত্তপ্ত কিউপ্রিক অক্সাইডের উপর H_2 গ্যাস চালনা করা হল।

(vi) গন্ধককে O_2-এর মধ্যে দহন করে, উৎপন্ন গ্যাসকে জলে দ্রবীভূত করা হল।

(vii) হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন গ্যাসের মিশ্রণকে সূর্যালোকে রাখা হল।

(viii) জ্বলন্ত সোডিয়ামকে O_2 গ্যাসের মধ্যে প্রবেশ করানো হল এবং যে অবশেষ পাওয়া গেল তাকে জলে দ্রবীভূত করে লাল লিটমাস দ্রবণ যোগ করা হল।

[D] এককথায় উত্তর দাও :

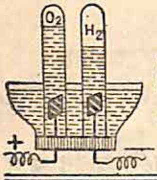
(i) যে প্রক্রিয়ায় কোন মৌল বা যৌগের সঙ্গে O_2 যুক্ত হয় তাকে কি বলে ?

(ii) একটি পদার্থ কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উপস্থিত থেকে বিক্রিয়াটির বেগ বাড়ায় অথচ নিজের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না—পদার্থটিকে কি বলে ?

(iii) বিমানের কোন্ অংশ বিমানকে উপরে উঠিয়ে দেয় ?

(iv) যে প্রক্রিয়ায় কোন যৌগ থেকে H_2 অপসারিত হয় তাকে কি বলে ?

(v) বায়ুমণ্ডলের কোন্ অঞ্চল বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত করে ?



$Na, H, H_2O, C + O_2 = CO_2$

দ্বিতীয় অধ্যায়

(A) জল (B) চিহ্ন ও সঙ্কেত

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে জল দেখনি। বাড়িতে মাটির কুঁজোয় খাবার জল, স্নানের ঘরে চৌবাচ্চায় জল সবাই দেখেছ। যারা গ্রামে থাক, দীঘির কালো জলে মনের আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাট—আবার শ্রাবণের বৃষ্টিঝরা রাতে বৃষ্টির টাপুর-টুপুর গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়। ছুটিতে দীঘা, পুরী বেড়াতে গিয়ে দেখতে পাও জলের আর এক মহান্ রূপ—সীমাহীন নীল সমুদ্রের বুকে অশান্ত ঢেউগুলি ফেনার সাদা টুপি মাথায় পরে একের পর এক আছড়ে পড়ছে বেলাভূমির বুকে। কাজেই জল আমাদের সকলেরই খুব চেনা। জলের আর এক নাম 'জীবন'; কারণ জল না হলে উদ্ভিদ বা প্রাণী কেউ বাঁচে না। সমুদ্র, হ্রদ, নদী, প্রস্রবণ প্রভৃতি হল জলের উৎস—তাছাড়া আগে তো দেখেছ বাতাসের মধ্যে জলীয় বাষ্পরূপে জল থাকে। আমাদের দেহের শতকরা 70 ভাগই হল জল। এখন দেখা যাক্ জল জিনিসটা কি?

2.1 জল একটি যৌগিক পদার্থ

প্রাচীনকালে ভারতীয় এবং গ্রীক পণ্ডিতেরা মনে করতেন জল একটি মৌলিক পদার্থ। 1781 খ্রীষ্টাব্দে **ক্যাভেণ্ডিস** হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে জল তৈরি করে প্রমাণ করেন যে, জল একটি যৌগিক পদার্থ।

• **জল যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন একটি যৌগিক পদার্থ তা নিচের যুক্তিগুলি দিয়ে প্রমাণ করা যায়—**

(i) পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে বিশুদ্ধ জল সংগ্রহ করে দেখা গেছে যে প্রতি 9 **ভাগ ওজনের জলে** 1 **ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন ও** 8 **ভাগ ওজনের অক্সিজেন থাকে।** জল যদি মিশ্র পদার্থ হতো তবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় জলের উপাদানগুলির ওজন-অনুপাত ঐ রকম স্থির হতো না।

(ii) **হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে জল উৎপন্ন করার সময় তাপ উৎপন্ন হয়।** জল, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ হলে তাপ উৎপন্ন হতো না।

(iii) সাধারণ **রাসায়নিক পদ্ধতি** দ্বারা জলের উপাদান—**হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনকে পৃথক করা যায় না।**

(iv) হাইড্রোজেন গ্যাস নিজে জ্বলে, আর অক্সিজেন গ্যাস জ্বলতে সাহায্য করে। কিন্তু এই হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে তৈরি জল নিজে জ্বলে না বা জ্বলতে সাহায্যও করে না, বরং জল দিয়ে আগুন নেভানো হয়। কাজেই বোঝা যায়, **জলের মধ্যে হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন কারোরই ধর্ম বর্তমান নেই।** জল মিশ্র পদার্থ হলে ওর উপাদানগুলির নিজ নিজ ধর্ম বর্তমান থাকতো।

(v) বিশুদ্ধ জলের নির্দিষ্ট হিমাঙ্ক* এবং নির্দিষ্ট স্ফুটনাঙ্ক** আছে। প্রমাণ চাপে বিশুদ্ধ জল 0°C উষ্ণতায় জমে বরফ হয় এবং 100°C উষ্ণতায় স্টীমে পরিণত হয়, মিশ্র পদার্থের নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক থাকে না। সুতরাং জল যৌগিক পদার্থ।

(vi) যৌগিক পদার্থ মাত্রই সমসত্ত্ব হয়। জলও সমসত্ত্ব পদার্থ।

(vii) যৌগিক পদার্থকে রাসায়নিক বা অন্য কোনরকম বিশ্লেষণ করলে দুই বা ততোধিক ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ করলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট দুটি গ্যাস—হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পাওয়া যায়।

2.2 রাসায়নিক বিশ্লেষণ

যে প্রণালীতে কোন যৌগকে বিশ্লিষ্ট করে মূল উপাদানগুলিতে পরিণত করা হয়, তাকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ বলে। অ্যাসিড-মিশ্রিত জলে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করে জলকে বিশ্লিষ্ট করলে জলের মূল উপাদান, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। মারকিউরিক অক্সাইডকে উত্তপ্ত করলে ওর রাসায়নিক বিয়োজন ঘটে মারকারি এবং O_2 উৎপন্ন হয়।

কপার, সিলভার, গোল্ড, জিঙ্ক প্রভৃতি ধাতুর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ হয় কিন্তু তড়িৎ প্রবাহের ফলে ওদের অণুর গঠনের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু দেখা গেছে বিভিন্ন অ্যাসিড, লবণ, ক্ষার প্রভৃতি জলে দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহণ করে এবং তড়িৎ পরিবহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ওদের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই পদার্থগুলি হল **তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ।**

---

* **হিমাঙ্ক ঃ** প্রমাণ চাপে, তরল পদার্থ যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, সেই উষ্ণতাকে ঐ তরলের হিমাঙ্ক বলে।

** **স্ফুটনাঙ্ক ঃ** প্রমাণ চাপে, যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন তরল পদার্থ, তরল অবস্থা থেকে বাষ্পীয় অবস্থায় আসে, সেই উষ্ণতাকে ঐ তরলের স্ফুটনাঙ্ক বলে।

● **তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থঃ** যে পদার্থ জলে দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহণ করে এবং তড়িৎ পরিবহণের ফলে পদার্থটির রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই পদার্থকে **তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ বলে।** যেমন—সোডিয়াম ক্লোরাইড, সালফিউরিক অ্যাসিড, পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড প্রভৃতি।

● **তড়িৎ-বিশ্লেষণঃ জলে দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায়, তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করলে, পদার্থটির রাসায়নিক বিয়োজন ঘটে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ বলে।**

[জলে দ্রবীভূত অবস্থায় অথবা গলিত অবস্থায় তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের অণুগুলির কিছু অংশ বিয়োজিত হয়ে তড়িৎগ্রস্ত কণায় পরিণত হয়। তড়িৎগ্রস্ত এই কণাগুলিকে **আয়ন** বলে। এই প্রক্রিয়াকে **আয়নীয় বিয়োজন** বলে।

তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের আয়নীয় বিয়োজনের ফলে যে তড়িৎগ্রস্ত কণাগুলির সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যে ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত কণাগুলিকে **ক্যাটায়ন** এবং ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত কণাগুলিকে **অ্যানায়ন** বলে। তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের কঠিন অবস্থায়, এই বিপরীত তড়িৎগ্রস্ত কণাগুলি পরস্পর তড়িৎ আকর্ষণে যুক্ত হয়ে তড়িৎ-নিরপেক্ষ অণুতে পরিণত হয়।

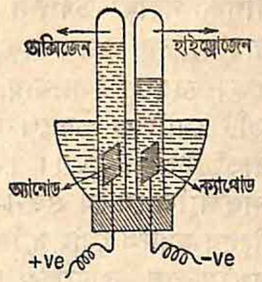
যে যন্ত্রে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে **ভোল্টামিটার** বলে। ভোল্টামিটারের মধ্যে তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের দ্রবণ রেখে ওর মধ্যে দুটি তড়িৎ পরিবাহী পাত বা দণ্ডকে (প্ল্যাটিনাম, গ্রাফাইট ইত্যাদি) পরস্পর স্পর্শ না করিয়ে আংশিক ডুবিয়ে রাখা হয়। এই পাত বা দণ্ড দুটিকে **তড়িৎ-দ্বার** বলে। ব্যাটারীর পজিটিভ মেরুর সঙ্গে যে পাতটি যুক্ত থাকে তাকে **অ্যানোড** এবং নেগেটিভ মেরুর সঙ্গে যে পাতটি যুক্ত থাকে তাকে **ক্যাথোড** বলে।

জলে দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্যে তড়িৎ চালনা করলে ক্যাটায়নগুলি ক্যাথোডে যায় এবং সেখানে তড়িৎ-মুক্ত হয়ে নিস্তড়িৎ পরমাণুতে পরিণত হয়। অ্যানায়নগুলি অ্যানোডে যায় এবং তড়িৎ-মুক্ত হয়ে নিস্তড়িৎ পরমাণু বা মূলকে পরিণত হয়।]

● **জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণঃ** জল একটি তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ। বিশুদ্ধ জল অবশ্য ভাল তড়িৎ পরিবহণ করতে পারে না। তাই জলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা বিশুদ্ধ সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করলে জল তড়িৎ পরিবহণ করে। এই অবস্থায় জলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করে দেখানো যায় যে, জল হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে তৈরি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জল একটি যৌগিক পদার্থ।

বর্ণনাঃ নিচের দিকে খোলা আছে এমন একটি কাচপাত্রের নিচের খোলা অংশটি রবারের ছিপি দিয়ে বন্ধ করা হল। ছিপিটির মধ্য দিয়ে

দুটি তার পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। পাত্রের ভেতরে এই তার দুটির সঙ্গে দুটি প্ল্যাটিনামের পাত লাগানো থাকে। এই **পাত দুটিকে তড়িৎদ্বার বলে**। এখন পাত্রটিতে পাতিত জল দিয়ে ভর্তি করে জলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করা হল। তারপর দাগকাটা ও সমান প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট দুটি টেস্ট-টিউবে সম্পূর্ণ জল ভর্তি করে পাত দুটির উপর উপুড় করে রাখা হল। এইবার পাত দুটি থেকে নির্গত তার দুটির—



একটির সঙ্গে ব্যাটারীর পজিটিভ মেরু এবং অপরটির সঙ্গে নেগেটিভ মেরুর যোগ করা হল। এখন জলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ হবে এবং তড়িৎ-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে যে, তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা জল বিশ্লিষ্ট হয়ে ক্যাথোড ও অ্যানোডের উপর রাখা টেস্টটিউবের মধ্যে বুদবুদের আকারে গ্যাস জমা হচ্ছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখা যাবে, ঘরের উষ্ণতায় এবং চাপে, ক্যাথোডে যে পরিমাণ গ্যাস জমা হয়েছে তার আয়তন, অ্যানোডে জমা গ্যাসের আয়তনের দ্বিগুণ।

উৎপন্ন গ্যাসের সনাক্তকরণঃ (i) ক্যাথোডে রাখা টেস্ট-টিউবের মুখটি বুড়ো আঙুল দিয়ে বন্ধ করে বাইরে এনে একটি জ্বলন্ত পাট-কাঠি ওর মুখে ধরলে দেখা গেল পাটকাঠিটি নিভে গেল অথচ টেস্ট-টিউবের মুখে গ্যাসটি **নীল** শিখায় **জ্বলছে**। এর দ্বারা বোঝা গেল গ্যাসটি **হাইড্রোজেন**।

(ii) অ্যানোডের উপরে রাখা টেস্ট-টিউবটিকে ঐভাবে বাইরে এনে একটি শিখাহীন জ্বলন্ত পাটকাঠি ওর ভেতরে ঢোকালে দেখা গেল যে, কাঠিটি উজ্জ্বল শিখা সহ জ্বলে উঠলো। এতে বোঝা গেল গ্যাসটি **অক্সিজেন**।

● **সিদ্ধান্তঃ** পরীক্ষায় বোঝা গেল, (i) জলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করলে জল বিশ্লিষ্ট হয়ে **ক্যাথোডে 2 আয়তন হাইড্রোজেন ও অ্যানোডে 1 আয়তন অক্সিজেন উৎপন্ন করে** (একই উষ্ণতা ও চাপে)। (ii) সুতরাং প্রমাণিত হল, জল, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দ্বারা গঠিত একটি যৌগ।

$$\underset{\text{জল}}{2H_2O} \xrightarrow{\text{তড়িৎ-বিশ্লেষণ}} \underset{\substack{\text{2 আয়তন}\\\text{হাইড্রোজেন}}}{2H_2} + \underset{\substack{\text{1 আয়তন}\\\text{অক্সিজেন}}}{O_2}$$

2.3 রাসায়নিক সংযুতি

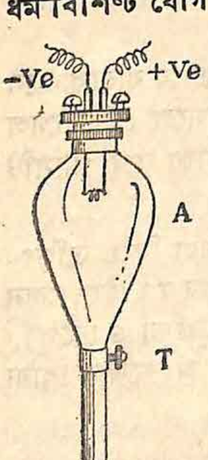
দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগের ফলে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই যৌগিক পদার্থটির মধ্যে মৌলিক পদার্থগুলির ওজন-অনুপাত (গ্যাসীয় হলে আয়তন) সর্বদা স্থির থাকে। তাহলে বলা যায়, নির্দিষ্ট ওজনের একটি মৌলিক পদার্থ আর একটি মৌলিক পদার্থের নির্দিষ্ট ওজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। যৌগিক পদার্থের মধ্যে ওর মধ্যস্থ মৌলিক পদার্থগুলি যে যে ওজন-অনুপাতে বর্তমান থাকে, সেই অনুপাতকে ঐ যৌগের মধ্যস্থ মৌলগুলির রাসায়নিক অনুপাত বলে। যদি মৌলগুলি গ্যাসীয় হয়, তাহলেও দেখা গেছে—একই চাপ ও উষ্ণতায় নির্দিষ্ট আয়তনের একটি মৌলিক পদার্থ আর একটি মৌলিক পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগ উৎপন্ন করে। এই আয়তনের অনুপাতকেও যৌগটিতে মৌলগুলির রাসায়নিক অনুপাত বলে।

• কোন যৌগে উপাদান হিসাবে কি কি মৌল আছে এবং ঐ যৌগে মৌলগুলির রাসায়নিক অনুপাত কত, ঐ যৌগের রাসায়নিক সংযুতি থেকে আমরা তা জানতে পারি।

সংশ্লেষণ অথবা বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে কোন যৌগের সংযুতি নির্ণয় করা যায়।

2.4 রাসায়নিক সংশ্লেষণ বা সংযোজন

• যে প্রণালীতে মূল উপাদানগুলির প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে নতুন ধর্মবিশিষ্ট যৌগ উৎপন্ন হয়, তাকে রাসায়নিক সংশ্লেষণ বা সংযোজন বলে।



উদাহরণঃ

(1) জলের সংশ্লেষণঃ

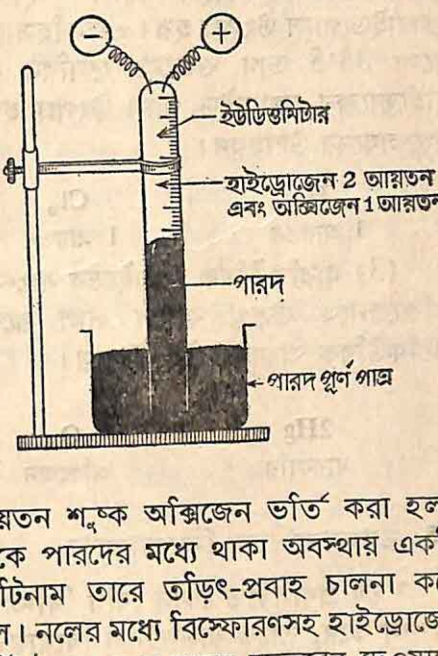
(a) ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষাঃ একই উষ্ণতা ও চাপে 2 আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে 1 আয়তন অক্সিজেন মিশিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটালে জল উৎপন্ন হয়। এই পরীক্ষাটি বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিস প্রথম হাতে-কলমে করে দেখান।

পরীক্ষাঃ তিনি প্রথমে শক্ত কাচের তৈরি, মোচার মত দেখতে, একটা বাল্‌বের (A) মধ্যে 2 আয়তন শুষ্ক হাইড্রোজেন ও 1 আয়তন শুষ্ক অক্সিজেন গ্যাস (T) স্টপ ককটি খুলে ভর্তি করেন। বাল্‌বের উপরের দিকে কর্কের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করানো তারের সাহায্যে ঐ গ্যাস-মিশ্রণের মধ্যে ক্যাভেণ্ডিস বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ

সৃষ্টি করেন। বাল্বের ভেতরে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ-সহ হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে জল উৎপন্ন হয়।

(b) ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষায় ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও ওর কতকগুলি ত্রুটি ছিল। পরীক্ষাটির আধুনিক পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলঃ

পরীক্ষাঃ একটি ইউডিওমিটার নেওয়া হল। এটি একটি অংশাঙ্কিত নল—নলটির একমুখ খোলা এবং অপর মুখ বন্ধ। বন্ধ মুখটিতে দুটি প্ল্যাটিনাম তার নলটির ভেতরে ঢোকানো আছে। এই তার দুটির সঙ্গে ব্যাটারীর দুই মেরু যোগ করলে নলের ভেতরে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়।



ইউডিওমিটার নলটির মধ্যে পারদ ভর্তি করে একটি পারদপূর্ণ পাত্রের মধ্যে উপুড় করে রাখা হল। এর পর নলের ভেতরের পারদ অপসারণ করে ওর মধ্যে একই চাপ ও উষ্ণতায় 2 আয়তন শুষ্ক হাইড্রোজেন এবং 1 আয়তন শুষ্ক অক্সিজেন ভর্তি করা হল। ইউডিওমিটারের খোলা মুখটিকে পারদের মধ্যে থাকা অবস্থায় একটি রবারের উপর চেপে ধরে প্ল্যাটিনাম তারে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করা হল। নলের মধ্যে বিস্ফোরণসহ হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন যুক্ত হবে। নলটি ঠাণ্ডা হলে নলের ভেতরের দেওয়ালে বিন্দু বিন্দু জল জমতে দেখা যাবে। রবারের উপর থেকে ইউডিওমিটার নলটি সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে, নলটির ভেতরের সবটুকু অংশ পারদ দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল। এতে প্রমাণিত হল নলের মধ্যে হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন নেই।

$$\underset{\text{হাইড্রোজেন, 2 আয়তন}}{2H_2} + \underset{\text{অক্সিজেন, 1 আয়তন}}{O_2} \xrightarrow{\text{বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ}} \underset{\text{জল}}{2H_2O}$$

• **সিদ্ধান্তঃ** উপরের পরীক্ষা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে—

(i) জল হল, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামে দুটি মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন একটি যৌগিক পদার্থ।

(ii) একই চাপ ও উষ্ণতায় 2 আয়তন হাইড্রোজেনের সঙ্গে 1 আয়তন অক্সিজেন গ্যাস রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা যুক্ত হয়ে জল উৎপন্ন করে।

(2) **হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সংশ্লেষণঃ** পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে, একই চাপ ও উষ্ণতায় 1 আয়তন হাইড্রোজেনের সঙ্গে 1 আয়তন ক্লোরিন মিশিয়ে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করলে 2 আয়তন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। ওজন হিসাবে, 1 ভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের সঙ্গে 35·5 ভাগ ওজনের ক্লোরিন যুক্ত হয়ে 36·5 ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। এটিও একটি রাসায়নিক সংশ্লেষণের উদাহরণ।

$$\underset{\text{1 আয়তন}}{H_2} + \underset{\text{1 আয়তন}}{Cl_2} \longrightarrow \underset{\text{2 আয়তন}}{2HCl}$$

(3) **মারকিউরিক অক্সাইডের সংশ্লেষণঃ** চক্‌চকে মারকারির সঙ্গে অক্সিজেনকে উত্তপ্ত করলে লাল রঙের নতুন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ মারকিউরিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{মারকারি}}{2Hg} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{O_2} \xrightarrow{\text{তাপ}} \underset{\text{মারকিউরিক অক্সাইড}}{2HgO}$$

2.5 রাসায়নিক বিয়োজন

• **যে প্রণালীতে কোন যৌগ বিশ্লিষ্ট হয়ে ওর মূল উপাদানগুলি উৎপন্ন করে, তাকে রাসায়নিক বিয়োজন বলে।**

নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

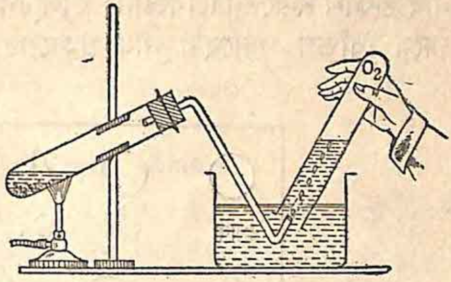
(i) **জলের তড়িৎ বিয়োজনঃ** সামান্য অ্যাসিড মেশানো জলের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করলে জলের অণু বিশ্লিষ্ট হয়ে 2 আয়তন হাইড্রোজেন এবং 1 আয়তন অক্সিজেন উৎপন্ন করে (একই চাপ ও উষ্ণতায়)।

$$\underset{\text{জল}}{2H_2O} \xrightarrow{\text{তড়িৎ-প্রবাহ}} \underset{\text{হাইড্রোজেন}}{2H_2} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{O_2}$$

(ii) **তাপীয় বিয়োজনঃ** (a) তাপ প্রয়োগ করেও পদার্থের বিয়োজন ঘটানো যায়। যেমন—লাল রঙের মারকিউরিক অক্সাইডকে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করলে বিয়োজিত হয়ে মারকারি এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।

নিচের পরীক্ষায় পদার্থের তাপীয় বিয়োজন দেখানো হলঃ

পরীক্ষাঃ একটি হার্ডগ্লাস টেস্ট-টিউবের মধ্যে কিছু পরিমাণ লাল বর্ণের মারকিউরিক অক্সাইড নিয়ে টেস্ট-টিউবের মুখটি কর্ক দিয়ে বন্ধ করে কর্কের মধ্য দিয়ে একটি নির্গম-নল লাগানো হল। নির্গম-নলের শেষ প্রান্তটিকে একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে, টেস্ট-টিউবটিকে বার্নার দিয়ে উত্তপ্ত করা হল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, নির্গম-নলের মুখ দিয়ে একটি গ্যাস নির্গত হচ্ছে। এই গ্যাসকে জল অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করে ওর মধ্যে একটি শিখাহীন জ্বলন্ত পাটকাঠি ঢোকালে তীব্রভাবে জ্বলে ওঠে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উৎপন্ন গ্যাসটি অক্সিজেন। লাল মারকিউরিক অক্সাইড উজ্জ্বল মারকারিতে পরিণত হয়েছে। এখানে মারকিউরিক অক্সাইড **তাপে বিয়োজিত** হয়ে মারকারি এবং অক্সিজেনে পরিণত হয়।



মারকিউরিক অক্সাইডের বিয়োজন।

$$2HgO \xrightarrow{\text{তাপ}} 2Hg + O_2$$

মারকিউরিক অক্সাইড — মারকারি — অক্সিজেন

(b) ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে উত্তপ্ত করলে বিয়োজিত হয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চুন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$CaCO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} CaO + CO_2$$

ক্যালসিয়াম কার্বনেট — চুন — কার্বন ডাই-অক্সাইড

(c) পটাসিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করলে, পটাসিয়াম ক্লোরেট বিয়োজিত হয়ে পটাসিয়াম ক্লোরাইড এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে।

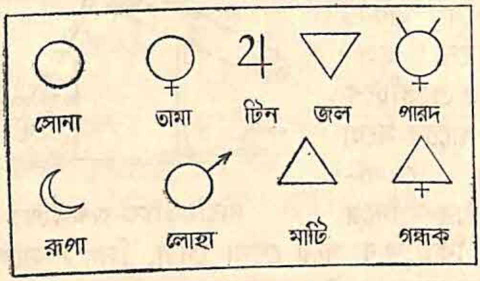
$$2KClO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} 2KCl + 3O_2$$

পটাসিয়াম ক্লোরেট — পটাসিয়াম ক্লোরাইড — অক্সিজেন

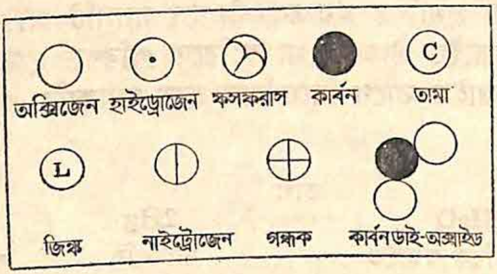
মনে রেখো—**রাসায়নিক বিয়োজন হল রাসায়নিক সংশ্লেষণের বিপরীত প্রক্রিয়া।** উভয় ক্ষেত্রেই তাপ শোষিত হয় কিংবা তাপের উদ্ভব হয়। রাসায়নিক সংশ্লেষণ এবং বিয়োজন হল রাসায়নিক পরিবর্তন, তাই এই পরিবর্তন স্থায়ী হয়।

2.6 প্রতীক বা চিহ্ন

প্রাচীনকালে বিজ্ঞানীরা কতকগুলি জটিল চিহ্নের সাহায্যে পদার্থের নাম প্রকাশ করতেন। বিজ্ঞানী **ডাল্‌টন** জটিল চিহ্নের বদলে সরল চিহ্ন দিয়ে বিভিন্ন পদার্থের নাম প্রকাশের চেষ্টা করেন। কিন্তু 92 রকম



জ্যোতির্বিদ্যার চিহ্নের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের নাম প্রকাশ করার পদ্ধতি।



ডাল্‌টন-প্রবর্তিত কতকগুলি মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের চিহ্ন।

মৌলিক পদার্থের চিহ্ন ঐ প্রণালীতে মনে রাখা সম্ভব নয়, আবার অণুর গঠনও ঐ প্রণালীতে প্রকাশ করা কষ্টকর। বিজ্ঞানী **বার্জেলিয়াস** পদার্থের নাম প্রকাশের সহজ ও সরল প্রণালী আবিষ্কার করেন।

- **চিহ্ন বা প্রতীকঃ মৌলিক পদার্থের নাম যা দ্বারা সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়, তাকে চিহ্ন বলে।** অন্য কথায় বলা যায়—**মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুকে সংক্ষেপে প্রকাশ করাকেই চিহ্ন বলে।**
- **পদ্ধতিঃ** মৌলের নাম সংক্ষেপে প্রকাশ করার কয়েকটি পদ্ধতি আছে—

(1) মৌলিক পদার্থের ইংরেজী নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে, যেমন—

বোরন	(Boron)	=	B	কার্বন	(Carbon)	=	C
হাইড্রোজেন	(Hydrogen)	=	H	নাইট্রোজেন	(Nitrogen)	=	N
সালফার	(Sulphur)	=	S	অক্সিজেন	(Oxygen)	=	O

(2) একই প্রথম অক্ষরবিশিষ্ট বিভিন্ন মৌল থাকলে, প্রথম অক্ষরটির সঙ্গে পরের অক্ষরটি যোগ করে কিংবা প্রথম অক্ষরের সঙ্গে জোরে উচ্চারিত অক্ষর যোগ করে মৌলগুলির চিহ্ন প্রকাশ করা হয়।

ক্যালসিয়াম	(Calcium) = Ca	ব্রোমিন	(Bromine)	= Br
বেরিয়াম	(Barium) = Ba	বিসমাথ	(Bismuth)	= Bi
ক্লোরিন	(Chlorine) = Cl	ক্রোমিয়াম	(Chromium)	= Cr
হিলিয়াম	(Helium) = He	জিঙ্ক	(Zinc)	= Zn

(3) মৌলের ল্যাটিন নামের প্রথম বা প্রথম দুটি অক্ষর বা প্রথম ও জোরে উচ্চারিত অক্ষর দিয়েও চিহ্ন প্রকাশ করা হয়—

সোডিয়াম (Natrium)	= Na	সিলভার	(Argentum)	= Ag
পটাসিয়াম (Kalium)	= K	গোল্ড	(Aurum)	= Au
মারকারি (Hydragium)	= Hg	আয়রন	(Ferrum)	= Fe
কপার (Cuprum)	= Cu	লেড	(Plumbum)	= Pb

(4) চিহ্ন সব সময় বড় অক্ষরে (Capital) লেখা হয়। যেমন—N, H, C ইত্যাদি। কোন চিহ্ন দুই অক্ষরযুক্ত হলে প্রথমটি বড় অক্ষরে এবং দ্বিতীয়টি ছোট অক্ষরে লিখতে হয়। যেমন—Ca, Br, Fe ইত্যাদি।

• **চিহ্নের কাজ বা তাৎপর্য:**

চিহ্ন থেকে কি কি জানা যায়:

(1) চিহ্ন মৌলের নাম সংক্ষেপে প্রকাশ করে।

(2) চিহ্ন দিয়ে মৌলের একটি পরমাণুকে প্রকাশ করা হয়। যেমন—H বললে 1টি হাইড্রোজেন পরমাণু বোঝায়। একাধিক পরমাণুর ক্ষেত্রে চিহ্নের বাম দিকে পরমাণুর সংখ্যা লিখতে হয়। যেমন—2H বললে 2টি হাইড্রোজেন পরমাণু বোঝায়। C বললে একটি কার্বন পরমাণু এবং 4C বললে 4টি কার্বন পরমাণু বোঝায়।

(3) কোন মৌলের পারমাণবিক ওজন* যত, মৌলটির চিহ্ন দ্বারা তত ভাগ ওজনের মৌলটিকে বোঝায়। যেমন, কার্বনের পারমাণবিক গুরুত্ব=12, সুতরাং C চিহ্ন দ্বারা কার্বনের 1টি পরমাণু এবং 12 ভাগ ওজনের কার্বন বোঝায়। নাইট্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব=14, সুতরাং 2N চিহ্ন দ্বারা নাইট্রোজেনের 2টি পরমাণু এবং 28 ভাগ ওজনের নাইট্রোজেন বোঝায়।

---

* **পারমাণবিক ওজন বা গুরুত্ব:** কোন মৌলের একটি পরমাণু, একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে যত গুণ ভারী, সেই সংখ্যাকে ঐ মৌলের পারমাণবিক ওজন বলে।

কতকগুলি প্রয়োজনীয় মৌলের নাম, চিহ্ন ও পারমাণবিক গুরুত্ব*

(Names, symbols and atomic weights of some elements)

নাম অধাতব মৌল	চিহ্ন	পাঃ গুরুত্ব	নাম ধাতব মৌল	চিহ্ন	পাঃ গুরুত্ব
হাইড্রোজেন	H	1	সোডিয়াম	Na	23
হিলিয়াম	He	4	ম্যাগনেসিয়াম	Mg	24
বোরন	B	10·8	অ্যালুমিনিয়াম	Al	27
কার্বন	C	12	পটাসিয়াম	K	39
নাইট্রোজেন	N	14	ক্যালসিয়াম	Ca	40
অক্সিজেন	O	16	ক্রোমিয়াম	Cr	52·01
ফ্লুওরিন	F	19	ম্যাঙ্গানীজ	Mn	54·9
নিয়ন	Ne	20	আয়রন	Fe	55·8
সিলিকন	Si	28·06	নিকেল	Ni	58·6
ফসফরাস	P	31	কপার	Cu	63·5
সালফার	S	32	জিঙ্ক	Zn	65·3
ক্লোরিন	Cl	35·5	সিলভার	Ag	108
ব্রোমিন	Br	80	গোল্ড	Au	197
আয়োডিন	I	127	পারদ	Hg	200·6
			লেড	Pb	207·0
			ইউরেনিয়াম	U	238

2.7 সঙ্কেত

মৌল বা যৌগের অণু, পরমাণুর দ্বারা গঠিত।

চিহ্নের সাহায্যে মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের একটি অণুকে সংক্ষেপে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সঙ্কেত বলে।

- **সঙ্কেত লেখার পদ্ধতিঃ**

(1) **মৌলিক পদার্থের অণুর ক্ষেত্রে**—মৌলটির চিহ্ন লিখে চিহ্নটির ডানদিকে একটু নিচে মৌলটির অণুর মধ্যে যত সংখ্যক পরমাণু আছে সেই সংখ্যাটি লিখে ঐ অণুর সঙ্কেত প্রকাশ করা হয়। যেমন—(i) অক্সিজেনের 1টি অণুর মধ্যে 2টি পরমাণু আছে, কাজেই অক্সিজেনের সঙ্কেত হবে O_2। এইভাবে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের সঙ্কেত যথাক্রমে N_2 এবং H_2 হবে। আবার, $2O_2$ বললে অক্সিজেনের 2টি অণু বোঝায়, $4N_2$ বললে নাইট্রোজেনের 4টি অণু বোঝায়।

(ii) 4টি ফসফরাস পরমাণু যুক্ত হয়ে ফসফরাসের 1টি অণু গঠন করে, সুতরাং ফসফরাসের সঙ্কেত P_4। (iii) ধাতুর অণুগুলি 1টি পরমাণু দ্বারা গঠিত, তাই তাদের চিহ্ন দিয়েই সঙ্কেত প্রকাশ করা হয় ; যেমন— সোডিয়ামের সঙ্কেত Na, আয়রনের সঙ্কেত Fe।

মৌলিক পদার্থের অণুর সঙ্কেতঃ

মৌল	একটি অণু কয়টি কি কি পরমাণু দ্বারা গঠিত	সঙ্কেত
হাইড্রোজেন	2টি H	H_2
সালফার	8টি S	S_8
নাইট্রোজেন	2টি N	N_2
ফসফরাস	4টি P	P_4
সোডিয়াম	1টি Na	Na
ক্যালসিয়াম	1টি Ca	Ca

(2) **যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রে—যৌগটি যে যে মৌল দ্বারা গঠিত ঐ সব মৌলের চিহ্নগুলি পাশাপাশি লিখে, ঐ চিহ্নগুলির ডানদিকে একটু নিচে ঐ পরমাণুগুলির সংখ্যা লিখে যৌগিক পদার্থের সঙ্কেত প্রকাশ করা হয়।** যেমন— (i) সালফিউরিক অ্যাসিডের 1টি অণুর মধ্যে 2টি H পরমাণু, 1টি S পরমাণু এবং 4টি O পরমাণু আছে। সুতরাং, সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্কেত H_2SO_4। অনুরূপে, জলের সঙ্কেত H_2O, অ্যামোনিয়ার সঙ্কেত NH_3। একটির বেশী সংখ্যক অণু প্রকাশ করতে হলে সঙ্কেতের বামদিকে অণুটির সংখ্যা লিখতে হয়। যেমন, $3H_2SO_4$ লিখলে বোঝা যাবে সালফিউরিক অ্যাসিডের 3টি অণু। $2H_2O$ বললে জলের 2টি অণু বোঝায়।

কয়েকটি যৌগিক পদার্থের অণুর সঙ্কেতঃ

যৌগিক পদার্থ	একটি অণু কয়টি কি কি পরমাণু দ্বারা গঠিত	সঙ্কেত
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	1টি N, 4টি H, 1টি Cl	NH_4Cl
কার্বন ডাই-অক্সাইড	1টি C, 2টি O	CO_2
সালফার ডাই-অক্সাইড	1টি S, 2টি O	SO_2
নাইট্রিক অক্সাইড	1টি N, 1টি O	NO
সালফিউরিক অ্যাসিড	2টি H, 1টি S, 4টি O	H_2SO_4
নাইট্রিক অ্যাসিড	1টি H, 1টি N, 3টি O	HNO_3

● সঙ্কেতের কাজ বা তাৎপর্যঃ

সঙ্কেত থেকে কি কি বিষয় জানা যায়ঃ

(1) **সঙ্কেত মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের নাম সংক্ষেপে প্রকাশ করে।**

(2) **সঙ্কেত দ্বারা মৌল বা যৌগের একটি অণুকে প্রকাশ করা হয় এবং অণুটি কি কি মৌলের কয়টি পরমাণু দিয়ে তৈরি, জানা যায়।**

(3) **সঙ্কেত মৌল বা যৌগের আণবিক গুরুত্ব প্রকাশ করে এবং মৌল বা যৌগের অণুর সংখ্যা প্রকাশ করে।**

যেমন, H_2SO_4 লিখলে এক অণু সালফিউরিক অ্যাসিড বোঝায়। এর 1টি অণুর মধ্যে 1টি সালফার পরমাণু, 2টি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং 4টি অক্সিজেন পরমাণু আছে। সালফিউরিক অ্যাসিডের আণবিক গুরুত্ব— $(2\times1)+(1\times32)+(4\times16)=98$।

(4) **কি কি ওজন-অনুপাতে বিভিন্ন মৌল পরস্পর যুক্ত হয়ে যৌগটি গঠন করে জানা যায়; তাছাড়া মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের কত ভাগ ওজন হয়, তাও জানা যায়।**

যেমন, সালফিউরিক অ্যাসিডের বেলায় জানা যায় 98 ভাগ ওজনের সালফিউরিক অ্যাসিডে 2 ভাগ ওজনের H, 32 ভাগ ওজনের S এবং 64 ভাগ ওজনের O আছে।

আবার $2H_2SO_4$ বললে, $2\times98=196$ ভাগ ওজনের সালফিউরিক অ্যাসিড বোঝায়।

(5) **মৌল বা যৌগ গ্যাসীয় হলে, প্রমাণ উষ্ণতায় ও চাপে মৌল বা যৌগটির আয়তন কত হবে তা জানা যায়।** যেমন—

CO_2 বললে প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় 22·4 লিটার কার্বন ডাই-অক্সাইড বোঝায়। $2H_2$ বললে প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় $2\times22{\cdot}4=44{\cdot}8$ লিটার হাইড্রোজেন বোঝায়।

মনে রেখো, যৌগিক পদার্থ উৎপন্নের সময় মৌলের পরমাণুগুলি যে কোন সংখ্যায় পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় না—তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে। যেমন, 2টি H পরমাণু 1টি O পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে H_2O অর্থাৎ জলের অণু গঠন করবে। 1টি O পরমাণুর সঙ্গে কখনো 3টি বা 4টি H পরমাণু যুক্ত হবে না।

● জলের সঙ্কেত H_2O—এর থেকে আমরা কি কি তথ্য জানতে পারি?

জলের সঙ্কেত H_2O থেকে আমরা নিচের তথ্যগুলি জানতে পারি—(i) এক অণু জল, (ii) জলের একটি অণুর মধ্যে 2টি

হাইড্রোজেন পরমাণু এবং 1টি অক্সিজেন পরমাণু আছে। (iii) জলের আণবিক গুরুত্ব $= (2 \times 1) + (1 \times 16) = 18$, (iv) 18 ভাগ ওজনের জল বুঝায়, (v) জল গ্যাসীয় অবস্থায় থাকলে অর্থাৎ স্টীম হলে N.T.P.-তে এর আয়তন হবে 22·4 লিটার।

● জলের সঙ্কেত OH_2 রূপে লেখা হয় না কেন?

যৌগের সঙ্কেত লেখার সময় কোন্ মৌলের চিহ্ন আগে এবং কোন্‌টির চিহ্ন পরে বসবে এ সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম আছে।

(i) যে যৌগ ধাতু এবং অধাতু দ্বারা গঠিত সেই যৌগের অণুর সঙ্কেতে প্রথমে ধাতুর চিহ্ন লিখে পরে অধাতুর চিহ্ন বসাতে হয়। যেমন—CaO, $MgCl_2$, FeO।

(ii) হাইড্রোজেন অধাতু হলেও ধাতুর মত ব্যবহার করে। তাই হাইড্রোজেন এবং অধাতুর সংযোগে গঠিত যৌগের সঙ্কেতে আগে হাইড্রোজেন এবং পরে অধাতুটির চিহ্ন বসাতে হয়। যেমন—H_2O, HCl।

(iii) দুটি অধাতু দ্বারা গঠিত যৌগের ক্ষেত্রে যে অধাতুটি কঠিন হয় তার চিহ্ন প্রথমে বসে। যেমন—SO_2, CO_2।

(iv) দুটি গ্যাসীয় মৌলের পরমাণু দ্বারা গঠিত যৌগটি যদি গ্যাস হয়, তবে যে পরমাণুটির সংখ্যা বেশী হয় সেটিকে পরে লিখতে হয়। যেমন—NH_3, NO_2, NCl_3।

● মৌলের যোজ্যতাঃ কোন মৌলের 1টি পরমাণু যত সংখ্যক H বা Cl পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে, কিংবা কোন যৌগ থেকে যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুকে প্রতিস্থাপিত করে, সেই সংখ্যাকে ঐ মৌলের যোজ্যতা বা যোজন ক্ষমতা বলে।

(i) একটি H পরমাণুর যোজ্যতা = 1 ধরা হয়। 1টি Cl পরমাণু 1টি H পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে HCl গঠন করে; তাই Cl-এর যোজ্যতা = 1।

(ii) একটি O পরমাণু 2টি H পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে H_2O উৎপন্ন করে, তাই O-এর যোজ্যতা = 2।

(iii) একটি N পরমাণু 3টি H পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপন্ন করে। N-এর যোজ্যতা = 3।

(iv) একটি C পরমাণু 4টি H পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মিথেন (CH_4) উৎপন্ন করে। C-এর যোজ্যতা = 4।

(v) জিঙ্কের বা ম্যাগনেসিয়ামের একটি পরমাণু লঘু HCl বা H_2SO_4 থেকে 2টি H পরমাণু প্রতিস্থাপিত করে, সুতরাং Zn-এর যোজ্যতা = 2, ম্যাগনেসিয়ামের যোজ্যতা = 2।

(vi) Cl-এর যোজ্যতা = 1। তাই অন্যান্য মৌলের যোজ্যতা Cl-এর যোজ্যতা দিয়ে মাপা হয়। একটি Al পরমাণু 3টি Cl পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে $AlCl_3$ উৎপন্ন করে। Al-এর যোজ্যতা = 3।

মৌল	যোজ্যতা	যোজ্যতা প্রকাশক চিহ্ন	যৌগের গঠন	সঙ্কেত
H	1	—H	H—O—H	H_2O
Cl	1	—Cl	H—Cl	HCl
O	2	—O—	H—O—H	H_2O
N	3	—N— |	H—N—H | H	NH_3
C	4	| —C— |	H | H—C—H | H	CH_4
Al	3	—Al— |	Cl—Al—Cl | Cl	$AlCl_3$

কয়েকটি মৌল এবং মূলকের যোজ্যতা :

যোজ্যতা→	1	2	3	4	5
মৌল→	হাইড্রোজেন (H) ক্লোরিন (Cl) ব্রোমিন (Br) আয়োডিন (I) সোডিয়াম (Na) পটাসিয়াম (K) সিলভার (Ag) কপার (আস্) Cu) মারকারি (Hg)	অক্সিজেন (O) ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ক্যালসিয়াম (Ca) জিঙ্ক (Zn) সালফার (S) আয়রন (আস্) (Fe কপার (ইক্) (Cu) মারকারি (ইক্) (Hg) লেড (Pb)	নাইট্রোজেন (N) ফসফরাস (P) আয়রন (ইক্) (Fe) অ্যালুমিনিয়াম (Al)	কার্বন (C) সালফার (S) সিলিকন (Si)	ফসফরাস (P) নাইট্রোজেন (N)
মূলক→	নাইট্রেট (NO_3) ক্লোরাইড (Cl) ব্রোমাইড (Br) হাইড্রক্সিল (OH) ক্লোরেট (ClO_3) বাইকার্বনেট (HCO_3) অ্যামোনিয়াম (NH_4)	কার্বনেট (CO_3) সালফেট (SO_4) সালফাইড (S) ডাইক্রোমেট (Cr_2O_7)	ফসফেট (PO_4) ফসফাইড (P) নাইট্রাইড (N)		

[**মূলক :** কতকগুলি পরমাণু একসঙ্গে থেকে পরমাণুর মত ব্যবহার করে। এরা স্বাধীন অবস্থায় থাকতে পারে না। এইরকম পরমাণুপুঞ্জকে মূলক বলে। যেমন— **OH** (হাইড্রক্সিল), $\mathbf{CO_3}$ (কার্বনেট), $\mathbf{SO_4}$ (সালফেট), $\mathbf{NO_3}$ (নাইট্রেট), $\mathbf{NH_4}$ (অ্যামোনিয়াম)।]

● **যোজ্যতার ব্যবহার (Uses of Valency) :**

যোজ্যতা অনুসারে বিভিন্ন মৌল কিংবা মূলকগুলিকে শ্রেণী-বিভাগ করার ফলে রসায়ন পাঠ অনেক সহজ হয়েছে। তাছাড়া, যোজ্যতার সাহায্যে বিভিন্ন যৌগের সংকেত সহজেই প্রকাশ করা যায়।

যেমন ধরা যাক, দুটি মৌল M এবং N আছে। M মৌলের যোজ্যতা x এবং N মৌলের যোজ্যতা y। তাহলে M এবং N মৌল দ্বারা গঠিত যৌগের সংকেত হবে $M_y N_x$; **অর্থাৎ M মৌলের যোজ্যতা যত সেই সংখ্যাটি N মৌলের ডানদিকে নিচের দিকে এবং N মৌলের যোজ্যতা যত সেই সংখ্যাটি M মৌলের ডানদিকে নিচে লিখে যৌগটির সংকেত প্রকাশ করা হয়।**

যেমন ধরি, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সংকেত লিখতে হবে।

(i) প্রথমে অ্যালুমিনিয়াম ও অক্সিজেনের চিহ্ন পর পর লেখা হল, (ii) প্রত্যেকটির যোজ্যতা, চিহ্নের ডানদিকে লেখা হল, (iii) এইবার Al এবং O চিহ্ন দুটি ঠিক পাশাপাশি লিখে O-এর যোজ্যতাকে Al-এর ডানপাশে নিচে এবং Al-এর যোজ্যতাকে O-এর ডানপাশে নিচের দিকে বসালে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের এই সংকেত পাওয়া যাবে।

(1) **অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সংকেত**

(i) **Al-এর যোজ্যতা = 3**
O-এর যোজ্যতা = 2

(ii) Al ↖ ↗ 3
O ↙ ↘ 2

(iii) $\mathbf{Al_2O_3}$ **অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড**

(2) **সোডিয়াম ফসফেটের সংকেত**

(i) **Na-এর যোজ্যতা = 1**
$\mathbf{(PO_4)}$**-এর যোজ্যতা = 3**

(ii) Na ↖ ↗ 1
(PO_4) ↙ ↘ 3

(iii) $\mathbf{Na_3(PO_4)}$ **সোডিয়াম ফসফেট**

(3) **ক্যালসিয়াম ফসফেটের সংকেত**

(i) **Ca-এর যোজ্যতা = 2**
$\mathbf{(PO_4)}$**-এর যোজ্যতা = 3**

(ii) Ca ↖ ↗ 2
(PO_4) ↙ ↘ 3

(iii) $\mathbf{Ca_3(PO_4)_2}$ **ক্যালসিয়াম ফসফেট**

● **যোজ্যতা অনুসারে যৌগিক অণুর সঙ্কেত রচনা করার উদাহরণঃ**

(i) **সোডিয়াম মনোক্সাইডঃ** সোডিয়াম ধাতু, তাই সঙ্কেতে সোডিয়ামের চিহ্ন আগে বসবে এবং যেহেতু অক্সিজেন অধাতু, তাই ওর চিহ্ন পরে বসবে। এখন Na-এর যোজ্যতা = 1 এবং O-এর যোজ্যতা = 2। সুতরাং সোডিয়াম মনোক্সাইডের সঙ্কেত Na_2O।

(ii) **সালফার ডাই-অক্সাইডঃ** সালফার এবং অক্সিজেন উভয়ে অধাতু, কিন্তু S একটি কঠিন পদার্থ, তাই সালফার ডাই-অক্সাইডের সঙ্কেতে আগে সালফারের চিহ্ন এবং পরে অক্সিজেনের চিহ্ন বসবে। এখন S-এর যোজ্যতা = 4 এবং O-এর যোজ্যতা = 2। সুতরাং সালফার ডাই-অক্সাইডের সঙ্কেত S_2O_4 বা SO_2 হবে (সংখ্যাগুলির সাধারণ গুণিতক 2 দিয়ে ভাগ করে)।

(iii) **অ্যামোনিয়াম সালফেটঃ** অ্যামোনিয়াম মূলক ধাতুধর্মী এবং সালফেট মূলক অধাতুধর্মী। তাই অ্যামোনিয়াম সালফেটের সঙ্কেতে NH_4 মূলকটি আগে এবং SO_4 মূলককে পরে লিখতে হবে। এখন NH_4 মূলকের যোজ্যতা = 1 এবং SO_4 মূলকের যোজ্যতা = 2। সুতরাং অ্যামোনিয়াম সালফেটের সঙ্কেত $(NH_4)_2SO_4$।

● **নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল ঃ**

যৌগের নাম	যৌগের মধ্যে পরমাণুগুলির যোজ্যতা		যৌগের সঙ্কেত
সোডিয়াম ক্লোরাইড	Na—1	Cl—1	NaCl
ফেরিক অক্সাইড	F —3	O—2	Fe_2O_3
ক্যালসিয়াম নাইট্রাইড	Ca—2	N—3	Ca_3N_2
ফসফরাস পেণ্টক্সাইড	P —5	O—2	P_2O_5
ফেরিক সালফাইড	Fe—3	S—2	Fe_2S_3

কতকগুলি যৌগের নাম ও সঙ্কেত নিচে দেওয়া হল ঃ

যৌগের নাম	সঙ্কেত	যৌগের নাম	সঙ্কেত
অ্যাসিড		**নাইট্রেট লবণ**	
সালফিউরিক অ্যাসিড	H_2SO_4	সোডিয়াম নাইট্রেট	$NaNO_3$
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	HCl	পটাসিয়াম নাইট্রেট	KNO_3
নাইট্রিক অ্যাসিড	HNO_3	ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট	$Mg(NO_3)_2$
অ্যাসেটিক অ্যাসিড	CH_3COOH	অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	NH_4NO_3
অক্সাইড		**হ্যালাইড লবণ**	
সালফার ডাই-অক্সাইড	SO_2		
কার্বন ডাই-অক্সাইড	CO_2	সোডিয়াম ক্লোরাইড	$NaCl$
নাইট্রিক অক্সাইড	NO	পটাসিয়াম ক্লোরাইড	KCl
ফেরিক অক্সাইড	Fe_2O_3	অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	NH_4Cl
ক্যালসিয়াম অক্সাইড	CaO	পটাসিয়াম আয়োডাইড	KI
অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড	Al_2O_3	ক্যালসিয়াম ব্রোমাইড	$CaBr_2$
ক্ষার		**সালফাইড**	
		ফেরাস সালফাইড	FeS
সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড	$NaOH$	সোডিয়াম সালফাইড	Na_2S
পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড	KOH	জিঙ্ক সালফাইড	ZnS
ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড	$Ca(OH)_2$	হাইড্রোজেন সালফাইড	H_2S
অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড	NH_4OH	অ্যামোনিয়াম সালফাইড	$(NH_4)_2S$
কার্বনেট লবণ		**আরো কয়েকটি যৌগ**	
সোডিয়াম কার্বনেট	Na_2CO_3		
ক্যালসিয়াম কার্বনেট	$CaCO_3$	কার্বন মনোক্সাইড	CO
ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট	$MgCO_3$	পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট	$KMnO_4$
সোডিয়াম বাই-কার্বনেট	$NaHCO_3$	অ্যামোনিয়া	NH_3
সালফেট লবণ		**জৈব যৌগ**	
কপার সালফেট	$CuSO_4$		
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	$MgSO_4$	বেঞ্জিন	C_6H_6
সোডিয়াম সালফেট	Na_2SO_4	গ্লুকোজ	$C_6H_{12}O_6$
ফেরাস সালফেট	$FeSO_4$	ইথাইল অ্যালকোহল	C_2H_5OH
জিঙ্ক সালফেট	$ZnSO_4$	চিনি	$C_{12}H_{22}O_{11}$

প্রশ্নাবলী

I. জ্ঞানমূলক ঃ

(i) জল যে একটি যৌগিক পদার্থ এটা কোন্ বিজ্ঞানী প্রমাণ করেন ?

(ii) বিশুদ্ধ জলের গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক কত ?

(iii) রাসায়নিক বিশ্লেষণ কাকে বলে ?

(iv) তড়িৎ-বিশ্লেষণ বলতে কি বোঝ?
(v) জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণে কি কি পদার্থ পাওয়া যায়?
(vi) তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ কাকে বলে?
(vii) ক্যাথোড, অ্যানোড কাকে বলে?
(viii) ভোল্টামিটার কি?
(ix) রাসায়নিক সংশ্লেষণ এবং রাসায়নিক বিয়োজন বলতে কি বোঝ?
(x) তাপীয় বিয়োজন কাকে বলে?
(xi) চিহ্ন এবং সঙ্কেতের সংজ্ঞা দাও।
(xii) সংশ্লেষণিক পদ্ধতিতে কিভাবে জল প্রস্তুত করা হয় বর্ণনা কর।
(xiii) চিহ্ন থেকে আমরা কি কি তথ্য জানতে পারি?
(xiv) সঙ্কেত থেকে কি কি বিষয় জানা যায়?
(xv) যোজ্যতা কাকে বলে? সোডিয়াম, অক্সিজেন, ফসফরাস, অ্যালুমিনিয়ামের যোজ্যতা কত?

II. **বোধমূলক :**

(i) জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ করলে অ্যানোডে এবং ক্যাথোডে কি কি গ্যাস মুক্ত হয়?
(ii) তাপীয় বিয়োজনের উদাহরণ দাও।
(iii) 2H, N, N_2, এবং $7O_2$ বলতে কি বোঝ?
(iv) চিহ্ন এবং সঙ্কেতের মধ্যে পার্থক্য কি?
(v) H_2O—এই সঙ্কেত থেকে আমরা কি কি তথ্য জানতে পারি?
(vi) দুটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর যে জল একটি যৌগিক পদার্থ।
(vii) তড়িৎ-বিশ্লেষণ বলতে কি বোঝায়? একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
(viii) রাসায়নিক বিয়োজন বলতে কি বোঝায়? একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
(ix) রাসায়নিক সংযোজন বলতে কি বোঝায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
(x) H, 4H এবং H_2 বলতে কি বোঝ?
(xi) 4N, $4N_2$, NaCl, 5NaCl, H_2SO_4, $3CO_2$ এবং $2NH_3$ বলতে কি বোঝায়?
(xii) পদার্থের রাসায়নিক সংযুতি বলতে কি বোঝ? মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের গঠনে পার্থক্য কি? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
(xiii) একটি একযোজী, দ্বিযোজী এবং ত্রিযোজী মৌলের নাম এবং চিহ্ন লেখ। নাইট্রেট, সালফেট এবং ফসফেট মূলকের যোজ্যতা লেখ।
(xiv) একটি যৌগের সঙ্কেত H_2SO_4—এর থেকে আমরা কি কি বিষয় জানতে পারি? [H=1, S=32, O=16]
(xv) অ্যামোনিয়ার সঙ্কেত NH_3—এর থেকে কি কি তথ্য জানা যায়? [N=14, H=1]

III. প্রয়োগমূলকঃ

(i) একটি যৌগের অণুতে 3টি H পরমাণু, 1টি P পরমাণু এবং 4টি O পরমাণু আছে, যৌগের সঙ্কেত লেখ।

(ii) HNO_3-এর মধ্যে ওর উপাদানগুলির ওজন ও অনুপাত কত? ওর আণবিক গুরুত্ব কত?

(iii) জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ করে অ্যানোডে 5 c.c. অক্সিজেন পাওয়া গেল। ঐ সময়ে ক্যাথোডে কত c.c. হাইড্রোজেন উৎপন্ন করবে?

(iv) 16 ভাগ ওজনের অক্সিজেনের সঙ্গে কত ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে জল উৎপন্ন করবে?

(v) অ্যামোনিয়ার মধ্যে 1টি নাইট্রোজেন এবং 3টি হাইড্রোজেন পরমাণু বর্তমান—এর সঙ্কেত কি হবে?

(vi) 2টি Na, 1টি S এবং 4টি O পরমাণু দ্বারা গঠিত যৌগের সঙ্কেত লেখ। যৌগটির আণবিক গুরুত্ব কত?

(vii) Ca-এর যোজ্যতা 2 এবং NO_3-এর যোজ্যতা 1, ক্যালসিয়াম নাইট্রেটের সঙ্কেত কি হবে?

(viii) একটি যৌগের সঙ্কেত P_2O_5, P এবং O-এর যোজ্যতা কত?

(ix) চিনির 1টি অণুর মধ্যে 12টি কার্বন পরমাণু, 22টি H পরমাণু এবং 11টি অক্সিজেন পরমাণু বর্তমান। চিনির সঙ্কেত লেখ।

(x) নিচের মৌলগুলির চিহ্ন লেখঃ
সোডিয়াম, মারকারি, সিলভার, লেড, নাইট্রোজেন, কপার, লোহা, ক্লোরিন, পটাসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম।

(xi) নিচের যৌগগুলির সঙ্কেত লেখঃ
অ্যামোনিয়া, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম কার্বনেট, সালফিউরিক অ্যাসিড; কস্টিক সোডা, ভিনিগার, কলিচুন, তুঁতে, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট।

(xii) একটি যৌগের একটি অণুতে দুটি হাইড্রোজেন, একটি কার্বন এবং তিনটি অক্সিজেন পরমাণু আছে। যৌগটির সঙ্কেত লেখ।

(xiii) (a) HgO-কে উত্তপ্ত করায় Hg এবং O_2 উৎপন্ন হয়।
(b) Mg তারকে O_2-এর মধ্যে দহন করায় সাদা রঙের MgO উৎপন্ন হয়।
বিক্রিয়া দুটির মধ্যে কোন্‌টি রাসায়নিক সংশ্লেষণ এবং কোন্‌টি বিয়োজন?

(xiv) (a) গ্লুকোজের 1টি অণুর মধ্যে 6টি কার্বন পরমাণু, 12টি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং 6টি অক্সিজেন পরমাণু আছে।
(b) ক্যালসিয়াম কার্বনেটের একটি অণুর মধ্যে 1টি ক্যালসিয়াম, 1টি কার্বন এবং 3টি অক্সিজেন পরমাণু আছে।
(c) সালফিউরিক অ্যাসিডের 1টি অণুর মধ্যে 2টি হাইড্রোজেন, 1টি সালফার এবং 4টি অক্সিজেন পরমাণু আছে।

গ্লুকোজ, ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের সংকেত লেখ এবং প্রত্যেকটির আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় কর।

(xv) (a) ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে ($CaCO_3$) উত্তপ্ত করলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) এবং CO_2 উৎপন্ন হয়।

(b) অক্সিজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন মিশিয়ে অগ্নিসংযোগ করলে জল (H_2O) উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়া দুটির মধ্যে কোন্‌টি সংযোজন বিক্রিয়া এবং কোন্‌টি বিয়োজন বিক্রিয়া?

(xvi) একটি যৌগের মধ্যে 2টি হাইড্রোজেন পরমাণু, 1টি কার্বন ও 3টি অক্সিজেন পরমাণু আছে। যৌগটির সংকেত লেখ এবং যৌগটির আণবিক গুরুত্ব কত?

(xvii) একটি সাদা গুঁড়াকে উত্তপ্ত করলে বর্ণহীন, গন্ধহীন একটি গ্যাস উৎপন্ন হয় যাকে স্বচ্ছ চুনজলের মধ্য দিয়ে চালনা করলে চুনজল ঘোলা হয়ে যায়। গ্যাসটি কি? সাদা অবশেষরূপে পড়ে থাকা পদার্থটি কি? এখানে সাদা গুঁড়া পদার্থটির সংশ্লেষণ না বিয়োজন হল?

(xviii) M একটি মৌল এবং A অপর একটি মৌল। M-এর যোজ্যতা=a এবং A-এর যোজ্যতা=b হলে M এবং A-এর সংযোগে গঠিত যৌগটির সংকেত কি হবে?

(xix) একটি লাল রঙের পদার্থ A-কে তীব্র তাপ প্রয়োগ করলে একটি বর্ণহীন গ্যাস B নির্গত হয় এবং পাত্রে একটি চক্‌চকে তরল পদার্থ C পড়ে থাকে। B গ্যাসের মধ্যে শিখাহীন জ্বলন্ত পাটকাঠি প্রবেশ করালে তীব্রভাবে জ্বলে ওঠে। A, B এবং C-কে সনাক্ত কর। এখানে A পদার্থের সংশ্লেষণ না বিয়োজন হল?

(xx) নিচের যৌগগুলির মধ্যে কি কি পরমাণু কয়টি করে আছে লেখ এবং প্রত্যেকটির আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় কর।

সালফার ডাই-অক্সাইড, সোডিয়াম কার্বনেট, নাইট্রিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট।

(S=32, O=16, Na=23, C=12, N=14, H=1 Ca=40, Mg=24)।

(xxi) Mg-এর যোজ্যতা 2 এবং SO_4-এর যোজ্যতা=2 হলে ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের সংকেত কি হবে?

(xxii) মৌল A এবং B-এর যোজ্যতা যথাক্রমে 2 এবং 3। মৌল দুটি যুক্ত হয়ে যে যৌগ উৎপন্ন করে তার সংকেত লেখ।

IV. দক্ষতামূলক:

(i) জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ পরীক্ষাটির একটি চিত্র অংকন করে অ্যানোড, ক্যাথোড নির্দেশ কর এবং কোন্ স্থানে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস মুক্ত হয় দেখাও।

(ii) জলের সংশ্লেষণে ক্যাভেন্ডিসের পরীক্ষাটির একটি চিত্র অঙ্কন করে যন্ত্রটির বর্ণনা কর।

(iii) তাপীয় বিয়োজন দেখাবার জন্য একটি পরীক্ষার চিত্র এঁকে পরীক্ষাটি বর্ণনা কর।

(iv) একটি ভোল্টামিটারের চিত্র অঙ্কন কর। ভোল্টামিটারের দুই তড়িৎ-দ্বারের সঙ্গে ব্যাটারীর সংযোগ দেখিয়ে অ্যানোড এবং ক্যাথোড লেবেল কর। কোন্ তড়িৎদ্বারে ক্যাটায়ন এবং কোন্ তড়িৎদ্বারে অ্যানায়ন যুক্ত হয় দেখাও।

Objective type Questions :

[A] শূন্যস্থান পূরণ কর:

(i) — এবং — এই দুটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে — তৈরি। (ii) বাতাসের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস পোড়ালে — উৎপন্ন হয়। (iii) মৌলিক পদার্থের একটি —কে সংক্ষেপে প্রকাশ করাকে চিহ্ন বলে। (iv) HNO_3 যৌগটির আণবিক গুরুত্ব —। (v) 2H বলতে হাইড্রোজেনের — — বোঝায় এবং H_2 বলতে হাইড্রোজেনের — — বোঝায়। (vi) সোডিয়াম + — = সোডিয়াম ক্লোরাইড। (vii) জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ করলে ক্যাথোডে — আয়তন — এবং অ্যানোডে — আয়তন — পাওয়া যায়। (viii) ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সঙ্কেত —। (ix) কোন মৌলের 1টি পরমাণু যত সংখ্যক — পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয় সেই সংখ্যাকে ঐ মৌলের যোজ্যতা বলে। (x) অক্সিজেনের যোজ্যতা = —।

[B] সঠিক উত্তরে '✓' দাগ দাও:

(i) চিহ্ন দ্বারা যৌগের পরমাণু/অণুকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়।

(ii) জল ভাল তড়িৎ পরিবহণ করতে পারে না। জলকে সুপরিবাহী করার জন্য জলের সঙ্গে সামান্য অ্যাসিড/স্পিরিট/কেরোসিন যোগ করতে হয়।

(iii) জলকে ভাঙলে এক/দুই আয়তন অক্সিজেন, দুই/তিন আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাস পাওয়া যায়।

(iv) জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ করলে—অ্যানোডে অক্সিজেন/হাইড্রোজেন এবং ক্যাথোডে হাইড্রোজেন/অক্সিজেন বেরোয়।

(v) সঙ্কেত দ্বারা কোন পদার্থের একটি পরমাণু/অণুকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়।

(vi) গ্লুকোজের সঙ্কেত $C_6H_{12}O_6$/$C_{12}H_{22}O_{11}$

(vii) $2HgO = 2Hg + O_2$—বিক্রিয়াটি সংযোজন বিক্রিয়া/বিয়োজন বিক্রিয়া।

(viii) মৌলের যোজ্যতা—পূর্ণসংখ্যা/ভগ্নাংশ।

(ix) জল একটি সাধারণ মিশ্রণ/মৌল/যৌগ।

(x) H_2O বলতে জলের 1টি পরমাণু/1টি অণু বোঝায়।

(xi) ক্যালসিয়াম নাইট্রেটের সঙ্কেত হল—

$Ca(NO_3)_2/CaN_2O_6/(NO_3)Ca$

(xii) পটাসিয়াম ক্লোরেটকে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করলে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়, তাকে বিয়োজন/সংযোজন বলে।

[C] ঠিক না ভুল নির্দেশ কর:

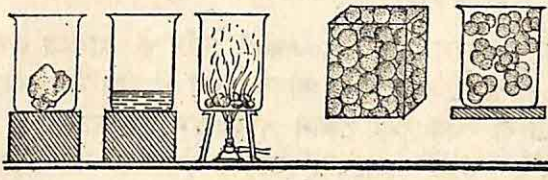
(i) H_2SO_4—একটি যৌগ অণুর সঙ্কেত।

(ii) কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্কেত O_2C।

(iii) $2HgO=2Hg+O_2$—বিক্রিয়াটি হল রাসায়নিক সংযোজন।

(iv) একটি অণুর মধ্যস্থ পরমাণুগুলির পারমাণবিক ওজনের যোগফলই হল অণুটির আণবিক ওজন।

(v) সংযোজন বিক্রিয়ায় কোন নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় না।



তৃতীয় অধ্যায়

পদার্থ

3.1 পদার্থ

পৃথিবীর যে দিকে আমরা তাকাই, সেই দিকেই দেখি অজস্র রকমের পদার্থ ছড়িয়ে আছে। এই সুন্দর পৃথিবী, আকাশের চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র—সবই কিন্তু পদার্থ।

আমরা অনেক পদার্থ দেখতে পাই, আবার কতকগুলি পদার্থ দেখতে পাই না, কিন্তু ওদের অস্তিত্ব অনুভব করি।

• **সংজ্ঞাঃ যা কিছুটা জায়গা দখল করে থাকে, যার ভর আছে, যাদের আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করতে পারি, আর যার জাড্য ধর্ম* আছে, তাকেই পদার্থ বলে।**

3.2 পদার্থের ধর্ম

পদার্থমাত্রেরই কয়েকটি সাধারণ ধর্ম আছে, যথা—

(i) পদার্থের কিছু-না-কিছু **ভর থাকবেই।**

(ii) পদার্থ যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, কিছু-না-কিছু স্থান অধিকার করে থাকবে।

(iii) পদার্থ নিজে থেকে নিজের স্থির অবস্থার বা গতিশীল অস্বথার পরিবর্তন করতে পারে না। কোন পদার্থ স্থির অবস্থায় থাকলে, ওর উপর বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে চিরকাল স্থির অবস্থায় থাকবে, আবার যদি গতিশীল অবস্থায় থাকে তবে ওকে বাধা না দেওয়া পর্যন্ত সমবেগে সরলরেখায় চলতে থাকবে। পদার্থের এই **ধর্মকে জাড্য ধর্ম** বলে।

(iv) পদার্থকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায়।

(v) দুটি পদার্থ কখনো একই জায়গা দখল করতে পারে না, পদার্থের এই ধর্মকে **অভেদ্যতা** বলে।

(vi) পদার্থের ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রেখে ওকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। পদার্থের এই ধর্মকে **বিভাজ্যতা** বলে।

3.3 পদার্থের তিন অবস্থা

পদার্থ তিনটি অবস্থায় থাকতে পারে, যথা—(i) কঠিন, (ii) তরল এবং (iii) গ্যাসীয়।

---

* পদার্থ যেমন আছে তেমনি থাকতে চায়—নিজে থেকে নিজের স্থির বা গতিশীল অবস্থার পরিবর্তন করতে চায় না। পদার্থের এই ধর্মকে জাড্য ধর্ম বলে।

(1) **কঠিন পদার্থ**ঃ কঠিন পদার্থের **একটি নির্দিষ্ট আকার এবং আয়তন** আছে। যেমন—সোনা, কাঠ, ইট, পাথর। বল প্রয়োগ না করলে কঠিন পদার্থের আকার বা আয়তনের কোন পরিবর্তন হয় না।

(2) **তরল পদার্থ**ঃ তরল পদার্থের **আকার নির্দিষ্ট নয়** কিন্তু **আয়তন নির্দিষ্ট**। যেমন—জল, তেল, দুধ ইত্যাদি তরল পদার্থকে যখন যে পাত্রে ঢালা হয় তখন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। তাপে তরলের আয়তন বাড়ে। সাধারণ উষ্ণতায় তরলের উপরতল থেকে বাষ্পায়ন হয়।

(3) **গ্যাসীয় পদার্থ**ঃ গ্যাসীয় পদার্থের **আকার বা আয়তন কোনটিই নির্দিষ্ট নয়**; যেমন—বায়ু, হাইড্রোজেন ইত্যাদি।

(i) গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ যতই কম হোক না কেন, যখন যে পাত্রে রাখা হয় তখন সেই পাত্রের আকার এবং আয়তন লাভ করে।

(ii) স্থির চাপে উষ্ণতা বাড়ালে গ্যাসের আয়তন বাড়ে, কমালে আয়তন কমে।

(iii) স্থির উষ্ণতায় গ্যাসের উপর চাপ প্রয়োগ করলে, আয়তন কমে, চাপ কমালে আয়তন বাড়ে। **চাপ এবং তাপের উপর গ্যাসের আয়তন নির্ভর করে।**

[বর্তমানে প্লাজমা অবস্থাকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলে ধরা হয়। খুব উচ্চ উষ্ণতায় পদার্থের এই অবস্থা হয়।]

3.4 পদার্থের শ্রেণীবিভাগ

মোটামুটিভাবে বলা যায়, যে কোন পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে তিন রকম পদার্থ পাওয়া যায়—(1) **বিশুদ্ধ মৌল**—যে পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে ঐ পদার্থ ছাড়া অন্য ধর্মবিশিষ্ট কোন পদার্থ পাওয়া যায় না, সেই পদার্থকে **মৌলিক পদার্থ** বলে; যেমন—সোনা, রূপা, হাইড্রোজেন ইত্যাদি। (2) **বিশুদ্ধ যৌগ**—যে পদার্থকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে একের বেশী সংখ্যক পৃথক ধর্মবিশিষ্ট মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়, তাকে **যৌগ** বলে; যেমন—জল, চিনি, ভিনিগার, তুঁতে ইত্যাদি। (3) **মিশ্র পদার্থ**—দুই বা ততোধিক পদার্থ মেশালে যদি পদার্থগুলির নিজ নিজ ধর্ম বজায় থাকে—কোন নতুন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন না হয়, তাহলে তাকে **মিশ্র পদার্থ** বলে। যেমন—আলকাতরা, দুধ, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি।

ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের উপর ভিত্তি করে মৌলগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—

(i) **ধাতু**ঃ সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, কপার, আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম, সিলভার, গোল্ড, জিংক, টিন ইত্যাদি।

(ii) **অধাতুঃ** হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, সালফার, কার্বন, ফসফরাস ইত্যাদি।

(iii) **ধাতুকল্পঃ এই জাতীয় মৌলের মধ্যে ধাতু এবং অধাতু উভয়ের ধর্ম বর্তমান থাকে।** সেইজন্য এদের ধাতু বা অধাতু রূপে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয় না। **আর্সেনিক, অ্যাণ্টিমনি**—এই মৌলগুলি হল ধাতুকল্প।

(iv) **নিষ্ক্রিয় মৌলঃ হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপটন, জেনন এবং রেডন**—এই ছয়টি মৌল কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না—সেইজন্য এদের নিষ্ক্রিয় মৌল বলে।

3.5 পদার্থের গঠন

আদিমকাল থেকে মানুষের মনে প্রশ্ন—পৃথিবীর বুকে যে অসংখ্য রকমের পদার্থ পড়ে রয়েছে—এইগুলি কি দিয়ে তৈরি। এই প্রশ্নের উত্তর প্রথম দেন ভারতীয় ঋষি **কণাদ**। তিনি বলেন, প্রত্যেক পদার্থ খুব ছোট ছোট কণা দিয়ে তৈরি। তিনি এই সূক্ষ্ম কণার নাম দেন **পরমাণু**।

পরমাণুঃ পরমাণু হল কোন মৌলিক পদার্থের সবচেয়ে ছোট কণা, যার মধ্যে ঐ পদার্থের সব গুণ বর্তমান থাকে। পদার্থের গুণগুলি বজায় রেখে পরমাণু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

বিজ্ঞানী **জন ডাল্‌টন** পরমাণুর পরিকল্পনাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেন। ডাল্‌টনের এই তত্ত্ব বিজ্ঞানজগতে **পরমাণুবাদ** নামে খ্যাত।

- **ডাল্‌টনের পরমাণুবাদঃ**

(i) **প্রত্যেক মৌল অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি।** এই **কণাগুলিকে কোন ভৌত বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ভাঙা যায় না বা সৃষ্টি করা যায় না।** তিনি মৌলিক পদার্থের **এইরকম ছোট** ছোট **কণাগুলির নাম দেন পরমাণু।**

পরমাণুকে চোখে বা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না। পৃথিবীতে 105 রকম মৌলিক পদার্থ আছে। এই 105 রকম মৌলিক পদার্থ, 105 রকম পৃথক ধর্মবিশিষ্ট পরমাণু দিয়ে তৈরি।

(ii) **একই মৌলিক পদার্থের প্রতিটি পরমাণুর ওজন ও ধর্ম একই হয়।** যেমন—প্রতিটি অক্সিজেন পরমাণুর ধর্ম ও ওজন একই, প্রতিটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ধর্ম ও ওজন একই হয়।

(iii) **বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ধর্ম ও ওজন বিভিন্ন হয়।** যেমন—সোনার পরমাণুর ওজন রূপার পরমাণুর ওজনের চেয়ে বেশী। সোনার পরমাণুর ধর্মের সঙ্গে রূপার পরমাণুর ধর্মের কোন মিল নেই।

(iv) **মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি পূর্ণসংখ্যার সরল অনুপাতে পরস্পর যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে।** যেমন—কার্বনকে অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে দহন করলে কার্বন ডাই-অক্সাইড অণু গঠিত হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) অণুর মধ্যে কার্বন এবং অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত $= 1 : 2$।

ডাল্টনের এই পরমাণু-কল্পনা রসায়ন বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ অবদান। এই পরিকল্পনাকে ধরে নিয়ে পরে পদার্থের গঠন ও রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি বোঝবার অনেক সুবিধা হয়েছে।

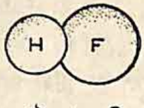
অণুঃ ডাল্টনের পরমাণুবাদ থেকে যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায় না। ইতালীয় বিজ্ঞানী **অ্যামিদিও অ্যাভোগ্যাড্রো** 1811 খ্রীষ্টাব্দে যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর মতবাদ থেকে মৌল এবং যৌগের ক্ষুদ্রতম কণা সম্পর্কে একটা ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। অণুর মধ্যে পদার্থের সব ধর্মই বর্তমান থাকে।

মনে করা যাক্, একটি লবণের দানাকে ভেঙে দু টুকরা করা হল। প্রত্যেক টুকরাকে ভেঙে আবার দু টুকরা করা হল। এইভাবে ভাঙতে থাকলে শেষে ঐ লবণের ছোট একটা কণা পাওয়া যাবে ; দেখা যাবে লবণের ঐ ছোট কণাটির মধ্যে লবণের সব ধর্ম বর্তমান আছে। সবচেয়ে ছোট এই কণাটিকে অণু বলে। অণুটিকে ভাঙলে কিন্তু যে কণাগুলি পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে আর লবণের ধর্ম বর্তমান থাকে না।

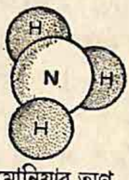
সামান্য চিনি নিয়ে যন্ত্র দিয়ে চূর্ণ করলে চিনির মিহি গুঁড়া পাওয়া যাবে। এই গুঁড়ার ছোট ছোট কণাকে খালি চোখে দেখা না গেলেও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যাবে। এইবার চিনির এই গুঁড়া নিয়ে এক গ্লাস জলে ফেলে নেড়ে দাও—ব্যাস, চিনির গুঁড়া আর দেখতে পাচ্ছ না। তার মানে চিনির গুঁড়া জলে দ্রবীভূত হয়ে গেল। জলের স্বাদ নিয়ে দেখ মিষ্টি লাগছে, তার মানে চিনি অদৃশ্য হলেও ওর গুণ বর্তমান আছে ; অর্থাৎ চিনিকে দেখতে না পেলেও জলের মধ্যে চিনি মিশে আছে। জলে দ্রবীভূত হওয়ার সময় চিনির গুঁড়াগুলি সবচেয়ে ছোট ছোট কণায় বিভক্ত হয়ে জলের অণুর ফাঁকের মধ্যে ঢুকে গেছে। ফলে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলেও চিনির ঐ ছোট ছোট কণাগুলিকে আর দেখা যাবে না। চিনির এই ছোট কণাগুলির নাম হল চিনির অণু।

অণুঃ **মৌল বা যৌগের সবচেয়ে ছোট কণা, যার মধ্যে পদার্থটির সমস্ত ধর্ম বর্তমান থাকে, আর যে কণা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে,**

তাকে অণু বলে। অ্যাভোগ্যাড্রোর মতে মৌলিক পদার্থের অণুগুলিকে **মৌলিক অণু** এবং যৌগিক পদার্থের অণুকে **যৌগিক অণু** বলে।



হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড অণু



অ্যামোনিয়ার অণু



জলের অণু

• **মৌলিক অণুঃ** (a) **মৌলিক পদার্থের প্রতি অণু একই রকম ধর্ম ও ওজন বিশিষ্ট এক বা একাধিক পরমাণু দিয়ে তৈরি। এইরকম অণুকে মৌলিক অণু বলে।** যেমন—হাইড্রোজেন গ্যাসের অণু 2টি হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে তৈরি। এইভাবে অক্সিজেন গ্যাসের অণু 2টি অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে তৈরি। H_2, O_2, N_2 ইত্যাদি।

(b) আবার কতকগুলি মৌলিক পদার্থ, যেমন—**নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির অণু একটি করে পরমাণু দিয়ে তৈরি ;** যেমন—হিলিয়াম গ্যাসের একটি অণুতে একটি হিলিয়াম পরমাণু আছে। হিলিয়াম He, নিয়ন Ne।

(c) ধাতুর অণুগুলিও একটি করে পরমাণু দ্বারা গঠিত, যেমন—Na, K, Ca।

(d) সাধারণ অবস্থায় ফসফরাসের অণু 4টি করে পরমাণু দ্বারা গঠিত, যেমন—P_4।

মৌলিক পদার্থের একটি অণু যত সংখ্যক পরমাণু দ্বারা গঠিত, সেই সংখ্যাকে ঐ মৌলের পারমাণবিকতা বলে।

• **যৌগিক অণুঃ যৌগিক পদার্থের অণুগুলি বিভিন্ন রকম পরমাণু দ্বারা গঠিত। এইরকম অণুকে যৌগিক অণু বলে।** জল, অ্যামোনিয়া, সালফিউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি হল যৌগিক পদার্থ। জলের 1টি অণুর মধ্যে 2টি হাইড্রোজেন পরমাণু ও 1টি অক্সিজেন পরমাণু আছে (H_2O)। অ্যামোনিয়ার 1টি অণুর মধ্যে 3টি হাইড্রোজেন পরমাণু ও 1টি নাইট্রোজেন পরমাণু আছে (NH_3)।

H_2SO_4, HNO_3, CO_2, HCl—এরা সবাই যৌগিক অণু।

• **পরমাণুর গঠন সম্পর্কে আধুনিক ধারণাঃ**

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বিখ্যাত বিজ্ঞানী **রাদারফোর্ড** এবং **নীলস্ বোর** পরমাণুর গঠন সম্পর্কে একটা পরিষ্কার চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁদের মতে প্রধানত তিনটি প্রাথমিক কণা দিয়ে পরমাণু তৈরি। এই তিনটি কণা হল—(i) **প্রোটন,** (ii) **নিউট্রন** এবং (iii) **ইলেকট্রন।**

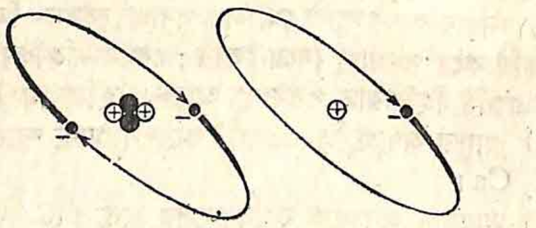
প্রোটনে এক একক পজিটিভ চার্জ থাকে এবং এর ভরও এক একক। **নিউট্রন** কণা হল নিস্তড়িৎ এবং এর ভরও এক একক। **ইলেকট্রন কণার** মধ্যে এক একক নেগেটিভ চার্জ থাকে এবং এর ভর নগণ্য।

নিউক্লিয়াসঃ পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রন এবং প্রোটন কণা অতি ক্ষুদ্র স্থানে একসঙ্গে অবস্থান করে। একে **নিউক্লিয়াস** বলে।

পরমাণু-ক্রমাঙ্কঃ নিউক্লিয়াসের মধ্যে যতগুলি প্রোটন থাকে, সেই সংখ্যাকে পরমাণুর **পারমাণবিক সংখ্যা** বা **পরমাণু-ক্রমাঙ্ক** বলে।

ভরসংখ্যাঃ নিউট্রন এবং প্রোটনের মোট সংখ্যাই হল পরমাণুটির **ভরসংখ্যা**। কেন্দ্রে যতগুলি প্রোটন থাকে, সমসংখ্যক ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষে আবর্তন করে। যেহেতু একটি পরমাণুর মধ্যে পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত প্রোটন এবং নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান, তাই পরমাণু নিস্তড়িৎ হয়।

হাইড্রোজেনের কেন্দ্রে 1টি প্রোটন থাকে এবং একে কেন্দ্র করে 1টি



ইলেকট্রন আবর্তন করে। হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে 2টি প্রোটন এবং 2টি নিউট্রন থাকে এবং একে কেন্দ্র করে 2টি ইলেকট্রন আবর্তন করে।

3.6 রাসায়নিক বিক্রিয়া একটি পারমাণবিক ঘটনা

● **রাসায়নিক বিক্রিয়াঃ রাসায়নিক বিক্রিয়া হল একটি পারমাণবিক ঘটনা, এক বা একের বেশী সংখ্যক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটলে, ঐ পদার্থগুলির অণুর গঠন বদলে সম্পূর্ণ নতুন ধর্মবিশিষ্ট নতুন পদার্থের অণু উৎপন্ন হয়—এই ঘটনাকে রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে।**

রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে একটি পদার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট আর একরকম পদার্থে পরিণত হয় বটে, কিন্তু পদার্থের মূল উপাদান অর্থাৎ **পরমাণুর গঠন ও পরমাণুর মোট সংখ্যার কোন পরিবর্তন হয় না।** রাসায়নিক বিক্রিয়ার আগে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী যে কয়টি পরমাণু ছিল, বিক্রিয়ার পরেও ঠিক সেই কয়টি পরমাণু অবিকৃত অবস্থায় থাকে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণুগুলি এরকম **অণুর কাঠামো ভেঙে**

ফেলে নতুন ধরনের কাঠামোবিশিষ্ট অণু গঠন করে। তাই বলা যায়, **রাসায়নিক বিক্রিয়া হল একটি পারমাণবিক ঘটনা।**

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে সব পদার্থের পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ যারা বিক্রিয়া করে, তাদের **বিক্রিয়ক** বা **বিক্রিয়াকারী পদার্থ** বলে। আর বিক্রিয়ার ফলে যে সব নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাদের **বিক্রিয়াজাত পদার্থ** বলে।

যেমন, কাঠকয়লাকে অক্সিজেনের মধ্যে পোড়ালে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এখানে কাঠকয়লা ও অক্সিজেন হল বিক্রিয়ক আর কার্বন ডাই-অক্সাইড হল বিক্রিয়াজাত পদার্থ। $C + O_2 = CO_2$

বিক্রিয়ার আগে একটি C পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন অণু অর্থাৎ 2টি অক্সিজেন পরমাণু পৃথকভাবে ছিল। বিক্রিয়ার পর ঐ C পরমাণুর সঙ্গে 2টি O পরমাণু যুক্ত হয়ে CO_2 অণু উৎপন্ন করে।

● **রাসায়নিক সমীকরণঃ কোন রাসায়নিক বিক্রিয়াকে চিহ্ন ও সঙ্কেতের সাহায্যে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের পরমাণুগুলির মধ্যে সমতা বজায় রেখে সংক্ষেপে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে রাসায়নিক সমীকরণ বলে।** এক কথায় সমীকরণ হল রাসায়নিক বিক্রিয়ার সঙ্কেত।

● **রাসায়নিক সমীকরণ লেখার পদ্ধতিঃ**

(i) প্রথমে মাঝখানে তীরচিহ্ন (→) লিখে বিক্রিয়ক পদার্থের সঙ্কেত বাম দিকে এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থের সঙ্কেত ডান দিকে লিখতে হয়।

(ii) বিকারক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থ একের বেশী হলে বিকারক পদার্থের সঙ্কেতগুলিকে + চিহ্ন দিয়ে এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থের সঙ্কেতগুলিকে + চিহ্ন দিয়ে যোগ করা হয়। বাম দিকের সংকেতগুলি কোন কোন অণুর মধ্যে বিক্রিয়া ঘটছে এবং ডান দিকের সঙ্কেতগুলি বিক্রিয়ার ফলে কি কি উৎপন্ন হবে তা প্রকাশ করে। যেমন, একটি বিক্রিয়ায় বিকারকগুলি H_2 এবং O_2, বিক্রিয়াজাত পদার্থ H_2O। এক্ষেত্রে $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ লেখা হয়।

(iii) এখন বাম দিকে বিকারক পদার্থগুলির মোট ভর = ডান দিকের বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলির মোট ভর হবে। সুতরাং বাম দিকে বিকারক পদার্থগুলির পরমাণুর মোট সংখ্যা = ডান দিকে বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলির পরমাণুর মোট সংখ্যা হবে। তাই পরমাণুর সংখ্যার সমতা বিধানের জন্য বিক্রিয়ার আগে এবং বিক্রিয়ার পরে উৎপন্ন অণুগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে উভয় পাশের পরমাণুর সংখ্যা সমান করতে হবে। এই অবস্থায় সমীকরণটি যমতাযুক্ত সমীকরণ হয়।

(iv) এইভাবে উভয় দিকে অণুর সংখ্যা ঠিক করে (→) চিহ্নটি উঠিয়ে বিকারক এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলির মাঝে = চিহ্ন বসাতে হয়। যেমন, $2H_2 + O_2 = 2H_2O$ এই সমীকরণটি হল সমতাযুক্ত সমীকরণ।

● উদাহরণঃ অক্সিজেনের (O_2) সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের (Al) অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3) উৎপন্ন হয়।

$$Al + O_2 \longrightarrow Al_2O_3$$

এখন দেখা যাচ্ছে, বাম পাশে Al পরমাণু সংখ্যা = 1 এবং ডান পাশে = 2, বাম পাশে O পরমাণু সংখ্যা = 2 এবং ডান পাশে = 3, এখন বাম পাশে 4টি Al অণু এবং 3টি O_2 অণু বসালে আর ডান পাশে 2টি Al_2O_3 অণু বসালে উভয় পাশে Al এবং O পরমাণুর সংখ্যা সমান হয়। সুতরাং সমতাযুক্ত সমীকরণটি হল,

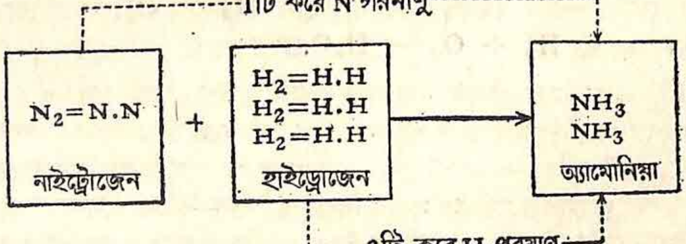
$$4Al + 3O_2 = 2Al_2O_3$$

● **পরমাণুগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়ঃ**

নিচের উদাহরণে বোঝা যায় যে, পরমাণুগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয় ; যেমন—

(i) **নাইট্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।** $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$

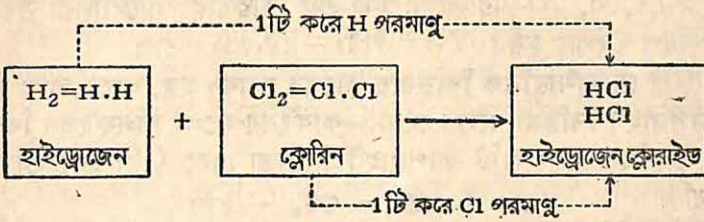
নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন অণুগুলি 2টি করে পরমাণু দ্বারা গঠিত (N_2 এবং H_2)। এই দুটি গ্যাসের বিক্রিয়ার সময় 1 অণু নাইট্রোজেনের সঙ্গে 3 অণু হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে 1 অণু অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে (NH_3) (একই চাপ ও উষ্ণতায়)। এই বিক্রিয়ায় দেখা যায়, H_2 অণু থেকে H পরমাণুগুলি এবং N_2 অণু থেকে N পরমাণুগুলি বেরিয়ে এসে এক-একটি N পরমাণুর সঙ্গে 3টি করে H পরমাণু যুক্ত হয়ে NH_3 অণু গঠন করে। এইভাবে দুটি N পরমাণু থেকে দুই অণু অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।



(ii) **হাইড্রোজেনের সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।** $H_2 + Cl_2 = 2HCl$

এই বিক্রিয়ার সময় H_2 অণু থেকে 1টি করে H পরমাণু বেরিয়ে

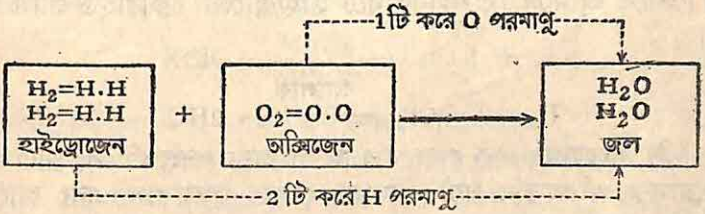
এসে, Cl_2 অণু থেকে বেরিয়ে আসা 1টি করে Cl পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 1টি করে HCl অণু উৎপন্ন করে। $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$



(iii) **হাইড্রোজেন গ্যাসকে অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে জ্বালালে জল উৎপন্ন হয়।** $2H_2 + O_2 = 2H_2O$

এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় H_2 অণু এবং O_2 অণু ভেঙে নতুন কাঠামোবিশিষ্ট জলের অণু উৎপন্ন করে। বিক্রিয়ার সময় H_2 অণু থেকে 2টি করে H পরমাণু, O_2 অণু থেকে বেরিয়ে আসা 1টি করে O পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে H_2O অণু উৎপন্ন করে।

$$2H_2O + O_2 \rightarrow 2H_2O$$



তাহলে দেখা গেল, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণুগুলিই অংশগ্রহণ করে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়াকারী পদার্থগুলির অণুর মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের **পরমাণুগুলি কিছুমাত্র না বদলে পূর্ণসংখ্যার সরল অনুপাতে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিক্রিয়াজাত পদার্থের নতুন কাঠামোবিশিষ্ট অণু উৎপন্ন করে।**

3.7 রাসায়নিক বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য

(i) বিক্রিয়ক পদার্থগুলি সর্বদা নির্দিষ্ট ওজন-অনুপাতে পরস্পর যুক্ত হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়।

(ii) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের উদ্ভব বা তাপ শোষিত হবেই।

(a) **যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের উদ্ভব হয়, তাকে তাপ-উৎপাদক বা তাপমোচী বিক্রিয়া বলে।** যেমন—কার্বন, অক্সিজেনের মধ্যে জ্বলে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়াটি ঘটার সময় তাপ উৎপন্ন

হয়, সুতরাং বিক্রিয়াটি তাপমোচী বিক্রিয়া এবং CO_2 তাপমোচী পদার্থ।

$$C + O_2 = CO_2 + \text{তাপ}$$

অনুরূপে, N_2-এর সঙ্গে H_2-এর বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া উৎপন্নের সময় তাপ উৎপন্ন হয়। $N_2 + 3H_2 = 2NH_3 + \text{তাপ}$

(b) **যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপের শোষণ হয়, তাকে তাপ শোষক বা তাপগ্রাহী বিক্রিয়া বলে।** যেমন—কার্বনের সঙ্গে সালফারের বিক্রিয়ায় তাপ শোষিত হয়—এটি তাপগ্রাহী বিক্রিয়া এবং CS_2 হল তাপগ্রাহী পদার্থ।

$$C + 2S = CS_2 - \text{তাপ}$$

(iii) বিক্রিয়কের অণুর মধ্যস্থ পরমাণুগুলি নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়ে নতুন ধর্মবিশিষ্ট নতুন অণু সৃষ্টি করে।

(iv) বিক্রিয়কগুলির পরিবর্তন স্থায়ী হয়।

3.8 রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিভিন্ন শর্ত

রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য কতকগুলি শর্ত আছে, যথা—

(1) **আলোকঃ** হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন গ্যাস মিশিয়ে অন্ধকারে রাখলে কোন নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু ঐ গ্যাস-মিশ্রণ সূর্যালোকে আনলে বিস্ফোরণ ঘটে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।

$$H_2 + Cl_2 \xrightarrow{\text{আলোক}} 2HCl$$

(2) **সংযোগঃ** এক পদার্থের সঙ্গে অন্য পদার্থের সংযোগের ফলে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে ; যেমন—শ্বেত ফসফরাস এবং আয়োডিন পরস্পর স্পর্শ করালে আগুন জ্বলে ওঠে এবং নতুন পদার্থ ফসফরাস ট্রাই-আয়োডাইড উৎপন্ন হয়। সোডিয়াম ধাতুকে জলের সংস্পর্শে আনলেই বিস্ফোরণ সহ বিক্রিয়া ঘটে জ্বলে ওঠে এবং সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও H_2 উৎপন্ন হয়।

(3) **তাপঃ** চুনাপাথরের ($CaCO_3$) সাধারণ উষ্ণতায় কিছু হয় না ; কিন্তু উত্তপ্ত করলে বিয়োজিত হয়ে চুন (CaO) এবং CO_2 উৎপন্ন হয়।

$$CaCO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} CaO + CO_2$$

(4) **বিদ্যুৎঃ** অ্যাসিডযুক্ত জলের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করলে জল বিশ্লিষ্ট হয়ে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।

(5) **দ্রাব্যতাঃ** শুষ্ক সোডার সঙ্গে টারটারিক অ্যাসিড মেশালে ওদের কোন পরিবর্তন হয় না। এই মিশ্রণের সঙ্গে জল মেশাবার সঙ্গে

সঙ্গে দুটি পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের প্রচুর বুদ্‌বুদ নির্গত হতে দেখা যায়।

(6) **চাপঃ** চাপ প্রয়োগে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে; যেমন—আর্সেনিক সালফাইড এবং পটাসিয়াম ক্লোরেটের মিশ্রণের উপর চাপ প্রয়োগ করলে প্রচন্ড বিস্ফোরণ হয় এবং পদার্থগুলির রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।

(7) **অনুঘটকঃ** অনেক সময় দেখা যায় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন একটি বিশেষ পদার্থ উপস্থিত থাকলেই বিক্রিয়ার বেগের পরিবর্তন হয়—বাড়ে কিংবা কমে, অথচ এই বিশেষ পদার্থটির নিজের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। যে অনুঘটক বিক্রিয়ায় উপস্থিত থেকে বিক্রিয়ার বেগ বাড়ায়, তাকে **পজিটিভ অনুঘটক** বলে। যেমন—MnO_2, $KClO_3$-এর বিয়োজনে উপস্থিত থেকে এর বিয়োজন দ্রুত করে। MnO_2 তাই পজিটিভ অনুঘটক। যে অনুঘটক বিক্রিয়ায় উপস্থিত থেকে বিক্রিয়ার বেগ কমায়, তাকে **নেগেটিভ অনুঘটক** বলে। যেমন—অল্প অ্যাসিড H_2O_2-এর মধ্যে উপস্থিত থেকে এর বিয়োজন মন্থর করে। এখানে অ্যাসিড হল নেগেটিভ অনুঘটক।

$$2KClO_3 \xrightarrow[\text{অনুঘটক}]{MnO_2} 2KCl + 3O_2$$

3.9 বিভিন্ন শ্রেণীর রাসায়নিক বিক্রিয়া

(1) **প্রত্যক্ষ সংযোগ বা সংশ্লেষণঃ একের বেশী বিক্রিয়ক পদার্থের অণুগুলি এই রকম বিক্রিয়ায় সোজাসুজি পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি নতুন পদার্থের অণু গঠন করে।** যেমন—ম্যাগনেসিয়াম তারে আগুন লাগিয়ে অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে ঢোকালে ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেনের পরমাণু পরস্পর যুক্ত হয়ে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের অণু গঠন করে। এখানে 1টি করে Mg, একটি O পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন কাঠামোবিশিষ্ট অণু MgO উৎপন্ন করে।

$$\underset{\text{ম্যাগনেসিয়াম}}{2Mg} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{O_2} = \underset{\text{ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড}}{2MgO}$$

(2) **বিয়োজন পদ্ধতিঃ এই রকম বিক্রিয়ায় কোন পদার্থের অণু বিয়োজিত হয়ে একের বেশী সরল অণু গঠন করে।** (i) জলের অণু 2টি হাইড্রোজেন পরমাণু ও 1টি অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে তৈরি। জলের মধ্যে বিদ্যুৎ চালনা করলে, জলের অণু ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অণু গঠন করে।

$$\underset{\text{জল}}{2H_2O} = \underset{\text{হাইড্রোজেন}}{2H_2} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{O_2}$$

(ii) ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে উত্তপ্ত করলে CaO এবং CO_2 উৎপন্ন হয়। $CaCO_3 = CaO + CO_2$

(3) **প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াঃ এই রকম বিক্রিয়ায় কোন যৌগিক পদার্থের অণুর মধ্যে এক বা একাধিক পরমাণুকে সরিয়ে, অন্য কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণু সেই জায়গা দখল করে।** যেমন—কপার সালফেটের সঙ্গে লোহার বিক্রিয়ায় কপার সালফেট অণুর মধ্যে কপার পরমাণুকে সরিয়ে লোহার পরমাণু সেই জায়গা দখল করে ফেরাস সালফেট অণু গঠন করে, ফলে ধাতব কপার অধঃক্ষিপ্ত হয়।

$$\underset{\text{লোহা}}{Fe} + \underset{\text{কপার সালফেট}}{CuSO_4} = \underset{\text{ফেরাস সালফেট}}{FeSO_4} + \underset{\text{কপার}}{Cu}$$

(4) **বিনিময় বিক্রিয়াঃ** এই রকম বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক অণুগুলির উপাদানগুলি পরস্পর জায়গা বিনিময় করে ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট অণু গঠন করে। যেমন—সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের সঙ্গে সোডিয়াম ক্লোরাইডের বিক্রিয়ায় সিলভার নাইট্রেটের **নাইট্রেট মূলক** (NO_3) ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্লোরাইড মূলক (Cl) পরস্পর জায়গা বিনিময় করে সিলভার ক্লোরাইড ও সোডিয়াম নাইট্রেট উৎপন্ন করে।

$$\underset{\text{সিলভার নাইট্রেট}}{AgNO_3} + \underset{\text{সোডিয়াম ক্লোরাইড}}{NaCl} = \underset{\text{সিলভার ক্লোরাইড}}{AgCl} + \underset{\text{সোডিয়াম নাইট্রেট}}{NaNO_3}$$

(5) **পরমাণুর পুনর্গঠনঃ** এই রকম বিক্রিয়ায় একটা যৌগের অণুর মধ্যে যে পরমাণুগুলি আছে, সেগুলি নতুনভাবে সজ্জিত হয়ে নতুন ধর্মবিশিষ্ট অণু গঠন করে। যেমন—**অ্যামোনিয়াম সায়ানেটকে** গরম করলে, অ্যামোনিয়াম সায়ানেটের অণুর মধ্যে যে সব পরমাণুগুলি থাকে, সেগুলি নতুনভাবে সজ্জিত হয়ে **ইউরিয়ার অণু** গঠন করে।

$$\underset{\text{অ্যামোনিয়াম সায়ানেট}}{NH_4CNO} \longrightarrow \underset{\text{ইউরিয়া}}{O{=}C\begin{matrix} / NH_2 \\ \backslash NH_2 \end{matrix}}$$

(6) **যুত বিক্রিয়াঃ** এই বিক্রিয়ায় কোন যৌগের অণু অন্য কোন মৌল বা যৌগের অণুর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে নতুন যৌগ উৎপন্ন করে; যেমন—কার্বন মনোক্সাইড যৌগটি ক্লোরিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বনিল ক্লোরাইড ($COCl_2$) উৎপন্ন করে। $COCl_2$-কে যুত যৌগ বলে। $CO + Cl_2 = COCl_2$

প্রশ্নাবলী

[A] জ্ঞানমূলক :

(i) পদার্থ কাকে বলে ?
(ii) পৃথিবীতে কয়টি মৌলিক পদার্থ আছে ? অণু এবং পরমাণু কাকে বলে ?
(iii) কয়েকটি মৌলিক অণু এবং যৌগিক অণুর নাম কর।
(iv) পারমাণবিকতা বলতে কি বুঝ ?
(v) প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রন কি ?
(vi) পরমাণু-ক্রমাঙ্ক এবং ভরসংখ্যা কাকে বলে ?
(vii) কোন্ পরমাণুর মধ্যে নিউট্রন কণা থাকে না ?
(viii) রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংজ্ঞা লেখ।
(ix) বিকারক এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থ বলতে কি বুঝ ?
(x) তাপ-শোষক এবং তাপ উৎপাদক বিক্রিয়া কাকে বলে ?
(xi) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কে অংশ নেয় ?
(xii) ডালটনের পরমাণুবাদ সংক্ষেপে লেখ।
(xiii) পদার্থের সাধারণ ধর্ম উল্লেখ কর।
(xiv) মৌলিক অণু এবং যৌগিক অণু কাকে বলে ?
(xv) পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা কি ?
(xvi) রাসায়নিক বিক্রিয়ার শর্তগুলি উল্লেখ কর।
(xvii) সংজ্ঞা লেখ—মৌলিক পদার্থ, যৌগিক পদার্থ।

[B] বোধমূলক :

(i) পদার্থকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং কি কি ?
(ii) এক পরমাণুক, দ্বি-পরমাণুক চতুষ্পরমাণুক অণুর নাম এবং সঙ্কেত লেখ।
(iii) তাপ-শোষক এবং তাপ-উৎপাদক বিক্রিয়া বলতে কি বুঝায় উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
(iv) সংস্পর্শে এবং বিদ্যুৎ দ্বারা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে—একটি করে উদাহরণ দাও।
(v) অনুঘটকের প্রভাবে (a) বিক্রিয়ার বেগ বাড়ে (b) বিক্রিয়ার বেগ কমে—এরূপ বিক্রিয়ার উদাহরণ দাও এবং সংশ্লিষ্ট অনুঘটকের নাম লেখ।
(vi) একটি পদার্থ সাধারণত কয়টি বিভিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে উদাহরণসহ উল্লেখ কর।
(vii) পদার্থের কয়েকটি ধর্মের উল্লেখ কর এবং উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
(viii) রাসায়নিক বিক্রিয়াকে পারমাণবিক ঘটনা বলা হয় কেন উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
(ix) রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা কর।

(x) তাপ-শোষক এবং তাপ-উৎপাদক বিক্রিয়া বলতে কি বুঝায় উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দাও।

(xi) অণু ও পরমাণু বলতে কি বুঝায়? জলের অণুর মধ্যে কয়টি করে কি কি পরমাণু আছে? সালফিউরিক অ্যাসিডের অণুতে কি কি পরমাণু কয়টি করে আছে?

(xii) কত রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

(xiii) রাসায়নিক বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।

(xiv) অক্সিজেনের মধ্যে কার্বনের দহনের বিক্রিয়াটি যে পারমাণবিক ঘটনা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।

(xv) একটি করে উদাহরণ দাও—(a) আলোর সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া, (b) চাপ প্রয়োগে রাসায়নিক বিক্রিয়া।

(xvi) বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থের মধ্যে পার্থক্য কি বল।

(xvii) পজিটিভ অনুঘটক এবং নেগেটিভ অনুঘটকের মধ্যে পার্থক্য কি?

[C] প্রয়োগমূলক :

(i) $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$—এই বিক্রিয়াটিতে কোন্‌গুলি বিকারক এবং কোন্‌টি বিক্রিয়াজাত পদার্থ বল। কত ভাগ ওজনের N_2-এর সঙ্গে কত ভাগ ওজনের H_2-এর বিক্রিয়ায় কত ভাগ ওজনের NH_3 উৎপন্ন হয় বল। $N = 14, H = 1$।

(ii) $2Mg + O_2 = 2MgO$, $CaCO_3 = CaO + CO_2$
উপরের বিক্রিয়া দুটি কি জাতীয় বিক্রিয়া বল।

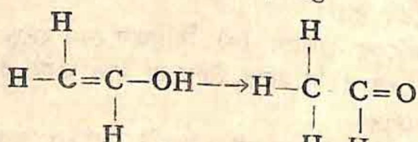
(iii) নিচের পদার্থগুলির মধ্যে কোন্‌টি মৌলিক আর কোন্‌টি যৌগিক পদার্থ বল :
সোনা, তামা, বাতাস, জল, কস্টিক সোডা, হাইড্রোজেন গ্যাস, সালফিউরিক অ্যাসিড, লোহা।

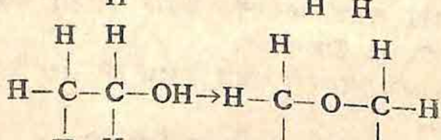
(iv) **নিচের বিক্রিয়াগুলি কি জাতীয় বিক্রিয়া বল :**

(a) $MgCO_3 = MgO + CO_2$; (b) $H_2 + Cl_2 = 2HCl$

(c) $Na_2CO_3 + Pb(NO_3)_2 = PbCO_3 + 2NaNO_3$

(d) $HgCl_2 + Cu = CuCl_2 + Hg$

(e) 

(f) 

(g) $AgNO_3 + NaCl = AgCl + NaNO_3$

(h) $SO_2 + Cl_2 = SO_2Cl_2$

(v) নিচের রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা কর ঃ

(a) নাইট্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।

(b) হাইড্রোজেনের সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় HCl উৎপন্ন হয়।

(vi) $H_2 + Br_2 = 2HBr$—এই বিক্রিয়ায় কোন্‌টি বিকারক এবং কোন্‌টি বিক্রিয়াজাত পদার্থ ?

[D] দক্ষতামূলক ঃ

(i) একটি অ্যামোনিয়া অণু এবং একটি জলের অণুর চিত্র অঙ্কন কর।

(ii) একটি হিলিয়াম পরমাণুর চিত্র অঙ্কন করে দেখাও—পরমাণুটির মধ্যে কয়টি প্রোটন, কয়টি ইলেকট্রন এবং কয়টি নিউট্রন আছে।

(iii) ছবি এঁকে মৌলিক অণু এবং যৌগিক অণুর মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

(iv) হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় জল উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় বিভিন্ন পরমাণুগুলি কিভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়াটিতে অংশ নেয় ছবি এঁকে দেখাও।

(v) 2টি C পরমাণু, 1টি O পরমাণু এবং 6টি H পরমাণু দিয়ে দুটি বিভিন্ন যৌগ উৎপন্ন হয়। যৌগ দুটির অণুর গঠনমূলক সঙ্কেত আঁক।

Objective type Questions :

[A] শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(i) যৌগিক পদার্থের অণুকে ভাঙলে একাধিক মৌলিক পদার্থের — পাওয়া যায়। (ii) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় — অংশগ্রহণ করে। (iii) — কে সাধারণ প্রক্রিয়ায় বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভাঙা যায় না। (iv) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি — সংখ্যার অনুপাতে পরস্পর যুক্ত হয়ে নতুন পদার্থ উৎপন্ন করে। (v) মৌলিক পদার্থের অণু — ধরনের পরমাণু দ্বারা গঠিত। (vi) তরল পদার্থের নির্দিষ্ট — আছে কিন্তু নির্দিষ্ট — নেই। (vii) আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পরমাণু প্রধানতঃ তিনটি প্রাথমিক কণা —, — এবং — দ্বারা গঠিত। (viii) পরমাণুর কেন্দ্রে — এবং — আলাদা অবস্থান করে। একে — বলে। (ix) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় — অংশগ্রহণ করে। (x) যৌগ উৎপন্নের সময় — বিভিন্ন পরমাণুগুলি পূর্ণসংখ্যার — অনুপাতে যুক্ত হয়।

[B] সঠিক উত্তরে '√' দাগ দাও ঃ

(i) পদার্থের অণুকে ভাঙা যায়/যায় না।

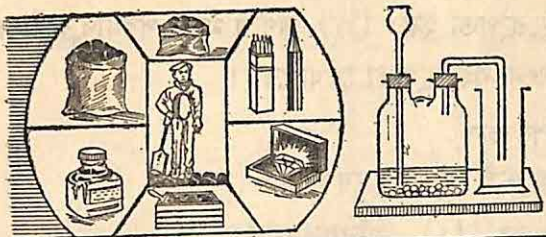
(ii) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের পরমাণুগুলি অবিকৃত থাকে/থাকে না।

(iii) পদার্থের অণুকে ভাঙলে যে ক্ষুদ্রতম কণা পাওয়া যায়, তার মধ্যে অণুর গুণ থাকে/থাকে না।

(iv) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে অণু/পরমাণু।
(v) একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলির ধর্ম এক হয়/বিভিন্ন হয়।
(vi) পরমাণুবাদ প্রকাশ করেন ডালটন/অ্যাভোগাড্রো ?
(vii) $HCl + AgNO_3 = AgCl + HNO_3$—বিক্রিয়াটি বিনিময় বিক্রিয়া/প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া।
(viii) $2HgO = 2Hg + O_2$—বিক্রিয়াটি সংযোগ বিক্রিয়া/বিয়োজন বিক্রিয়া।
(ix) প্রোটন কণায়—1 একক পজিটিভ তড়িৎ/নিস্তড়িৎ থাকে।
(x) পরমাণু বিভাজ্য/অবিভাজ্য।

[C] **নিচের উক্তিগুলির ভুল অংশ কেটে সঠিক কথা লেখ ঃ**

(i) অ্যান্টিমণি একটি ধাতু।
(ii) পরমাণুর কেন্দ্রে ইলেকট্রন এবং নিউট্রন থাকে।
(iii) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের অণু অংশ নেয়।
(iv) $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$—বিক্রিয়াটি বিয়োজন বিক্রিয়া।
(v) $C + O_2 = CO_2$—বিক্রিয়াটি তাপ-শোষক বিক্রিয়া।
(vi) পরমাণুর মধ্যস্থ নিউট্রনের মোট সংখ্যাকে ওর পারমাণবিক সংখ্যা বলে।



চতুর্থ অধ্যায়
কার্বন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড

কার্বন (Carbon)

পারমাণবিক গুরুত্ব—12 সঙ্কেত—C

মৌলের জগতে কার্বন হল বহুরূপী। কার্বনকে বিভিন্ন রূপে প্রকৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। বহুরূপীর মত এক এক জায়গায় এক এক রূপ নিয়ে কার্বন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। কখনো উজ্জ্বল রত্ন হীরক রূপে, কখনো কালো কয়লা রূপে, আবার কখনো নরম পিচ্ছিল গ্রাফাইট রূপে আবার কখনো লোহার চেয়ে শক্ত কার্বোনেডো রূপে কার্বনকে দেখা যায়। একরূপে কার্বন খুব সক্রিয়, আবার অন্যরূপে একে নিষ্ক্রিয় উদাসীন দেখায়। পৃথিবীতে প্রথম জীবনের সূচনা করে এই কার্বন। পৃথিবীতে কার্বন যৌগের সংখ্যা অগণ্য, তাই কার্বনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে নতুন এক রসায়ন বিজ্ঞান—জৈব রসায়ন।

4.1 কার্বনের বহুরূপতা

বহুরূপতাঃ অনেক সময় দেখা যায়, একই মৌলিক পদার্থ দেখতে বিভিন্ন হয় এবং ওদের কিছু কিছু ধর্মও বিভিন্ন হয়। যেমন—কার্বনকে কঠিন এবং উজ্জ্বল হীরক রূপে, কখনো নরম পিচ্ছিল গ্রাফাইট রূপে, আবার কখনো ভঙ্গুর অঙ্গার রূপে বা পাউডারের মত ভুসাকালি রূপে প্রকৃতির মধ্যে পাওয়া যায়।

সংজ্ঞাঃ কোন কোন মৌলিক পদার্থ তাদের মূল রাসায়নিক ধর্ম অক্ষুণ্ণ রেখে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। মৌলের এই বিশেষ ধর্মকে বহুরূপতা বলে। মৌলিক পদার্থটির বিভিন্ন রূপকে রূপভেদ বলে।

কার্বন, সালফার, ফসফরাস প্রভৃতি কতকগুলি মৌলের বহুরূপতা ধর্ম দেখা যায়।

বহুরূপতার কারণঃ (i) মৌলের কেলাসন পদ্ধতির পার্থক্য হলে মৌলের বহুরূপতা দেখা যায়। (ii) মৌলের অণুর মধ্যে পরমাণুর সংখ্যার তারতম্য হলে বহুরূপতা দেখা দেয়। (iii) অণুর অভ্যন্তরীণ

শক্তির তারতম্য হলে বহুরূপতা হয়। (iv) অণুর মধ্যে পরমাণুগুলির অবস্থানের তারতম্যের জন্য বহুরূপতা দেখা দেয়।

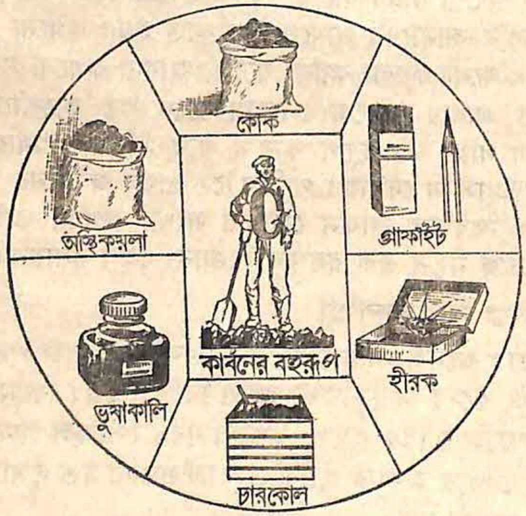
4.2 কার্বনের রূপভেদ

প্রকৃতিতে কার্বনকে দুই আকারে দেখা যায় ; যথা—

(I) **কেলাসাকার** এবং (II) **অনিয়তাকার।**

কেলাসাকার কার্বনের রূপভেদ দুটি, যথা—(i) **হীরক** ও (ii) **গ্রাফাইট।**

অনিয়তাকার কার্বনের রূপভেদগুলি হল—(1) **অঙ্গার বা** **চারকোল ;** (2) **ঝুল বা ভুসাকালি ;** (3) **কোক এবং** (4) **গ্যাস কার্বন।**



উৎস অনুসারে অঙ্গার দু রকমের হয় ; যেমন—

(a) **উদ্ভিজ্জ অঙ্গার** এবং (b) **প্রাণিজ অঙ্গার।**

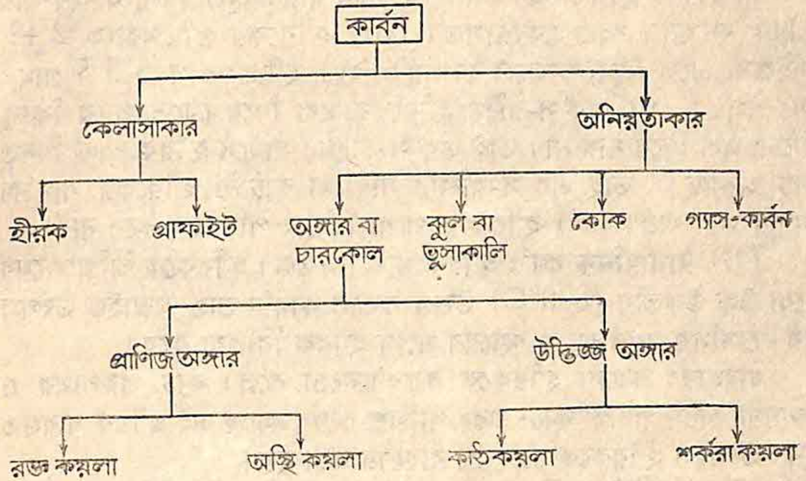
উদ্ভিজ্জ অঙ্গারকে আবার দুই রূপে দেখা যায় ; যেমন—

(i) **কাঠকয়লা** ও (ii) **শর্করা কয়লা।**

প্রাণিজ অঙ্গারকে আবার দুই রূপে দেখা যায় ; যেমন—

(i) **অস্থি কয়লা** ও (ii) **রক্ত কয়লা।**

নিচে কার্বনের রূপভেদগুলি একটি ছকে দেখানো হলঃ



● **কার্বনের বিভিন্ন রূপভেদগুলি আসলে যে একই মৌল কার্বন**— নিচের পরীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়। বিশুদ্ধ অবস্থায় কার্বনের এই রূপভেদগুলির প্রত্যেকটির সমান ওজন নিয়ে শুষ্ক এবং বিশুদ্ধ অক্সিজেনের মধ্যে পোড়ালে প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই রূপভেদগুলি দেখতে বিভিন্ন হলেও এইগুলি আসলে কার্বন ছাড়া অন্য কিছু নয়।

4.3 কেলাসাকার কার্বন

1. **হীরকঃ** ভারতের গোলকুণ্ডায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়, ব্রাজিলে ও রাশিয়ায় হীরক পাওয়া যায়। মোগল সম্রাটের কোহিনুর হীরক পৃথিবীবিখ্যাত।

● **কৃত্রিম হীরক প্রস্তুতিঃ কয়লার উপর প্রচণ্ড তাপ ও চাপ প্রয়োগ করলে কয়লা হীরকে পরিণত হয়।** ফরাসী বিজ্ঞানী ময়সাঁ 1893 খ্রীষ্টাব্দে কৃত্রিম হীরক তৈরি করেন। একটা বৈদ্যুতিক চুল্লীর মধ্যে **শর্করা কয়লা** এবং **লোহা** মিশিয়ে সেই মিশ্রণকে 3000°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করেন। তারপর ঐ মিশ্রণকে গলিত সীসার মধ্যে রেখে হঠাৎ ঠাণ্ডা করেন। এইভাবে গলিত এবং উত্তপ্ত লোহা হঠাৎ ঠাণ্ডা হওয়ায় সংকুচিত হয়ে কয়লার উপর প্রচণ্ড চাপ দেয়, ফলে কয়লার কিছু অংশ ছোট ছোট হীরককণায় পরিণত হয়। লোহা ও হীরককণার মিশ্রণকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ফুটালে, লোহা দ্রবীভূত হয়ে যায়—হীরককে আলাদা করা হয়।

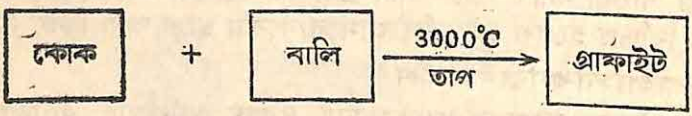
ধর্ম: (A) ভৌত ধর্ম: (i) হীরক সবচেয়ে কঠিন পদার্থ। সেই-জন্য যে কোন পদার্থকে হীরক দিয়ে কাটা যায়। (ii) বিশুদ্ধ অবস্থায় হীরক বর্ণহীন স্বচ্ছ কেলাসিত। (iii) হীরকের প্রতিসরাঙ্ক 2·42, সেইজন্য একে খুব উজ্জ্বল দেখায়। (iv) হীরকের ঘনত্ব 3·5 গ্রাম/সি. সি.। (v) এক্স-রশ্মি হীরকের মধ্য দিয়ে যেতে পারে কিন্তু কাচের মধ্য দিয়ে যায় না। তাই এক্স-রশ্মির সামনে হীরক স্বচ্ছ কিন্তু কাচ অস্বচ্ছ। তাই এক্স-রশ্মির সাহায্যে কাচ ও হীরকের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। (vi) হীরক তাপ বা বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না।

(B) **রাসায়নিক ধর্ম:** হীরক খুব নিষ্ক্রিয়। হীরককে অক্সিজেনের মধ্যে উচ্চ উষ্ণতায় (800°C) উত্তপ্ত করলে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। ক্রোমিক অ্যাসিড ও ক্ষারের সঙ্গে হীরক বিক্রিয়া করে।

ব্যবহার: কালো হীরককে কার্বোনেডো বলে। কাচ, রত্নপাথর ও অন্যান্য কঠিন পদার্থ কাটা এবং পালিশ করার কাজে এই হীরক ব্যবহৃত হয়। উজ্জ্বল হীরককে রত্নরূপে ব্যবহার করা হয়।

(2) **গ্রাফাইট:** শ্রীলঙ্কা, সাইবেরিয়া, ইতালি ও আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় গ্রাফাইট পাওয়া যায়।

• **প্রস্তুতি: বালির সঙ্গে কোক মিশিয়ে 3000°C উষ্ণতায় বৈদ্যুতিক চুল্লীর মধ্যে 25 থেকে 30 ঘণ্টা ধরে উত্তপ্ত করলে কোক গ্রাফাইটে পরিণত হয়।**



ধর্ম: (A) ভৌত ধর্ম: (i) গ্রাফাইট কেলাসিত পদার্থ, দেখতে গাঢ় ধূসর রঙের ও চকচকে। (ii) গ্রাফাইটের ঘনত্ব 2·2 গ্রাম/সি. সি.। (iii) একে স্পর্শ করলে নরম পিচ্ছিল মনে হয়। (iv) কাগজের উপর গ্রাফাইট ঘষলে কালো দাগ পড়ে। (v) **গ্রাফাইট তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে।**

(B) **রাসায়নিক ধর্ম:** অক্সিজেনের মধ্যে গ্রাফাইটকে 700°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। হীরকের মত গ্রাফাইট অতটা নিষ্ক্রিয় নয়। সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে গ্রাফাইটের বিক্রিয়া হয়। ক্ষারের সঙ্গেও এর বিক্রিয়া হয়।

ব্যবহার: (i) পেনসিলের সীসরূপে গ্রাফাইট ব্যবহৃত হয়। (ii) উচ্চতাপসহ মুচি প্রস্তুতিতে ও বৈদ্যুতিক চুল্লীতে তড়িৎ-দ্বাররূপে গ্রাফাইট ব্যবহৃত হয়। (iii) পারমাণবিক চুল্লীতে ও ব্যাটারি

প্রস্তুতিতে এর ব্যবহার আছে। (iv) বারুদ পালিশ করতে এবং পিচ্ছিলকারক তেল প্রস্তুতিতেও গ্রাফাইট ব্যবহৃত হয়।

হীরক এবং গ্রাফাইটের ধর্মের তুলনাঃ

- **সাদৃশ্যঃ**
  - (i) হীরক এবং গ্রাফাইট উভয়ই কার্বনের নিয়তাকার রূপভেদ।
  - (ii) হীরক উজ্জ্বল, গ্রাফাইটও ধাতুর মত উজ্জ্বল।
  - (iii) 800°C উষ্ণতায় উভয়ে অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়।
- **বৈসাদৃশ্যঃ**
  - (i) হীরক বর্ণহীন স্বচ্ছ ঘন কেলাস, গ্রাফাইট ধূসর বর্ণের ষড়ভুজাকার কেলাস।
  - (ii) হীরক হল সবচেয়ে কঠিন পদার্থ, গ্রাফাইট নরম এবং পিচ্ছিল।
  - (iii) হীরকের ঘনত্ব 3·5 গ্রাম/সি. সি., গ্রাফাইটের কেলাসের ঘনত্ব 2·2 গ্রাম/সি. সি.।
  - (iv) হীরক হল তাপ এবং তড়িতের কুপরিবাহী, কিন্তু গ্রাফাইট তাপ এবং তড়িতের সুপরিবাহী।
  - (v) হীরক কাগজে ঘষলে দাগ কাটে না, কিন্তু গ্রাফাইট কাগজে দাগ কাটে।
  - (vi) হীরক দিয়ে কাচ কাটা যায়, কিন্তু গ্রাফাইট দিয়ে কাচ কাটা যায় না।
  - (vii) হীরকের মধ্য দিয়ে এক্স-রশ্মি চলে যায়, কিন্তু গ্রাফাইটের মধ্য দিয়ে যায় না।

4.4 অনিয়তাকার কার্বন

1. **অঙ্গার বা চারকোলঃ** কার্বনের এই রূপভেদকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে ; যেমন—(a) **উদ্ভিজ্জ অঙ্গার ও** (b) **প্রাণিজ অঙ্গার।**

(a) **উদ্ভিজ্জ অঙ্গারঃ** (i) কাঠকয়লা, (ii) শর্করা কয়লা।

• **কাঠকয়লাঃ** কাঠের মধ্যে 50% কার্বন আছে। কাঠকে বাতাসের অবর্তমানে উত্তপ্ত করলে কাঠের মধ্যস্থ তরল ও গ্যাসীয় পদার্থগুলি পাতিত হয়ে চলে যায়, অবশেষরূপে কাঠকয়লা পড়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে **অন্তর্ধূম পাতন** বলে।

• **শর্করা কয়লাঃ** চিনির সঙ্গে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করলে, চিনির জলীয় অংশ সালফিউরিক অ্যাসিড শোষণ করে নেয়, ফলে পড়ে থাকে বিশুদ্ধ কালো কার্বন। একেই বলে শর্করা কয়লা। **শর্করা কয়লা হল বিশুদ্ধ কার্বন।**

ধর্মঃ (A) **ভৌত ধর্মঃ** অঙ্গার বা চারকোল দেখতে কালো, নরম ও ছিদ্রযুক্ত পদার্থ। এই ছিদ্রগুলির মধ্যে বাতাস ভর্তি থাকে বলে চারকোল জলে ভাসে, যদিও চারকোল জলের চেয়ে ভারী। চারকোল তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে না।

(B) **রাসায়নিক ধর্মঃ** (i) **ক্ষারের সঙ্গে** চারকোলের কোন বিক্রিয়া হয় না।

(ii) জ্বলন্ত অবস্থায় চারকোলের সঙ্গে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় চারকোল জারিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে।

(iii) **বাতাসে বা অক্সিজেনের মধ্যে চারকোল জ্বালালে,** কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। কম বাতাসের মধ্যে চারকোল পোড়ালে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন করে।

$$C + O_2 = CO_2 \text{ (কার্বন ডাই-অক্সাইড)}$$
$$2C + O_2 = 2CO \text{ (কার্বন মনোক্সাইড)}$$

(iv) **চারকোলের বিজারণ ক্ষমতা আছে।** উচ্চ উষ্ণতায় ধাতুর অক্সাইডকে বিজারিত করে ধাতু উৎপন্ন করে। যেমন, কালো কপার অক্সাইডের সঙ্গে চারকোল মিশিয়ে উচ্চ উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে কপার অক্সাইড বিজারিত হয়ে লাল রঙের ধাতব কপার উৎপন্ন করে।

$$CuO + C = Cu + CO$$

(v) **শ্বেত-তপ্ত চারকোলের উপর দিয়ে স্টীম চালনা করলে জল** বিজারিত হয়ে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে ও কার্বন জারিত হয়ে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন করে। **এই গ্যাস মিশ্রণকে ওয়াটার গ্যাস বলে।**

$$C + H_2O = CO + H_2$$

(vi) **অধিশোষণঃ** চারকোলের মধ্যে অনেক ছিদ্র থাকায়, **দ্রবণের দ্রাবকে গ্যাস ও চারকোল অধিক শোষণ করতে পারে।** এইসব পদার্থ চারকোলের উন্মুক্ত তলেই আটকে থাকে—ভেতরে প্রবেশ করে না। তাই এই ঘটনাকে শোষণ না বলে **অধিশোষণ** বলা হয়। তাপ দিলে চারকোলে অধিশোষিত গ্যাস বেরিয়ে যায়।

• **সক্রিয় চারকোলঃ** জিঙ্ক ক্লোরাইড **দ্রবণে সিক্ত** নারকেলের খোলকে **বাতাসের** অবর্তমানে উত্তপ্ত করলে অবশেষরূপে যে চারকোল পাওয়া যায়, তাকে **সক্রিয় চারকোল** বলে। সক্রিয় চারকোলের **গ্যাস শোষণ করার ক্ষমতা খুব বেশী।** শুধু গ্যাস শোষণ করা নয়, সক্রিয় চারকোল **বিরঞ্জন করতে** পারে ও জিনিসের **স্বাদহরণ** করতে পারে।

পরীক্ষা 1ঃ **সক্রিয় চারকোলের বিরঞ্জন ধর্মঃ** একটি বীকারের জলে লাল লিটমাস মেশানো হল। দেখা গেল, জলের রঙ লাল হয়ে

গেল। এইবার বীকারের মধ্যে কিছু সক্রিয় চারকোল মিশিয়ে ভাল করে ঝাঁকিয়ে মিশ্রণটিকে ফিল্টার করা হল। দেখা গেল, পরিস্রুতরূপে যে জল পাওয়া যায়, সেই জল বর্ণহীন হয়ে গেছে।

পরীক্ষা 2ঃ সক্রিয় চারকোলের স্বাদহরণ ক্ষমতাঃ একটি বীকারে একটু জলের মধ্যে কুইনিন মিশিয়ে স্বাদ নিয়ে দেখা গেল জলের স্বাদ কি ভীষণ তেতো। এইবার বীকারের মধ্যে সক্রিয় চারকোল মিশিয়ে ঝাঁকিয়ে কিছুক্ষণ রেখে ফিল্টার করা হল। এইবার পরিস্রুতরূপে যে জল পাওয়া গেল তার স্বাদ নিয়ে দেখা গেল এতটুকু তেতো স্বাদ নেই।

পরীক্ষা 3ঃ কাঠকয়লা বা সক্রিয় চারকোলের গ্যাস শোষণ করার ক্ষমতাঃ

একমুখ খোলা একটি নলে অ্যামোনিয়া গ্যাস ভর্তি করে নলটিকে একটি পারদপূর্ণ পাত্রের উপর উপুড় করে রাখা হল। এইবার একটি সক্রিয় চারকোলকে উত্তপ্ত করে ঠান্ডা করার পর নলটির ভেতরে পারদের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করানো হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল যে, পারদ, নলটির মধ্যে উঠে প্রায় সবটা ভর্তি করে দিল। এর কারণ হল এই যে, সক্রিয় চারকোল অ্যামোনিয়া গ্যাসকে শোষণ করে নলের মধ্যে শূন্যতার সৃষ্টি করে, ফলে পারদ এই শূন্য-স্থান পূর্ণ করে দেয়।



ব্যবহারঃ কাঠকয়লা (i) জ্বালানিরূপে, (ii) ধাতুবিদ্যায় বিজারক-রূপে, ফিল্টার বেড প্রস্তুতে, (iii) বারুদ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয় ও (iv) সক্রিয় চারকোল গ্যাসমুখোশ ও ওষুধ তৈরি করার কাজে লাগে।

(b) **প্রাণিজ অঙ্গারঃ** (i) **অস্থি কয়লা** ও (ii) **রক্ত কয়লা**।

• **অস্থি কয়লাঃ** প্রাণীর হাড়কে পরিষ্কার এবং চর্বিমুক্ত করে, গুঁড়া হাড়কে বাতাসের অবর্তমানে উত্তপ্ত করলে উদ্বায়ী পদার্থগুলি বেরিয়ে গেলে পর অবশেষরূপে যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাকে **অস্থি কয়লা** বলে। এর মধ্যে 10 ভাগ কার্বন এবং 90 ভাগ ক্যালসিয়াম ফসফেট থাকে।

• **রক্ত কয়লাঃ** একই প্রণালীতে রক্তকে বায়ুর অবর্তমানে উত্তপ্ত করলে অবশেষরূপে রক্ত কয়লা পাওয়া যায়। রক্ত কয়লা খুব বিশুদ্ধ প্রাণিজ অঙ্গার।

ব্যবহারঃ চিনি শোধনে এবং কালো রং প্রস্তুতিতে প্রাণিজ কয়লা ব্যবহৃত হয়। রক্ত কয়লা গবেষণার কাজে লাগে।

4.5 ভুসাকালি বা ঝুল

কেরোসিন, পেট্রল, বেঞ্জিন, তারপিন প্রভৃতি কতকগুলি কার্বন এবং হাইড্রোজেন ঘটিত যৌগের মধ্যে কার্বনের পরিমাণ খুব বেশী থাকে। এইসব পদার্থকে নিয়ন্ত্রিত বাতাসের মধ্যে পোড়ালে কালো ধোঁয়া উৎপন্ন হয়। এই কালো ধোঁয়াকে ভিজা কম্বলের সংস্পর্শে আনলে সূক্ষ্ম চূর্ণের আকারে ভুসাকালি জমা হয়।

ধর্মঃ রঙ কালো, অনিয়তাকার। তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে না।

ব্যবহারঃ ছাপার কালি, জুতার কালি, জাপান ব্ল্যাক নামে কালো রঙ ও পালিশ তৈরি করার কাজে লাগে।

4.6 কোক

মাটির নিচে খনির মধ্যে কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লার মধ্যে কার্বন ছাড়া আরো কতকগুলি জৈব পদার্থ মেশানো থাকে। যে কয়লার মধ্যে 96% কার্বন থাকে, তাকে **অ্যানথ্রাসাইট কয়লা** বলে। বায়ু-নিরুদ্ধ পাত্রের মধ্যে কয়লা নিয়ে বায়ুর অবর্তমানে উত্তপ্ত করলে কয়লার মধ্যে যে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থগুলি থাকে, সেগুলি পাতিত হয়ে চলে যায়। অবশেষরূপে পড়ে থাকে কোক।

ব্যবহারঃ (i) রান্নার কাজে জ্বালানিরূপে, (ii) ধাতু নিষ্কাশনে **বিজারকরূপে** প্রচুর পরিমাণে কোক ব্যবহার করা হয়। (iii) **প্রডিউসার গ্যাস, ওয়াটার গ্যাস** নামে কৃত্রিম জ্বালানি তৈরি করার কাজে কোক ব্যবহৃত হয়।

4.7 গ্যাস কার্বন

বায়ুবদ্ধ পাত্রে কোক তৈরি করার সময় পাত্রের দেওয়ালে কার্বনের সূক্ষ্ম চূর্ণ জমা হয়। একেই **গ্যাস কার্বন** বলে। **গ্যাস কার্বন তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে।**

ব্যবহারঃ (i) ব্যাটারি প্রস্তুতিতে, (ii) আর্ক আলো তৈরি করতে, (iii) ডায়নামো, বৈদ্যুতিক মোটরের ব্রাশ প্রস্তুতিতে গ্যাস কার্বন ব্যবহৃত হয়।

কার্বন ডাই-অক্সাইড (Carbon dioxide)

সংকেত—CO_2 আণবিক গুরুত্ব—44

বাতাসের একটি উপাদান হল কার্বন ডাই-অক্সাইড। বাতাসের আয়তনের শতকরা 0·04 ভাগ হল কার্বন-ডাই-অক্সাইড। কতকগুলি ঝরনার জলে কার্বন ডাই-অক্সাইড মেশানো থাকে। কখনো কখনো এই গ্যাসকে মাটির মধ্য থেকে বেরোতে দেখা যায়। জাভায় **মৃত্যু-উপত্যকা** নামে এক উপত্যকায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেরোয়, ফলে, সমস্ত উপত্যকাটি এই গ্যাসে ভর্তি হয়ে থাকায় কোন প্রাণী সেখানে বেঁচে থাকতে পারে না। এছাড়া প্রকৃতিতে যে চুনাপাথর, মার্বেল প্রভৃতি পাওয়া যায়, তার মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড চুনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে।

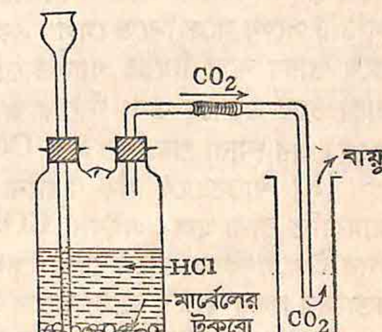
● **পরীক্ষাগার প্রস্তুতিঃ** (A) **প্রয়োজনীয় বিকারকঃ** (i) মার্বেল অর্থাৎ ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$)। (ii) লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)।

(B) **নীতিঃ** সাধারণ তাপমাত্রায় কোন **কার্বনেট লবণের সঙ্গে লঘু অ্যাসিডের** বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। পরীক্ষাগারে **মার্বেলের সঙ্গে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া দ্বারা কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করা হয়।**

$$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$$

$CaCO_3$	+ 2HCl	= $CaCl_2$	+ CO_2	+ H_2O
মার্বেল বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট	লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড	কার্বন ডাই-অক্সাইড	জল

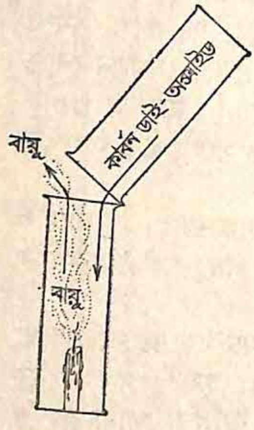
(C) **পদ্ধতিঃ** একটি উলফ্ বোতলের মধ্যে ছোট ছোট মার্বেলের টুকরা নিয়ে ওর একটি মুখে কর্কের মধ্য দিয়ে একটি দীর্ঘনল ফানেল লাগানো হল ও অন্য মুখটিতে কর্কের মধ্য দিয়ে একটি নির্গম-নল লাগানো হল। দীর্ঘনল ফানেলের শেষ প্রান্তটি যেন বোতলের তলদেশের কাছাকাছি পৌঁছায়। নির্গম-নলের শেষ প্রান্তটিকে খাড়া করা একটি শুষ্ক গ্যাসজারের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হল। এইবার দীর্ঘনল



ফানেলের মধ্য দিয়ে উলফ্ বোতলের মধ্যে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢালা হল। লক্ষ্য রাখা হল, মার্বেলের টুকরাগুলি এবং দীর্ঘনল

ফানেলের শেষ প্রান্তটি যেন অ্যাসিডের মধ্যে ডুবে থাকে। অ্যাসিড, মার্বেলের সংস্পর্শে এলেই বুদ্‌বুদের আকারে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেরোতে শুরু করে এবং নির্গম-নল দিয়ে বেরিয়ে যায়।

(D) **সংগ্রহ**ঃ এই গ্যাস বাতাসের চেয়ে প্রায় দেড় **গুণ ভারী** এবং জলে দ্রাব্য, তাই গ্যাসজারের মধ্যে **বাতাসের ঊর্ধ্ব অপসারণ দ্বারা কার্বন ডাই-অক্সাইড জমা হয়।**



CO_2 বাতাসের চেয়ে ভারী—পরীক্ষা।

(E) **বিশুদ্ধিকরণ**ঃ এইভাবে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায়, তার মধ্যে সামান্য **হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বাষ্প,** আর **জলীয় বাষ্প** মেশানো থাকে। উৎপন্ন গ্যাসটিকে **সোডিয়াম বাই-কার্বনেট** দ্রবণের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করালে HCl বাষ্প শোষিত হয়। তারপর গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করিয়ে জলীয় বাষ্প মুক্ত করে পারদের উপর সংগ্রহ করা হয়।

ধর্মঃ (A) **ভৌত ধর্ম**ঃ (1) কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্ণহীন, সামান্য **অম্লস্বাদযুক্ত, গন্ধহীন গ্যাস।**

(2) কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসের চেয়ে দেড়গুণ ভারী।

পরীক্ষাঃ (i) একটি CO_2-পূর্ণ গ্যাসজারকে, বাতাস-ভর্তি এবং খাড়াভাবে দাঁড় করানো অন্য একটি গ্যসজারের উপর উপুড় করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর উপরের গ্যাসজারটি তুলে নিয়ে, একটি জ্বলন্ত পাটকাঠি নিচের গ্যাসজারের মধ্যে ধরা হল, দেখা গেল, পাট-কাঠিটি সঙেগ সঙ্গে নিভে গেল। এর কারণ উপরের জারের CO_2 বাতাসের চেয়ে ভারী বলে নিচের গ্যাসজারের বাতাসকে অপসারিত করে নিচের জারে চলে এসেছে এবং নিচের জারের বাতাস উপরের গ্যাসজারে চলে গেছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, CO_2 বাতাসের চেয়ে ভারী।

(ii) খাড়াভাবে দাঁড় করানো একটি পাত্রের মধ্যে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি রাখা হল। এইবার CO_2-পূর্ণ একটি গ্যাসজারকে ঐ পাত্রের উপর উপুড় করে ধরলে দেখা গেল, মোমবাতিটি নিভে গেল। CO_2 বাতাসের চেয়ে ভারী, তাই পাত্রের বাতাসকে সরিয়ে ঐ পাত্রে CO_2 ভরে যায়, ফলে মোমবাতিটি নিভে যায়।

(3) **কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রাব্য।** চাপ প্রয়োগ করলে দ্রাব্যতা আরও বাড়ে। এই ধর্ম কাজে লাগিয়ে লেমোনেড, সোডা ওয়াটার তৈরি হয়।

(4) **কার্বন ডাই-অক্সাইড নিজে জ্বলে না বা অপরকে জ্বলতে সাহায্য করে না।**

পরীক্ষাঃ কার্বন ডাই-অক্সাইডপূর্ণ একটি গ্যাসজারের মধ্যে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি ধীরে ধীরে নামিয়ে দেওয়া হল ; দেখা গেল, মোমবাতিটি নিভে গেল। এতে প্রমাণিত হয়, CO_2 জ্বলে না বা জ্বলতে সাহায্য করে না।

(5) **শুষ্ক বরফঃ** একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতার চেয়ে কম উষ্ণতায় চাপ প্রয়োগ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে তরলে পরিণত করা যায়। এই তরল কার্বন ডাই-অক্সাইডকে খোলা বাতাসের মধ্যে দ্রুত বাষ্পীভূত হতে দিলে ওর উষ্ণতা অনেক কমে যায়। তখন অবশিষ্ট তরল কার্বন ডাই-অক্সাইড জমে বরফে পরিণত হয়। একেই **ড্রাই-আইস বা শুষ্ক-বরফ** বলে।

(6) কার্বন ডাই-অক্সাইড শ্বাসকার্যে সাহায্য করে না। জাভার মৃত্যু-উপত্যকায় CO_2 ভর্তি থাকে, তাই ওখানে কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না।

(B) **রাসায়নিক ধর্মঃ** (1) **কার্বন ডাই-অক্সাইড একটি আম্লিক অক্সাইড**—জলে দ্রবীভূত হয়ে **কার্বনিক অ্যাসিড** উৎপন্ন করে। সেইজন্য কার্বন ডাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ নীল **লিটমাসকে লাল** করে দেয়।

$$CO_2 + H_2O = H_2CO_3$$

কার্বন ডাই-অক্সাইড   জল   কার্বনিক অ্যাসিড

[**সোডাওয়াটার এবং লেমোনেডঃ** সোডাওয়াটার হল CO_2-এর জলীয় দ্রবণ। খুব বেশী চাপ দিয়ে জলের মধ্যে বেশী পরিমাণ CO_2কে দ্রবীভূত করে সোডাজল তৈরি করা হয়। লেমোনেড হল রঙীন মিষ্টি জলে চাপ প্রয়োগে বেশী পরিমাণে দ্রবীভূত CO_2-এর জলীয় দ্রবণ।]

(2) **স্বচ্ছ চুনজলের মধ্য দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড অতিক্রম করালে অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয় ;** এর ফলে স্বচ্ছ চুনজল ঘোলা হয়ে যায়। এই ঘোলা চুনজলের মধ্য দিয়ে আরো কার্বন ডাই-অক্সাইড চালনা করলে জলে দ্রাব্য **ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট** উৎপন্ন হয়, ফলে ঘোলা চুনজল আবার স্বচ্ছ হয়ে যায়।

$$Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3\downarrow + H_2O$$

চুনজল   ক্যালসিয়াম কার্বনেট জলে অদ্রাব্য

$$CaCO_3 + CO_2 + H_2O = Ca(HCO_3)_2$$

ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট জলে দ্রাব্য

(3) **জারণ ধর্ম :** জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়াম ফিতাকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ভর্তি গ্যাসজারের মধ্যে ঢোকালে ফিতাটি জ্বলতে থাকবে। ম্যাগনেসিয়াম জারিত হয়ে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডে পরিণত হয় এবং CO_2 বিজারিত হয়ে কার্বন উৎপন্ন করে।

$$\underset{\text{ম্যাগনেসিয়াম}}{2Mg} + \underset{\text{কার্বন ডাই-অক্সাইড}}{CO_2} = \underset{\text{কার্বন}}{C} + \underset{\text{ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড}}{2MgO}$$

- **এই বিক্রিয়া প্রমাণ করে যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে কার্বন আছে।**

(4) **শ্বেত-তপ্ত কোকের উপর দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস** চালনা করলে বিজারিত হয়ে কার্বন মনোক্সাইড (CO) উৎপন্ন হয়।

$$C + CO_2 = \underset{\text{কার্বন মনোক্সাইড}}{2CO}$$

(5) **কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, কস্টিক সোডা (NaOH) বা কস্টিক পটাশ (KOH) দ্বারা শোষিত হয়ে কার্বনেট লবণ উৎপন্ন করে।**

$$\underset{\text{কস্টিক সোডা}}{2NaOH} + CO_2 = \underset{\text{সোডিয়াম কার্বনেট}}{Na_2CO_3} + H_2O$$

$$2KOH + CO_2 = K_2CO_3 + H_2O$$

ব্যবহার : (i) বাতাসের চেয়ে প্রায় দেড় গুণ ভারী এবং জ্বলতে সাহায্য করে না বলে CO_2 গ্যাস আগুন নেভানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। (ii) সোডা ওয়াটার, লেমোনেড, সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুতিতে CO_2 ব্যবহৃত হয়। (iii) শুষ্ক বরফ ও তরল কার্বন ডাই-অক্সাইড হিমায়ক-রূপে ব্যবহৃত হয়।

4.8 কার্বন যৌগ বিভিন্ন রূপে প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

কার্বন একটি মজার মৌল—বহুরূপীর মত এক এক জায়গায় এক এক রূপ নিয়ে কার্বন আমাদের সামনে অবস্থান করে। এর রূপভেদ অনেক—কখনো উজ্জ্বল হীরক, কখনো কালো কয়লা, আবার কখনো পিচ্ছিল গ্রাফাইটরূপে কার্বনকে আমরা দেখতে পাই। প্রকৃতির মধ্যে কার্বন, হয় মৌলরূপে কিংবা যৌগরূপে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। শুধু পৃথিবীতে নয়—কয়েকটি গ্রহের মধ্যে কার্বনের অস্তিত্বের প্রমাণ

পাওয়া গেছে। পৃথিবীতে যত যৌগ আছে তার প্রায় 80% হল কার্বন যৌগ। পৃথিবীতে কার্বন যৌগের সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশী। প্রাণী এবং উদ্ভিদের মূল উপাদান হল কার্বন।

I. **মুক্ত অবস্থায় কার্বনের অবস্থানঃ** মুক্ত অবস্থায় বিভিন্ন রূপভেদের মধ্যে কার্বনকে হীরক, গ্রাফাইট ও পাথুরে কয়লা প্রভৃতির আকারে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়।

II. **অন্যান্য মৌলের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়ঃ** (i) প্রাণী আর উদ্ভিদ-দেহের প্রধান উপাদান হল কার্বন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন্ত কোষে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, সেলুলোজ প্রভৃতি জৈব পদার্থের মধ্যে কার্বন থাকে।

(ii) কার্বনকে আবার **হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় হাইড্রোকার্বন যৌগ রূপে পেট্রোলিয়াম, মার্স গ্যাস, প্রাকৃতিক গ্যাসের** মধ্যে পাওয়া যায়। আমরা জ্বালানি হিসাবে যে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ইত্যাদি ব্যবহার করি তাদের মধ্যেও কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকে।

(iii) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বোহাইড্রেট যৌগরূপে **চিনি, গ্লুকোজ, স্টার্চ**, চাল, গম, ভুট্টা প্রভৃতির মধ্যে কার্বন বর্তমান থাকে।

(iv) প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন আকরিক, যেমন—**চুনাপাথর, মার্বেল, ডলোমাইট, ম্যাগনেসাইট** প্রভৃতির মধ্যে কার্বন অবস্থান করে।

(v) **বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড** গ্যাসের মধ্যে কার্বন থাকে।

(vi) **তেল** এবং **চর্বিজাতীয়** পদার্থের মধ্যেও কার্বন আছে।

(vii) প্রাণী ও উদ্ভিদের খাবার প্রোটিনের মধ্যে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের সঙ্গে কার্বন মিশে থাকে।

(viii) আমরা যে পোশাক পরি তার উপাদান, যে সব আসবাবপত্র ব্যবহার করি তারও উপাদান হল কার্বন। আবার রেশম, পশম, পাট এগুলিও কার্বন যৌগ। বর্তমান পলিথিন, নাইলন, টেরিলিনের ব্যবহার প্রচুর, এই সবই হল কার্বন যৌগ।

(ix) আমরা যা খাই অর্থাৎ চাল, ডাল, গম, চিনি, তেল, দুধ, শাকসবজি, মাছ, মাংস ইত্যাদি সবার মধ্যেই রয়েছে কার্বন।

(x) নানা রকম প্রাণদায়ী ওষুধের বেশীর ভাগই জৈব যৌগ। কার্বন যৌগের সংখ্যা অজস্র—প্রায় দশ লক্ষেরও বেশী।

এই বিরাট সংখ্যক কার্বন যৌগের সৃষ্টির কারণ হল এই যে, একাধিক কার্বন পরমাণু নিজেদের মধ্যে পরস্পর যুক্ত হয়ে সুস্থিত যৌগ উৎপন্ন করতে পারে। কার্বনের এই ধর্মকে ক্যাটিনেশন ধর্ম বলে।

প্রশ্নাবলী

[A] **জ্ঞানমূলক ঃ**

(i) কার্বন ধাতু না অধাতু ?
(ii) বহুরূপতা কাকে বলে ? বহুরূপতার কারণ কি ?
(iii) নিয়তাকার এবং অনিয়তাকার কার্বনের নাম কর।
(iv) সক্রিয় চারকোল কাকে বলে ? এর ব্যবহার কি ?
(v) হীরক কি ? এর ঘনত্ব কত ?
(vi) কার্বনের কোন্ রূপটি কঠিনতম পদার্থ ?
(vii) কৃত্রিম উপায়ে গ্রাফাইট প্রস্তুত করার প্রণালী বর্ণনা কর।
(viii) শর্করা চারকোলের প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা কর।
(ix) ভূসাকালির ব্যবহার লেখ।
(x) কার্বন ডাই-অক্সাইড কি জাতীয় অক্সাইড ?
(xi) CO_2 বাতাসের চেয়ে ভারী না হালকা ? CO_2 কোন্ পদার্থ দ্বারা শোষিত হয় ?
(xii) শুষ্ক বরফ কি ? কি কাজে এটি ব্যবহৃত হয় ?
(xiii) কৃত্রিম উপায়ে হীরক কে সর্বপ্রথম প্রস্তুত করেন ? তাঁর হীরক প্রস্তুতির পদ্ধতিটি বর্ণনা কর।
(xiv) গ্রাফাইট কি ? এর ব্যবহার লেখ।
(xv) সক্রিয় চারকোল এবং কোক কিভাবে প্রস্তুত করা হয় ? কোক এবং গ্যাসকার্বনের ব্যবহার লেখ।
(xvi) প্রকৃতির মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড কিভাবে অবস্থান করে ?
(xvii) অনিয়তাকার কার্বন কি কি ? কিভাবে এদের পাওয়া যায় ?
(xviii) কিভাবে কার্বন যৌগ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে বুঝিয়ে দাও।
(xix) পরীক্ষাগারে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুতিতে কি কি বিকারকের প্রয়োজন হয় ? সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়াটির সমীকরণ দাও।
(xx) কার্বন ডাই-অক্সাইডের তিনটি ভৌত এবং তিনটি রাসায়নিক ধর্ম বর্ণনা কর।
(xxi) অন্তর্ধূম পাতন কাকে বলে ?
(xxii) কয়লার অন্তর্ধূম পাতন করলে কি কি পদার্থ পাওয়া যায় ?
(xxiii) আগুন নেভানোর জন্য কোন্ গ্যাস ব্যবহার করা হয় ?

[B] **বোধমূলক ঃ**

(i) হীরক এবং গ্রাফাইটের ধর্মের তুলনা কর।
(ii) অনিয়াতাকার কার্বনের উদাহরণ দাও।
(iii) একটি নরম এবং পিচ্ছিল কার্বনের রূপভেদের নাম লেখ।
(iv) কার্বনের বিজারক ধর্মের উদাহরণ দাও।

(v) কার্বনের কোন্ রূপভেদ তড়িৎ পরিবাহী এবং তড়িৎদ্বার প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয় ?
(vi) কার্বনের কোন্ রূপভেদ জুতার কালি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয় ?
(vii) চারকোলের ঘনত্ব জলের চেয়ে বেশী তবে চারকোল জলে ভাসে কি করে ?
(viii) কার্বন ডাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল করে কেন ?
(ix) কাচ এবং হীরকের মধ্যে পার্থক্য বুঝবে কি করে ?
(x) হীরকে আলো পড়লে জ্বল জ্বল করে কেন ?
(xi) কার্বনের কোন্ রূপ পেন্সিলের সীস্ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয় ?
(xii) কার্বনের কোন্ রূপের স্বাদহরণ ক্ষমতা আছে ?
(xiii) একটি টেস্ট-টিউবে স্বচ্ছ চুনজলের মধ্যে CO_2 চালনা করলে ঘোলা হয়ে যায় কেন ?
(xiv) চিনির সঙ্গে গাঢ় H_2SO_4 যোগ করলে কালো হয়ে যায় কেন ?
(xv) CO_2 গ্যাসপূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে একটি ইঁদুর রাখলে মরে যায় কেন ?
(xvi) CO_2 গ্যাসের মধ্যে জ্বলন্ত পাটকাঠি প্রবেশ করালে নিভে যায় কেন ?
(xvii) CO_2-এর জারণ ধর্মের উদাহরণ দাও।
(xviii) সোডা ওয়াটারের বোতলের মুখ খুললে বুদ্‌বুদ ওঠে কেন ?

[C] প্রয়োগমূলক ঃ

(i) প্রমাণ কর যে কার্বনের বিভিন্ন রূপভেদগুলি আসলে একই মৌল।
(ii) কৃত্রিম হীরক প্রস্তুতির পদ্ধতিটি বর্ণনা কর।
(iii) একটি বিক্রিয়া দ্বারা দেখাও যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে কার্বন আছে।
(iv) CO_2 গ্যাসের মধ্যে জ্বলন্ত পাটকাঠি নিভে যায়—নাইট্রোজেন গ্যাসের মধ্যেও নিভে যায়, তাহলে কি করে বুঝবে কোন্‌টি CO_2 এবং কোন্‌টি নাইট্রোজেন ?
(v) নিচের বিক্রিয়াগুলিতে কি ঘটে—
  (a) কপার অক্সাইড এবং কোকের মিশ্রণকে উত্তপ্ত করা হল।
  (b) মার্বেলে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করা হল।
  (c) স্বচ্ছ চুন জলের মধ্যে CO_2 গ্যাস চালনা করা হল।
  (d) জ্বলন্ত কার্বনকে অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাস জারের মধ্যে প্রবেশ করানো হল।
  (e) CO_2 গ্যাসকে জলে দ্রবীভূত করা হল।
  (f) জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়ামকে CO_2-পূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে প্রবেশ করানো হল।
(vi) কি করে প্রমাণ করবে যে CO_2 গ্যাস বাতাসের চেয়ে ভারী ?
(vii) প্রমাণ কর যে চিনির মধ্যে কার্বন আছে।
(viii) প্রমাণ কর CO_2 গ্যাস জলে দ্রাব্য।
(ix) প্রমাণ কর যে CO_2 নিজে দাহ্য নয় এবং অপরকে জ্বলতে সাহায্য করে না।
(x) লেড অক্সাইড এবং চারকোলের মিশ্রণকে উত্তপ্ত করলে কি হবে ?

(xi) পরীক্ষাগারে CO_2 প্রস্তুত করার সময় উৎপন্ন CO_2কে জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয় না কেন ?

(xii) CO_2কে আম্লিক অক্সাইড বলা হয় কেন ?

(xiii) $2Mg+CO_2=2MgO+C$—এই বিক্রিয়া থেকে CO_2 সম্বন্ধে কি কি জানা যেতে পারে ?

(xiv) CO_2 যে জারক হিসাবে কাজ করে তার প্রমাণ দাও।

[D] **দক্ষতামূলক :**

(i) চিত্রসহ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর যে সক্রিয় চারকোলের গ্যাস শোষণ করার ক্ষমতা আছে।

(iii) কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত করার পরীক্ষাগার পদ্ধতিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির একটি চিত্র অঙ্কন কর।

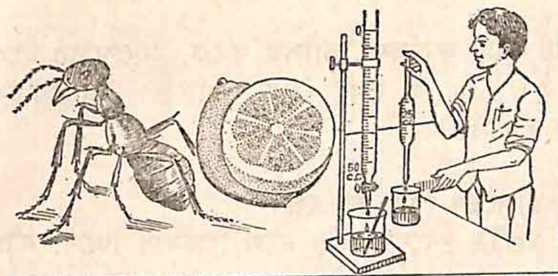
Objective type Questions :

1. **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(i) লেড পেনসিলের সীস — দিয়ে তৈরি। (ii) তরল কার্বন ডাই-অক্সাইডকে আরো ঠাণ্ডা করলে — তৈরি হয়। (iii) হীরক — একটি রূপভেদ। (iv) গ্রাফাইটকে অক্সিজেনের মধ্যে উচ্চ উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে — গ্যাস উৎপন্ন হয়। (v) ব্যাটারি প্রস্তুতিতে — ব্যবহৃত হয়। (vi) এক্স-রশ্মির মধ্যে হীরক — এবং কাচ —। (vii) CO_2 জলে দ্রবীভূত হয়ে — অ্যাসিড উৎপন্ন করে। (viii) কার্বন ছাড়া — এবং — মৌলের বহুরূপতা দেখা যায়। (ix) কাঠের অন্তর্ধূম পাতন করলে অবশেষ রূপে — পাওয়া যায়। (x) শুকনো বরফ —হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

2. **সঠিক উত্তরে টিক '(✓)' চিহ্ন দাও :**

(i) গ্রাফাইট—কেলাসিত/অনিয়তাকার পদার্থ। (ii) তড়িৎ-দ্বাররূপে ব্যবহৃত—গ্যাস কার্বন/চারকোল। (iii) কার্বন ডাই-অক্সাইড জ্বলতে সাহায্য করে/করে না। (iv) কোক তৈরি করা হয়—কয়লা/চারকোল থেকে। (v) ছাপাখানার কালি প্রস্তুতিতে—ভূসাকালি/গ্যাস কার্বন ব্যবহৃত হয়। (vi) শুষ্ক বরফ তৈরি করা হয়—কার্বন ডাই-অক্সাইডে জল মিশিয়ে/কার্বন ডাই-অক্সাইডকে ঠাণ্ডা করে। (vii) কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসের চেয়ে—হাল্কা/ভারী। (viii) কাচ কাটার জন্য হীরক দরকার/গ্রাফাইট দরকার। (ix) লেমোনেডের ছিপি খুললে বেরিয়ে আসে অক্সিজেন/কার্বন ডাই-অক্সাইড।



পঞ্চম অধ্যায়

(A) অ্যাসিড
(B) ক্ষারক
(C) ক্ষার

5.1 অ্যাসিড

স্তব্ধ দুপুর—বাড়ীর সবাই ঘুমুচ্ছে। এই সুযোগে বাড়ী থেকে পালিয়ে পুকুরঘাটের তেঁতুল গাছ থেকে পাকা তেঁতুল পেড়ে নুন-লঙ্কা মেখে সবাই মিলে বসে খাওয়ার মত আমেজের তুলনা নেই। গ্রীষ্মের দুপুরে বাবার সঙ্গে শহর থেকে বেড়িয়ে বাড়ীতে ফিরলে মা যখন লেবুর শরবত করে এনে দেন, খেয়ে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। নেমন্তন্ন বাড়ীতে দই না হলে তো চলেই না। তেঁতুল, লেবু, দই সবগুলির মধ্যে অ্যাসিডজাতীয় পদার্থ আছে—সেইজন্য এইগুলির স্বাদ টক।

● **সংজ্ঞাঃ হাইড্রোজেন যুক্ত যে যৌগের অণুর মধ্যে এক বা একাধিক প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে, যা সম্পূর্ণ বা আংশিক-ভাবে ধাতুর পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে লবণ উৎপন্ন করে এবং যে যৌগ ক্ষারকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে তাকে অ্যাসিড বলে।**

● **অ্যাসিডের শ্রেণীবিভাগঃ** অ্যাসিড মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; যেমন—

(i) **অজৈব অ্যাসিড এবং** (ii) **জৈব অ্যাসিড।**

(i) **অজৈব অ্যাসিডঃ যে সব অ্যাসিড অজৈব পদার্থ থেকে তৈরি হয়, সেগুলিকে অজৈব অ্যাসিড বলে।** যেমন—(a) সালফার থেকে **সালফিউরিক অ্যাসিড,** (b) নাইটার লবণ থেকে **নাইট্রিক অ্যাসিড,** (c) ক্লোরাইড লবণ থেকে **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড** উৎপন্ন হয়। সালফার, নাইটার, ক্লোরাইড প্রভৃতি খনি থেকে পাওয়া যায় বলে, এই জাতীয় অ্যাসিডকে **খনিজ অ্যাসিডও** বলে।

(ii) **জৈব অ্যাসিডঃ কার্বন পরমাণুযুক্ত অ্যাসিড, যাদের উৎস হল প্রাণী বা উদ্ভিদ, তাদের জৈব অ্যাসিড বলে।** যেমন—লেবু, তেঁতুল, দই প্রভৃতি জৈব পদার্থ। (a) লেবু থেকে **সাইট্রিক অ্যাসিড,** (b) তেঁতুল থেকে **টার্টারিক অ্যাসিড,** (c) দই থেকে **ল্যাক্টিক অ্যাসিড** উৎপন্ন

হয়। পিঁপড়ের হুলের মধ্যে **ফরমিক অ্যাসিড** থাকে, আপেলের মধ্যে **ম্যালিক অ্যাসিড** থাকে। এগুলি সবই জৈব অ্যাসিড। **অ্যাসেটিক অ্যাসিডও** একটি জৈব অ্যাসিড।

অ্যাসিডের ধর্ম ঃ

(1) **যে-কোন অ্যাসিডের স্বাদ টক হয়।**

(2) অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণের মধ্যে নীল লিটমাস দিলে, **নীল লিটমাসের রঙ লাল হয়ে যায়।**

পরীক্ষা ঃ একটি টেস্ট-টিউবে জল নিয়ে ঐ জলের সঙ্গে 2 ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে স্বাদ নিলে দেখা যায় দ্রবণটির স্বাদ টক। এইবার ঐ দ্রবণটির মধ্যে নীল লিটমাস দিলে দেখা যায় দ্রবণটি লাল হয়ে যায়।

(3) **অ্যাসিডের সঙ্গে ক্ষারের বিক্রিয়ায় লবণ ও জল উৎপন্ন হয়।** যেমন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের (ক্ষার) বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ ও জল উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{অ্যাসিড}}{HCl} + \underset{\text{ক্ষার}}{NaOH} = \underset{\text{লবণ}}{NaCl} + \underset{\text{জল}}{H_2O}$$

(4) **ক্ষারকীয় অক্সাইডের** (CaO, MgO, Na_2O প্রভৃতি) **সঙ্গে** অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় লবণ ও জল উৎপন্ন হয়। যেমন, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ও জল উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{ক্ষারকীয় অক্সাইড}}{MgO} + \underset{\text{অ্যাসিড}}{H_2SO_4} = \underset{\text{লবণ}}{MgSO_4} + \underset{\text{জল}}{H_2O}$$

(5) **কার্বনেট বা বাই-কার্বনেট লবণ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়।** কার্বনেট বা বাই-কার্বনেট লবণ অ্যাসিডে যোগ করলে বুদ্‌বুদ সহ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হতে থাকে এবং বিক্রিয়ায় লবণ উৎপন্ন হয়।

$$2HCl + Na_2CO_3 = 2NaCl + CO_2\uparrow + H_2O$$

• অ্যাসিডের এই ধর্মকে অ্যাসিডের সনাক্তকরণে কাজে লাগানো হয়। একটি তরল—অ্যাসিড কিনা জানতে হলে একটি টেস্ট-টিউবে তরলটি নিয়ে ওর সঙ্গে সামান্য খাবার সোডা অর্থাৎ সোডিয়াম বাই-কার্বনেট যোগ করলে যদি বুদ্‌বুদ সৃষ্টি করে গ্যাস নির্গত হয় তাহলে বুঝতে হবে তরলটি অ্যাসিড।

$$HCl + NaHCO_3 = NaCl + CO_2\uparrow + H_2O$$

(6) ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক, লোহা, টিন প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে অ্যাসিডের **বিক্রিয়ায় অ্যাসিডের প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন, ধাতুর**

পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে লবণ উৎপন্ন করে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হয়। যেমন, লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে জিঙ্কের বিক্রিয়ায় জিঙ্ক সালফেট ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$$
$$Mg + 2HCl = MgCl_2 + H_2$$

লঘু অ্যাসিডের মধ্যে জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন প্রভৃতি ধাতু যোগ করলে অ্যাসিডের হাইড্রোজেন পরমাণু ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। এটা নিচের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়।

পরীক্ষাঃ একটি টেস্ট-টিউবের মধ্যে কয়েক টুকরো জিঙ্ক বা লোহার গুঁড়া নিয়ে জল মেশানো সালফিউরিক অ্যাসিড দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল গ্যাসের বুদ্‌বুদ বের হচ্ছে। একটু অপেক্ষা করার পর টেস্ট-টিউবের মুখে জ্বলন্ত শলাকা ধরলে দেখা গেল শলাকাটি নিভে যায় কিন্তু গ্যাসটি বর্ণহীন শিখায় জ্বলতে থাকে। এতে প্রমাণিত হয়, নির্গত গ্যাসটি হাইড্রোজেন।

• **ম্যাগনেসিয়াম ছাড়া এই ধাতুগুলির সঙ্গে লঘু নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় না, কারণ HNO_3 জারক অ্যাসিড।**

(7) **অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ তড়িৎ পরিবহণ করে।**

জলীয় দ্রবণে অ্যাসিডের অণুগুলি বিয়োজিত হয়ে H^+ আয়ন দেয়, তাই অ্যাসিড মাত্রই তড়িৎ পরিবহণ করে। $HCl \rightleftharpoons H^+ + Cl^-$

যে কোন অ্যাসিডের অণুর মধ্যে এক বা একাধিক প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণু থাকবেই। এইসব হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি আংশিকভাবে কিংবা সম্পূর্ণরূপে ধাতুর পরমাণু বা ধাতুর মত আচরণশীল মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার ফলে যে যৌগ উৎপন্ন হয়, তাকে **লবণ** বলে।

(8) **অ্যাসিডের ক্ষারগ্রাহিতাঃ**

প্রতি অণু অ্যাসিডে উপস্থিত প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যাকে ঐ অ্যাসিডের ক্ষারগ্রাহিতা বলে।

যেমন—HCl-এর ক্ষারগ্রাহিতা$=1$

H_2SO_4-এর ক্ষারগ্রাহিতা$=2$

• **সব অ্যাসিডে হাইড্রোজেন থাকবেই, কিন্তু হাইড্রোজেন-ঘটিত সব যৌগই অ্যাসিড নয়।** হাইড্রোজেনের যৌগ হলেই যে অ্যাসিড হবে এমন কোন কথা নেই। (i) হাইড্রোজেনের যৌগের মধ্যে প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণু থাকতে হবে। কেরোসিন, পেট্রোল, তেল, চর্বি,

প্রোটিন—এইসব যৌগের মধ্যে হাইড্রোজেন আছে, তা হলেও এরা অ্যাসিড নয়, কারণ এদের সঙ্গে ধাতু যোগ করলে, এইসব অণু থেকে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয় না বা ক্ষার বা ক্ষারকের সঙ্গে বিক্রিয়ায় লবণ ও জল উৎপন্ন করে না। এরা নীল লিটমাসকে লাল করে না।

জলও তো হাইড্রোজেনের যৌগ (H_2O), **কিন্তু জল অ্যাসিড নয়।** কয়েকটি ক্ষেত্রে জলের হাইড্রোজেন পরমাণু ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপিত **হলেও লবণ উৎপন্ন না হয়ে ক্ষার উৎপন্ন হয়।** যেমন, জলের সঙ্গে সোডিয়াম ধাতু যোগ করলে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড নামে ক্ষার ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।

$$2H_2O + 2Na = 2NaOH + H_2$$

কাজেই জলকে আমরা অ্যাসিড বলতে পারি না।

● **আয়নে বিয়োজিত হওয়ার প্রবণতা অনুসারে** অ্যাসিডকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

(i) **তীব্র অ্যাসিডঃ** জলীয় দ্রবণে যে অ্যাসিডের অণুগুলির বেশীর ভাগই আয়নিত হয়ে যায়, তাকে তীব্র অ্যাসিড বলে। যেমন—

হাইড্রোক্লোরিক (HCl), সালফিউরিক (H_2SO_4), নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3)।

(ii) **মৃদু অ্যাসিডঃ** জলীয় দ্রবণে যে অ্যাসিডের অণুগুলির মধ্যে খুব কম সংখ্যক অণু আয়নে বিয়োজিত হয়, তাকে মৃদু অ্যাসিড বলে। যেমন—কার্বনিক অ্যাসিড, অ্যাসেটিক অ্যাসিড ইত্যাদি।

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl)

প্রস্তুতিঃ (i) হাইড্রোজেন গ্যাস ও ক্লোরিন গ্যাস সম আয়তনে মিশিয়ে সূর্যের আলোকে কিছুক্ষণ রেখে দিলে হাইড্রোজেনের সঙ্গে ক্লোরিন গ্যাস বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। (ii) **সোডিয়াম ক্লোরাইডের** সঙ্গে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে 150°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে সোডিয়াম বাই-সালফেট লবণ এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।

$$NaCl + H_2SO_4 = NaHSO_4 + HCl$$

এইভাবে উৎপন্ন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসকে জলে দ্রবীভূত করলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।

ধর্মঃ (i) এই গ্যাস বর্ণহীন, তীব্র ঝাঁঝলো গন্ধবিশিষ্ট, বাতাসের চেয়ে ভারী। (ii) এই গ্যাস জলে খুব দ্রাব্য। (iii) জলের সঙ্গে এই গ্যাস মিশে যে দ্রবণ উৎপন্ন হয়, তাকে **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড** বলে।

এই দ্রবণে নীল লিটমাস দিলে লাল হয়ে যায় এবং এর স্বাদ অম্ল। (iv) **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হল তীব্র অ্যাসিড।** জলীয় দ্রবণে এর বেশীর ভাগ অণু বিয়োজিত হয়ে H^+ এবং Cl^- আয়নে পরিণত হয়। $HCl \rightleftharpoons H^+ + Cl^-$। (v) এর মধ্যে একটিমাত্র প্রতিস্থাপনীয় H পরমাণু আছে, ধাতু দ্বারা এই H পরমাণু প্রতিস্থাপিত হয়ে H_2 এবং ধাতব লবণ উৎপন্ন করে। $Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2\uparrow$ (vi) **ক্ষারক বা ক্ষারের সঙ্গে এই অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ক্লোরাইড লবণ উৎপন্ন হয়।** যেমন, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ উৎপন্ন হয়।

$$HCl + NaOH = NaCl + H_2O$$

(vii) **কার্বনেট লবণের সঙ্গে** হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ক্লোরাইড লবণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। যেমন, ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে HCl-এর বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + CO_2\uparrow + H_2O$$

(viii) HCl-এর মধ্যে 1টি H পরমাণু বর্তমান, তাই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হল **একক্ষারিক অ্যাসিড।**

• HCl **সনাক্ত করার উপায়ঃ** (i) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কাছাকাছি অ্যামোনিয়া-সিক্ত কাচদণ্ড আনলে সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন হয়।

$$NH_3 + HCl = NH_4Cl \text{ (সাদা ধোঁয়া)}$$

অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড

(ii) এই অ্যাসিডের স্ফুটনাঙ্ক কম। (iii) **HCl-এর মধ্যে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ যোগ করলে সিলভার ক্লোরাইডের সাদা থকথকে অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয় যা HNO_3-তে অদ্রাব্য কিন্তু অতিরিক্ত NH_4OH-এ দ্রাব্য।**

$$HCl + AgNO_3 = AgCl\downarrow + HNO_3$$

ব্যবহারঃ (i) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পরীক্ষাগারে বিকারক রূপে এবং নানা শিল্পে ব্যবহৃত হয়। (ii) বিভিন্ন রং এবং ওষুধ প্রস্তুতিতে, (iii) সোনা গলানোর অ্যাসিড অ্যাকোয়া রিজিয়া প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। (iv) ক্লোরিন এবং ক্লোরাইড লবণ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4)

এই অ্যাসিড সালফার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযুতির দ্বারা গঠিত হয়।

প্রস্তুতিঃ (i) সালফারকে বাতাসের উপস্থিতিতে দহন করলে সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। $S + O_2 = SO_2$

(ii) সালফার ডাই-অক্সাইডকে 450°C উষ্ণতায় প্ল্যাটিনাম অনুঘটকের উপস্থিতিতে বাতাসের O_2 দ্বারা জারিত করলে সালফার ট্রাই-অক্সাইড পাওয়া যায়।

$$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3 + \text{তাপ}$$

(iii) এইভাবে উৎপন্ন SO_3-এর সঙ্গে জল মেশালে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। $SO_3 + H_2O = H_2SO_4$

ধর্মঃ (i) সালফিউরিক অ্যাসিড বর্ণহীন, গন্ধহীন ভারী তরল। (ii) এই অ্যাসিডের জল শোষণ করার ক্ষমতা খুব বেশী। জলে মেশাবার সময় খুব তাপ উৎপন্ন হয়। (iii) সালফিউরিক অ্যাসিডের স্ফুটনাঙ্ক বেশী (338°C)। (iv) এই অ্যাসিড তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারে।

(v) **জলের প্রতি সালফিউরিক অ্যাসিডের তীব্র আসক্তি আছে।** চিনি, কাগজ প্রভৃতি কার্বন জাতীয় যৌগের অণু থেকে জলীয় অংশ শোষণ করে, সালফিউরিক অ্যাসিড এই সমস্ত বস্তুকে কালো কার্বনে পরিণত করে। জল মেশানো সালফিউরিক অ্যাসিডে একটি কাঠি ডুবিয়ে ঐ কাঠি দিয়ে সাদা কাগজের উপর তোমার নাম লিখে শুকিয়ে নাও। শুকিয়ে গেলে কাগজের লেখা কেউ দেখতে পাবে না। এইবার কাগজটি বার্নারের উপর রেখে একটু গরম কর—দেখবে কাগজের গায়ে কালো অক্ষরে (কার্বন) তোমার নাম ফুটে উঠেছে।

(vi) সালফিউরিক অ্যাসিডের **একটি অণুর মধ্যে দুটি প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে, তাই H_2SO_4 দ্বিক্ষারিক অ্যাসিড।**

(vii) সালফিউরিক অ্যাসিড তীব্র অ্যাসিড, জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে H^+ এবং $SO_4^=$ আয়নে পরিণত হয়।

$$H_2SO_4 \rightleftharpoons 2H^+ + SO_4^=$$

ধাতু, ক্ষারক বা ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়ায় সালফিউরিক অ্যাসিড দু রকম লবণ উৎপন্ন করে। এর 2টি হাইড্রোজেনের মধ্যে **1টি হাইড্রোজেন ধাতুর পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে যে লবণ উৎপন্ন করে, তাকে অ্যাসিড লবণ বলে।** যেমন, NaOH-এর সঙ্গে H_2SO_4-এর বিক্রিয়ায়, 1টি H পরমাণু Na পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে **সোডিয়াম বাই-সালফেট লবণ** ($NaHSO_4$) উৎপন্ন করে। এই লবণটি **অ্যাসিড লবণ।**

$$H_2SO_4 + NaOH = NaHSO_4 + H_2O$$

এই অ্যাসিডের সঙ্গে NaOH-এর বিক্রিয়ায়, এর 2টি **প্রতিস্থাপনীয় H পরমাণু ধাতব Na দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে সোডিয়াম সালফেট (Na_2SO_4) উৎপন্ন করে। এটি নর্ম্যাল লবণ।**

$$H_2SO_4 + 2NaOH = Na_2SO_4 + 2H_2O$$

(vii) অনেক ধাতু (Mg, Zn, Fe ইত্যাদি) লঘু H_2SO_4-এর সঙ্গে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন ও সালফেট লবণ উৎপন্ন করে।

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2 \uparrow$$

(viii) **কার্বনেট লবণের সঙ্গে** H_2SO_4-এর বিক্রিয়ায় সালফেট লবণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$Na_2CO_3 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + CO_2 \uparrow + H_2O$$

• **H_2SO_4 সনাক্ত করার উপায়ঃ H_2SO_4-এর সঙ্গে বেরিয়াম** ক্লোরাইড দ্রবণ যোগ করলে সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে যা নাইট্রিক অ্যাসিডে অদ্রাব্য।

$$H_2SO_4 + BaCl_2 = BaSO_4 \downarrow + 2HCl$$

ব্যবহারঃ সালফিউরিক অ্যাসিড (i) পরীক্ষাগারে বিকারক রূপে, (ii) কৃত্রিম সার প্রস্তুতিতে, (iii) বস্ত্র এবং কাগজ শিল্পে ও পেট্রোলিয়াম শোধনে, (iv) পরীক্ষাগারে প্রস্তুত নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস শুষ্ক করতে নিরুদক রূপে ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3)

প্রস্তুতিঃ সোডিয়াম বা পটাসিয়াম নাইট্রেটের সঙ্গে গাঢ় H_2SO_4 মিশিয়ে 200°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে HNO_3 পাতিত হয় এবং সোডিয়াম বাই-সালফেট উৎপন্ন হয়।

$$NaNO_3 + H_2SO_4 = NaHSO_4 + HNO_3$$

ধর্মঃ (i) এই অ্যাসিড বর্ণহীন ঝাঁঝালো গন্ধবিশিষ্ট ধূমায়মান তরল (ii) এর স্ফুটনাঙ্ক কম, 86°C। (iii) নাইট্রিক অ্যাসিড জলে দ্রাব্য। এর জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল করে। (vi) নাইট্রিক অ্যাসিড একটি তীব্র অ্যাসিড। জলীয় দ্রবণে আয়নিত হয়ে H^+ এবং NO_3^- আয়নে পরিণত হয়। $HNO_3 \rightleftharpoons H^+ + NO_3^-$। এর একটি অণুর মধ্যে একটি প্রতিস্থাপনীয় H পরমাণু থাকে, তাই এটি একক্ষারিক অ্যাসিড। (v) ধাতুর সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় **নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন হয়।** যেমন—জিঙ্ক, আয়রন প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে নাইট্রিট অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ধাতুগুলির নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন হয় কিন্তু

হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় না, কারণ নাইট্রিক অ্যাসিড একটি জারক অ্যাসিড। ধাতব ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে কিন্তু লঘু HNO_3-এর বিক্রিয়ায় ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট এবং H_2 উৎপন্ন হয়।

$$Mg + 2HNO_3 = Mg(NO_3)_2 + H_2$$

(vi) ক্ষারক বা ক্ষারের সঙ্গে HNO_3-এর বিক্রিয়ায় নাইট্রেট লবণ ও জল উৎপন্ন হয়। যেমন—সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে HNO_3-এর বিক্রিয়ায় সোডিয়াম নাইট্রেট লবণ এবং জল উৎপন্ন হয়।

$$HNO_3 + NaOH = NaNO_3 + H_2O$$

(vii) **কার্বনেট লবণের সঙ্গে** HNO_3-এর বিক্রিয়ায় নাইট্রেট লবণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$Na_2CO_3 + 2HNO_3 = 2NaNO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$$

● **অ্যাকোয়া রিজিয়া বা অম্লরাজ: তিন আয়তন গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে এক আয়তন গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড মেশালে যে অ্যাসিড মিশ্রণ তৈরি হয়, তাকে অম্লরাজ বা অ্যাকোয়া রিজিয়া বলে।** এই অ্যাসিড মিশ্রণে সোনা দ্রবীভূত হয়।

● HNO_3 **সনাক্ত করার উপায়:** গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে Cu ছিবড়া যোগ করে উত্তপ্ত করলে বাদামী বর্ণের নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) গ্যাস নির্গত হয়।

ব্যবহার: পরীক্ষাগারে (i) জারক দ্রব্যরূপে, (ii) নাইট্রেট লবণ ও (iii) সার (অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট) প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। (iv) সোনাকে খাদমুক্ত করতে, (v) কৃত্রিম রং, টি. এন. টি. বিস্ফোরক প্রস্তুতিতে এবং বিকারক রূপে ব্যবহৃত হয়।

5.2 ক্ষারক ও ক্ষার

. . .● **ক্ষারক: যে যৌগ অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে তাকে ক্ষারক বলে।** ধাতব অক্সাইড ও ধাতব হাইড্রক্সাইড-গুলিকে ক্ষারক বলে। যেমন—সোডিয়াম মনোক্সাইড (Na_2O), ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO), ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (MgO), ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Mg(OH)_2$] ইত্যাদি। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড বা ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড লবণ ও জল উৎপন্ন হয়।

$$MgO + 2HCl = MgCl_2 + H_2O$$
$$Mg(OH)_2 + 2HCl = MgCl_2 + 2H_2O$$

ধাতুর মত ব্যবহার করে এমন মূলকের হাইড্রক্সাইডও ক্ষারক,

যেমন—অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড ; কারণ এই জাতীয় যৌগগুলি অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে।

● **ক্ষারঃ যে সমস্ত ক্ষারক (ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড) জলে দ্রবীভূত হয়, তাদের ক্ষার বলে। অর্থাৎ জলে দ্রাব্য ধাতব হাইড্রক্সাইডকে ক্ষার বলে।** যেমন—**সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড** ($NaOH$), **ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড** [$Ca(OH)_2$], **পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড** (KOH) ইত্যাদি। অ্যামোনিয়া একটি যৌগ, এই যৌগটি জলে দ্রবীভূত হয়ে **অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড** (NH_4OH) উৎপন্ন করে। অ্যামোনিয়াম (NH_4) মূলকটি ধাতুর মত ব্যবহার করে বলে NH_4OH-কেও ক্ষার বলে। সব ক্ষারক জলে দ্রাব্য না হতে পারে, কিন্তু ক্ষার মাত্রই জলে দ্রাব্য। তাই বলা হয়, সব ক্ষারই ক্ষারক তবে সব ক্ষারক ক্ষার নয়।

$$\underset{\text{ক্ষারক}}{Na_2O} + H_2O = \underset{\text{ক্ষার}}{2NaOH}$$

$$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$$

$$NH_3 + H_2O = NH_4OH$$

ক্ষারের অণুতে অক্সিজেন পরমাণু ও হাইড্রোজেন পরমাণু একসঙ্গে (OH) মূলকরূপে অবস্থান করে।

ধর্মঃ (i) **ক্ষার মাত্রই জলে দ্রবণীয়।** (ii) ক্ষারের জলীয় দ্রবণে হাত দিলে **সাবানের মত পিচ্ছিল মনে হয়।** (iii) ক্ষারের **জলীয় দ্রবণে লাল লিটমাস দিলে নীল হয়ে যায়।** (iv) **ক্ষার বা ক্ষারক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে।**

$$\underset{\text{ক্ষার}}{NaOH} + \underset{\text{অ্যাসিড}}{HCl} = \underset{\text{লবণ}}{NaCl} + \underset{\text{জল}}{H_2O}$$

$$\underset{\text{ক্ষারক}}{CaO} + \underset{\text{অ্যাসিড}}{2HCl} = \underset{\text{লবণ}}{CaCl_2} + \underset{\text{জল}}{H_2O}$$

(v) ক্ষার গলিত অবস্থায় বা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় OH^- আয়ন দেয় এবং তড়িৎ পরিবহণ করে। $NaOH \rightleftharpoons Na^+ + OH^-$ (vi) **ক্ষারে হাইড্রক্সিল** OH **মূলক থাকবেই।** (vii) প্রতি অণু ক্ষারে উপস্থিত প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রক্সিল মূলকের (OH) সংখ্যাকে ঐ ক্ষারের অম্লগ্রাহিতা বলে। যেমন—কস্টিক সোডার ($NaOH$) অম্লগ্রাহিতা $= 1$, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের [$Ca(OH)_2$] অম্লগ্রাহিতা $= 2$।

● **তীব্র ক্ষার এবং মৃদু ক্ষারঃ** আয়নে বিয়োজিত হওয়ার প্রবণতা অনুসারে ক্ষারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(i) **তীব্র ক্ষারঃ** জলীয় দ্রবণে যে ক্ষারের অণুগুলির বেশীর ভাগ আয়নিত হয়, তাকে **তীব্র ক্ষার** বলে ; যেমন—সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH), পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড (KOH), ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড $Ca(OH)_2$।

(ii) **মৃদু ক্ষারঃ** জলীয় দ্রবণে যে ক্ষারের অণুগুলির মধ্যে খুব কম সংখ্যক অণু বিয়োজিত হয়ে আয়নে পরিণত হয়, তাকে **মৃদু ক্ষার** বলে। যেমন—NH_4OH।

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বা কস্টিক সোডা, (NaOH)

প্রস্তুতিঃ (i) সোডিয়ামের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন হয়। $2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$

(ii) চুন গোলার সঙ্গে সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করে 80°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে NaOH দ্রবণ পাওয়া যায়।

$$Ca(OH)_2 + Na_2CO_3 = CaCO_3\downarrow + 2NaOH$$

ধর্মঃ (i) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বা কস্টিক সোডা একটি **তীব্র ক্ষার**। (ii) এর রং সাদা। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড একটি কঠিন পদার্থ, জল শোষণ করে, জলে খুব দ্রাব্য। (iii) এর অণুতে 1টি অক্সিজেন পরমাণু, 1টি হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পর যুক্ত হয়ে OH মূলকরূপে সোডিয়াম পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে। (iv) এর জলীয় দ্রবণ সাবানের মত পিচ্ছিল—লাল লিটমাস দিলে তার রং নীল হয়ে যায়। (v) যে কোন অ্যাসিডের সঙ্গে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়ায় লবণ ও জল উৎপন্ন হয়। যেমন, HCl-এর সঙ্গে NaOH-এর বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ, HNO_3-এর সঙ্গে বিক্রিয়ায় সোডিয়াম নাইট্রেট ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় সোডিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়।

$$HCl + NaOH = NaCl + H_2O$$
$$HNO_3 + NaOH = NaNO_3 + H_2O$$
$$H_2SO_4 + 2NaOH = Na_2SO_4 + 2H_2O$$

(vi) **NaOH দ্রবণ CO_2 এবং SO_2 গ্যাস শোষণ করে যথাক্রমে সোডিয়াম কার্বনেট এবং সোডিয়াম সালফাইট উৎপন্ন করে।**

(vii) চামড়া বা জৈব পদার্থের সংস্পর্শে এলে ক্ষতের সৃষ্টি করে।

ব্যবহারঃ (i) সোডিয়াম ধাতু নিষ্কাশনে, (ii) সাবান, কাগজ,

কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি প্রস্তুতিতে এবং (iii) পেট্রোলিয়াম শোধনে কস্টিক সোডা ব্যবহৃত হয়।

পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড বা কস্টিক পটাশ, (KOH)

এই ক্ষারটির অণুর মধ্যে একটি পটাসিয়াম, একটি অক্সিজেন ও একটি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে। এর মধ্যেও হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু OH মূলকরূপে বর্তমান থাকে।

প্রস্তুতিঃ (i) জলের সঙ্গে পটাসিয়াম ধাতুর বিক্রিয়ার ফলে পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$2K + 2H_2O = 2KOH + H_2$$

(ii) পটাসিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ-বিশ্লেষণ করলে পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড পাওয়া যায়।

ধর্মঃ (i) পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড বা কস্টিক পটাশ একটি তীব্র ক্ষার। (ii) এর জলীয় দ্রবণ পিচ্ছিল। (iii) লাল লিটমাসের দ্রবণ পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণে যোগ করলে নীল হয়ে যায়। (iv) অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায়, অ্যাসিডের পটাসিয়াম লবণ ও জল উৎপন্ন করে। যেমন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়ায় পটাসিয়াম ক্লোরাইড ও জল উৎপন্ন হয়।

$$KOH + HCl = KCl + H_2O$$

(v) **পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড** (KOH) **দ্রবণ** CO_2 **এবং** SO_2**-কে শোষণ করে যথাক্রমে পটাসিয়াম কার্বনেট** (K_2CO_3) **এবং পটাসিয়াম সালফাইট লবণ উৎপন্ন করে।**

ব্যবহারঃ পরীক্ষাগারে বিকারকরূপে, নরম সাবান প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, [$Ca(OH)_2$]

প্রস্তুতিঃ (i) চুনের (CaO) সঙ্গে অল্প পরিমাণ জল যোগ করলে জলে দ্রবীভূত না হলেও চুন জল শোষণ করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর তাপের সৃষ্টি হয় এবং শব্দ করে চুন ফুটতে থাকে। চুন ক্রমে ফুলে ওঠে, তারপর ফেটে গিয়ে চূর্ণ অবস্থায় আসে। চুনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন হয়। একে **স্লেকেড লাইম** বা **কলিচুন** বলে।

$$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$$

(ii) স্লেকেড লাইমের সঙ্গে বেশী পরিমাণ জল যোগ করলে এর

কিছু অংশ জলে দ্রবীভূত হয়ে স্বচ্ছ **চুনজল** উৎপন্ন করে। এর জলীয় দ্রবণে লাল লিটমাস দিলে নীল হয়ে যায়।

ধর্ম: (i) এটি একটি তীব্র ক্ষার। (ii) স্বচ্ছ চুনজলে CO_2 চালনা করলে অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়, ফলে স্বচ্ছ চুনজল ঘোলা হয়ে যায়। পরে অতিরিক্ত CO_2 চালনা করলে ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট উৎপন্ন করে। এই লবণটি জলে দ্রাব্য—তাই ঘোলা চুনজল আবার স্বচ্ছ হয়ে যায়। $Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 \downarrow + H_2O$; $CaCO_3 + H_2O + CO_2 = Ca(HCO_3)_2$। (iii) অ্যাসিডের সঙ্গে এই ক্ষারের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম লবণ ও জল উৎপন্ন হয়। যেমন, নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে $Ca(OH)_2$-এর বিক্রিয়ায় **ক্যালসিয়াম নাইট্রেট** ও জল উৎপন্ন হয়।

$$Ca(OH)_2 + 2HNO_3 = Ca(NO_3)_2 + 2H_2O$$

ব্যবহার: (i) সিমেণ্ট প্রস্তুতিতে, (ii) ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুতিতে এবং (iii) চিনি বিশোধনে কলিচুন ব্যবহৃত হয়।

● **প্রশমন বিক্রিয়া: সংজ্ঞা—অ্যাসিড এবং ক্ষারের মধ্যে বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে, অ্যাসিড বা ক্ষারের ধর্ম সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে লবণ ও জল উৎপন্ন হয়। অ্যাসিড এবং ক্ষারের মধ্যে এইরকম বিক্রিয়াকে প্রশমন বলে।**

তুল্য পরিমাণ* অ্যাসিডের সঙ্গে তুল্য পরিমাণ ক্ষারের বিক্রিয়ায় অ্যাসিডের সব কটি প্রতিস্থাপনীয় H পরমাণু, ক্ষারের OH মূলকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রশম পদার্থ জল উৎপন্ন করে এবং অ্যাসিডের অ্যাসিড-মূলক এবং ক্ষারের ধাতবমূলক যুক্ত হয়ে লবণ উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়াকে **প্রশমন বিক্রিয়া** বলে; কারণ উৎপন্ন পদার্থের মধ্যে অ্যাসিড বা ক্ষার কারো ধর্ম বর্তমান থাকে না।

● **নির্দেশক**: অ্যাসিড এবং ক্ষারের বিক্রিয়ায় অ্যাসিড বা ক্ষার সম্পূর্ণ প্রশমিত হয়ে লবণ ও জলে পরিণত হয়েছে কিনা জানার জন্য নির্দেশক ব্যবহার করা হয়। **নির্দেশক হল জৈব পদার্থ**—যা নিজের বর্ণ পরিবর্তন করে অ্যাসিড এবং ক্ষারের বিক্রিয়ার প্রশমন ক্ষণটি জানিয়ে দেয়। প্রশমন বিক্রিয়ায় **লিটমাস, ফিনলপ্থ্যালিন, মিথাইল অরেঞ্জ** প্রভৃতি নির্দেশক ব্যবহার করা হয়। অ্যাসিড, ক্ষার এবং প্রশম দ্রবণে নির্দেশকগুলির বর্ণ কেমন হয় তা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

* অ্যাসিডের যত ভাগ ওজনে, একভাগ ওজনের প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন থাকে, তাকে তুল্য পরিমাণ অ্যাসিড বলে।

ক্ষারের যত ভাগ ওজন তুল্য পরিমাণ অ্যাসিডকে প্রশমিত করে, তাকে তুল্য পরিমাণ ক্ষার বলে।

নির্দেশক	স্বাভাবিক বর্ণ	অ্যাসিড দ্রবণে বর্ণ	ক্ষার দ্রবণে বর্ণ	প্রশমন ক্ষণে বর্ণ
(i) লিটমাস	বেগুনী	লাল	নীল	বেগুনী
(ii) মিথাইল অরেঞ্জ	কমলা	লাল	হলুদ	কমলা
(iii) ফিনল-প্থ্যালিন	বর্ণহীন	বর্ণহীন	লালচে-বেগুনী	বর্ণহীন

পরীক্ষাঃ একটি বীকারে সামান্য কস্টিক সোডার দ্রবণ নিয়ে ওর সঙ্গে 2 ফোঁটা **ফিনলপ্থ্যালিন** নির্দেশক যোগ করলে দ্রবণটির বর্ণ লালচে বেগুনী হয়ে যাবে। এইবার একটি ড্রপারে লঘু HCl নিয়ে ক্ষার দ্রবণে ফোঁটা ফোঁটা করে যোগ করা হল এবং বীকারটিকে অনবরত নাড়া হল। দ্রবণের বর্ণ ক্রমে হালকা হতে থাকবে, শেষে একসময় দেখা যাবে আর 1 ফোঁটা অ্যাসিড যোগ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণটি বর্ণহীন হল—একেই **প্রশমন ক্ষণ** বলে। এই অবস্থায় ঐ দ্রবণে অ্যাসিডের বা ক্ষারের ধর্ম বর্তমান থাকে না—অ্যাসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ায় লবণ ও জল উৎপন্ন হয়েছে। এই বিক্রিয়াটি হল প্রশমন ক্রিয়া।

অ্যাসিড ও ক্ষারের মধ্যে তুলনাঃ

অ্যাসিড	ক্ষার
(1) অ্যাসিডের অণুর মধ্যে প্রতিস্থাপনীয় **H** পরমাণু থাকে। এই **H** পরমাণু, ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে লবণ উৎপন্ন করে।	(1) ক্ষারের অণুতে (**OH**) মূলক থাকে। অ্যাসিডের প্রতিস্থাপনীয় **H** পরমাণু **OH** মূলকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে H_2O অণু উৎপন্ন করে।
(2) অ্যাসিডের স্বাদ টক। এর জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল করে।	(2) ক্ষারের জলীয় দ্রবণ স্পর্শ করলে সাবানের মত পিচ্ছিল বোধ হয়। ক্ষারের জলীয় দ্রবণ লাল লিটমাসকে নীল করে।
(3) অ্যাসিড, ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে।	(3) ক্ষার, অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে।
(4) অ্যাসিড জলে দ্রাব্য।	(4) ক্ষার জলে দ্রাব্য।
(5) অ্যাসিড চামড়ার সংস্পর্শে এলে ক্ষতের সৃষ্টি করে।	(5) ক্ষার চামড়ার সংস্পর্শে এলে ক্ষতের সৃষ্টি করে।
(6) অ্যাসিড জলে দ্রবীভূত হয়ে H^+ আয়ন দেয়।	(6) ক্ষার জলে দ্রবীভূত হয়ে OH^- আয়ন দেয়।
(7) অ্যাসিড কার্বনেট লবণ থেকে CO_2 মুক্ত করে এবং লবণ উৎপন্ন করে।	(7) ক্ষার CO_2-কে শোষণ করে।

• **বিলীয়মান রঙঃ** ক্ষার দ্রবণে ফিনলপ্‌থ্যালিন নির্দেশক যোগ করলে দ্রবণের বর্ণ লালচে বেগুনী বর্ণের হয়ে যায়। অ্যামোনিয়া গ্যাসের জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয়, তাই অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণে ফিনলপ্‌থ্যালিন মেশালে দ্রবণটির বর্ণ লালচে বেগুনী হয়ে যায়। এই রঙ কাপড়ে দিলে কাপড়ের রঙ প্রথমে লালচে বেগুনী হয়ে যায়, কিছুক্ষণ পর ঐ রঙ অদৃশ্য হয়ে যায়। তাই এই রকম রঙকে **বিলীয়মান রঙ** বলে।

এই রঙটি কাপড়ে ছড়িয়ে দিলে জলে দ্রবীভূত অ্যামোনিয়া খুব তাড়াতাড়ি উবে যায়। দ্রবণ থেকে অ্যামোনিয়া দূর হয়ে গেলে দ্রবণটির আর ক্ষারীয় ধর্ম থাকে না, প্রশম হয়ে যায়। প্রশম দ্রবণে ফিনলপ্‌থ্যালিন বর্ণহীন, তাই দ্রবণের লালচে বেগুনী রঙ বর্ণহীন হয়ে যায়।

প্রশ্নাবলী

[A] **জ্ঞানমূলক :**

(i) অ্যাসিড কাকে বলে ?
(ii) ক্ষার এবং ক্ষারক বলতে কি বোঝ ?
(iii) মৃদু অ্যাসিড এবং তীব্র অ্যাসিড কাকে বলে ?
(iv) তীব্র ক্ষার কাকে বলে ?
(v) অম্লরাজ কি ?
(vi) প্রশমন ক্রিয়া বলতে কি বোঝ ?
(vii) কস্টিক সোডার ব্যবহার কি ?
(viii) জৈব অ্যাসিড এবং অজৈব অ্যাসিড বলতে কি বোঝ ?
(ix) সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রস্তুতিতে কি কি পদার্থের দরকার হয় ?
(x) সালফিউরিক অ্যাসিডের কয়েকটি প্রধান ধর্ম বল।
(xi) একটি জারক অ্যাসিডের নাম কর।
(xii) একটি অজারক অ্যাসিডের নাম লেখ।
(xiii) কস্টিক সোডার কয়েকটি ধর্ম উল্লেখ কর।
(xiv) নিচের যৌগগুলি কি কি মৌল দ্বারা গঠিত ?
(a) সালফিউরিক অ্যাসিড, (b) কস্টিক সোডা, (c) নাইট্রিক অ্যাসিড, (d) চুন।
(xv) নির্দেশক কি ?
(xvi) বিলীয়মান রঙ কি ?
(xvii) নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় বিকারকগুলির নাম উল্লেখ কর।
(xviii) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের প্রস্তুতি বর্ণনা কর।
(xix) সালফিউরিক অ্যাসিড কিভাবে প্রস্তুত করা হয় বর্ণনা কর।
(xx) কস্টিক সোডার প্রস্তুতি লেখ।

[B] বোধমূলক প্রশ্ন :

(i) দুটি জৈব অ্যাসিডের উদাহরণ দাও।

(ii) দুটি ক্ষারক এবং দুটি ক্ষারের উদাহরণ দাও।

(iii) H_2SO_4, H_2CO_3 এবং HCl—এই তিনটি অ্যাসিডের মধ্যে কোন্‌টি মৃদু অ্যাসিড ?

(iv) দুটি মৃদু অ্যাসিড এবং দুটি তীব্র অ্যাসিডের উদাহরণ দাও।

(v) দুটি তীব্র ক্ষারের নাম সঙ্কেত সহ উল্লেখ কর।

(vi) মৃদু অ্যাসিড এবং তীব্র অ্যাসিডের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(vii) ক্ষার এবং ক্ষারকের মধ্যে পার্থক্য কি ?

(viii) তেঁতুল, লেবু এবং দৈ-এর মধ্যে কি কি অ্যাসিড থাকে ?

(ix) ক্ষার দ্রবণে, প্রশম দ্রবণে এবং অ্যাসিড দ্রবণে ফিনলপ্‌থ্যালিন দিলে কি রঙ হয় ?

(x) 'হাইড্রোজেন ঘটিত যৌগমাত্রই অ্যাসিড নয়'—কথাটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর।

(xi) অ্যাসিডের কয়েকটি ধর্মের উল্লেখ কর।

(xii) জৈব অ্যাসিড এবং অজৈব অ্যাসিডের উদাহণ দাও।

(xiii) চিনির মধ্যে গাঢ় H_2SO_4 দিলে কি হয় ?

(xiv) ক্ষার এবং ক্ষারকের তিনটি ধর্ম উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

(xv) নিচের পদার্থগুলির মধ্যে কোন্‌টি ক্ষার এবং কোন্‌টি ক্ষারক বল—
ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, কস্টিক সোডা, জিঙ্ক অক্সাইড, পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড।

(xvi) নিচের অ্যাসিডগুলির ধর্ম সম্বন্ধে যা জান লেখ—
সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।

(xvii) কস্টিক সোডার ধর্ম লেখ।

(xviii) অ্যাসিড এবং ক্ষারের পার্থক্যগুলি লেখ।

(xix) 'অ্যাসিডের মধ্যে H পরমাণু থাকবেই কিন্তু সব H পরমাণুযুক্ত যৌগ অ্যাসিড নয়'—উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

(xx) সালফিউরিক অ্যাসিড—অ্যাসিড লবণ উৎপন্ন করে, কিন্তু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড—অ্যাসিড লবণ উৎপন্ন করে না কেন ?

(xxi) সব ক্ষারই ক্ষারক অথচ সব ক্ষারক ক্ষার নয় কেন ?

[C] প্রয়োগমূলক :

(i) একটি তরলের মধ্যে নীল লিটমাস দ্রবণ যোগ করায় লাল হয়ে গেল—তরলটি অ্যাসিড, ক্ষার অথবা জল কোন্‌টি হতে পারে ?

(ii) ফর্মিক অ্যাসিডকে জৈব অ্যাসিড বলে কেন ?

(iii) সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্কেত লেখ। এতে কয়টি প্রতিস্থাপনীয় H পরমাণু আছে ?

(iv) কার্বন ডাই-অক্সাইডে জল যোগ করলে কি উৎপন্ন হয় ?

(v) সোডিয়াম অক্সাইডের সঙ্গে জল যোগ করলে কি উৎপন্ন হয়? এতে লাল লিটমাস দিলে কি হয়?

(vi) কস্টিক সোডা এবং কস্টিক পটাশের সঙ্কেত লেখ। কলিচুনের মধ্যে কয়টি OH মূলক বর্তমান?

(vii) একটি দ্রবণে H^+ আয়নের আধিক্য বেশী, দ্রবণটিতে নীল লিটমাস দিলে কি হবে?

(viii) নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে কস্টিক সোডার বিক্রিয়ায় কি লবণ উৎপন্ন হয়?

(ix) কস্টিক সোডা এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের ব্যবহার লেখ।

(x) তিনটি বোতলের একটিতে অ্যাসিড দ্রবণ, দ্বিতীয়টিতে ক্ষার দ্রবণ এবং তৃতীয়টিতে লবণের দ্রবণ আছে। কি করে প্রত্যেকটিকে সনাক্ত করবে বর্ণনা কর।

(xi) তিনটি শিশির একটিতে HCl, অপরটিতে H_2SO_4 এবং শেষেরটিতে HNO_3 আছে। এদের সনাক্ত করবে কি করে?

(xii) একটি তরলের জলীয় দ্রবণে ম্যাগনেসিয়াম ধাতু যোগ করায় বর্ণহীন এবং গন্ধহীন একটি গ্যাস নির্গত হয় যা নীল শিখায় জ্বলে—তরলটি কি হতে পারে?

(xiii) একটি তরলে মার্বেল যোগ করায় বর্ণহীন এবং গন্ধহীন গ্যাস বের হয়, যার মধ্যে জ্বলন্ত পাটকাঠি দিলে নিভে যায়—তরলটি কি? কি গ্যাস নির্গত হয়?

(xiv) একটি পদার্থের দ্রবণে হাত দিলে পিচ্ছিল বোধ হয় এবং ঐ দ্রবণে লাল লিটমাস দিলে নীল হয়ে যায়—পদার্থটি কি জাতীয়?

(xv) অ্যাসিড বা ক্ষারের জলীয় দ্রবণ তড়িৎ পরিবহণ করে কেন? অ্যাসিড লবণ কি করে উৎপন্ন হয়?

(xvi) একটি অ্যাসিডের দ্রবণে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ যোগ করায় সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে যা নাইট্রিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় না—অ্যাসিডটি কি?

(xvii) নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে ক্ষার বা ক্ষারকের বিক্রিয়ায় অ্যাসিড লবণ উৎপন্ন হয় না কেন?

(xviii) একটি অ্যাসিডের গাঢ় দ্রবণের সঙ্গে কপার ছিবড়া যোগ করে উত্তপ্ত করলে বাদামী গ্যাস নির্গত হয়—অ্যাসিডটি কি?

(xix) H_2SO_4, HCl এবং HNO_3—এই তিনটি অ্যাসিডের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উদ্বায়ী কোন্‌টি?

(xx) বিলীয়মান রঙ কি করে তৈরি করা হয়? এই রঙ কাপড়ে লাগলে কিছুক্ষণের মধ্যে বর্ণহীন হয়ে যায় কেন?

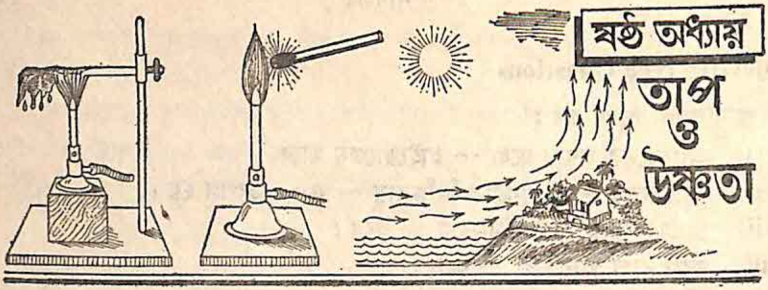
[D] **দক্ষতামূলক ঃ**

(i) একটি চিত্র এঁকে প্রশমন ক্রিয়া দেখাবার জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

Objective type Questions :

1. **শূন্যস্থান পূরণ কর :**
   - (i) অ্যাসিডের অণুর মধ্যে — হাইড্রোজেন থাকে।
   - (ii) অ্যাসিডের সঙ্গে ক্ষারকের বিক্রিয়ায় — ও — উৎপন্ন হয়।
   - (iii) প্রত্যেক ক্ষার — লিটমাসকে — করে।
   - (iv) জলে দ্রাব্য ক্ষারককে — বলে।
   - (v) কস্টিক পটাশ একটি —।
   - (vi) অ্যাসিডের মধ্যে নীল লিটমাস দিলে — হয়ে যায়।
   - (vii) ক্যালসিয়াম অক্সাইড একটি —।
   - (viii) ক্ষারের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় — এবং — উৎপন্ন হয়।
   - (ix) চুনজলের মধ্যে CO_2 চালনা করলে — হয়ে যায়।
   - (x) লেবুর মধ্যে — অ্যাসিড আছে।
   - (xi) কস্টিক সোডা একটি — ক্ষার।
   - (xii) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড একটি — অ্যাসিড।

2. **সঠিক উত্তরে টিক '√' চিহ্ন দাও :**
   - (i) অ্যাসিড/ক্ষারের অণুর মধ্যে প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন থাকে।
   - (ii) চুনজলের মধ্য দিয়ে H_2/CO_2 গ্যাস চালনা করলে চুনজল ঘোলা হয়।
   - (iii) পিঁপড়ের হুলে ফর্মিক অ্যাসিড/টার্টারিক অ্যাসিড আছে।
   - (iv) সোনা দ্রবীভূত হয় অ্যাকোয়া রিজিয়ায়/গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডে।
   - (v) লঘু HNO_3-এর সঙ্গে Mg-এর বিক্রিয়ায় H_2 নির্গত হয়/H_2 নির্গত হয় না।
   - (vi) অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ তড়িৎ পরিবহণ করে/করে না।
   - (vii) HCl-এর সংস্পর্শে অ্যামোনিয়াসিক্ত কাচদণ্ড আনলে সাদা ধোঁয়া/বর্ণহীন গ্যাস/বাদামী গ্যাস উৎপন্ন হয়।
   - (viii) চিনির সঙ্গে গাঢ় H_2SO_4/HCl/HNO_3 যোগ করলে কালো কার্বন পাওয়া যায়।
   - (ix) সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে ক্ষারের বিক্রিয়ায় সালফেট/নাইট্রেট/ক্লোরাইড লবণ উৎপন্ন হয়।
   - (x) ক্ষার দ্রবণে 1 ফোঁটা ফিনলপ্থ্যালিন দিলে দ্রবণটি লালচে-বেগুনী/হলুদ/নীল হয়ে যায়।



ষষ্ঠ অধ্যায়
তাপ ও উষ্ণতা

6.1 তাপ

টেবিলের উপর তিনটি বাটির মধ্যে একটিতে গরম জল, আর একটিতে কলের জল এবং শেষেরটিতে বরফ-শীতল জল আছে। এখন তোমার চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলেও তুমি বাটি তিনটির মধ্যে হাত ডুবিয়ে বলে দিতে পার কোন্ পাত্রে কি রকম জল আছে। কারণ গরম জলে, সাধারণ কলের জলে ও বরফ-শীতল জলের মধ্যে হাত দিলে আমাদের শরীরে বিভিন্ন রকম অনুভূতির সৃষ্টি হয়। জলের এই যে তিন রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ হল তাপ। গরম জলে হাত দিলে গরম জল থেকে আমাদের শরীরে তাপ ঢুকে যায়, সেইজন্য শরীরে এক-রকম অনুভূতির সৃষ্টি হয়। আবার ঠাণ্ডা জলে হাত দিলে আমাদের শরীর থেকে তাপ বেরিয়ে যায়, সেইজন্য আর এক রকম অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

এখন যে গরম জলে হাত ডোবাতে কষ্ট হচ্ছিল, সেই গরম জলকে খোলা জায়গায় কিছুক্ষণ রেখে দাও, দেখবে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, ওর মধ্যে অনায়াসে হাত ডোবানো যাচ্ছে। আবার বরফ-শীতল ঠাণ্ডা জলকে উনুনে বসিয়ে দাও, কিছুক্ষণ পরে দেখবে ওটা এত গরম হয়ে গেছে যে ওর মধ্যে আর হাত দেওয়া যাচ্ছে না। তাহলে বলা যায়, **বাইরের যে কারণের জন্য কোন ঠাণ্ডা বস্তু গরম হয় বা গরম বস্তু ঠাণ্ডা হয় সেই কারণই হল তাপ।**

• **তাপ একরকম শক্তিঃ** তাপকে দেখা যায় না, তাপের আকার নেই, তাপের ওজন নেই। একটি লোহার গোলককে ঠাণ্ডা অবস্থায় ওজন করা হল। এইবার ঐ গোলকটিকে উনুনে বসিয়ে খুব উত্তপ্ত করে আবার ওজন করা হল। দেখা গেল, ওজন আগের মতই আছে—এতটুকু কমেনি বা বাড়েনি। উত্তপ্ত করায় গোলকটির মধ্যে তাপ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও ওর ওজন বাড়েনি। কাজেই তাপকে পদার্থ বলা যায় না। **যার কাজ করার সামর্থ্য আছে, তাকেই শক্তি বলা হয়।** দেখা যায়, কয়লা পুড়িয়ে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেই তাপ দিয়ে জল ফুটিয়ে বাষ্প তৈরি

করে স্টীম-ইঞ্জিন চালান যায়। এই ইঞ্জিন কত যাত্রীকে দূর দূর দেশে নিয়ে যায়, কত ভারী ভারী মাল এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে যায়। এইভাবে কত কাজ হয়। তাহলে দেখা গেল, তাপের কাজ করার সামর্থ্য আছে। **তাহলে তাপও একটা শক্তি।**

• **তাপের সংজ্ঞাঃ তাপ হল এমন একরকম শক্তি, যা গ্রহণ করলে বস্তু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, আবার বর্জন করলে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।**

6.2 তাপের ফল

তাপ প্রয়োগ করলে পদার্থের কতকগুলি ধর্মের পরিবর্তন হয়।

(i) **অবস্থার পরিবর্তনঃ** তাপ প্রয়োগ করলে কঠিন পদার্থ তরলে আর তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয়। আবার বাষ্প থেকে তাপ বের করে নিলে ঐ বাষ্প তরলে এবং তরল থেকে তাপ বের করে নিলে ঐ তরল কঠিনে পরিণত হয়।

(ii) **উষ্ণতার পরিবর্তনঃ** অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে কোন বস্তুতে তাপ দিলে ওর উষ্ণতা বেড়ে যায়, আবার কোন বস্তু থেকে তাপ নিয়ে নিলে ওর উষ্ণতা কমে যায়।

(iii) **আয়তনের পরিবর্তনঃ** তাপ প্রয়োগ করলে পদার্থের আয়তন বেড়ে যায়। কতকগুলি পদার্থ, যেমন—বরফ, বিসমাথ, পিতল প্রভৃতির উপর তাপ প্রয়োগ করে তরল অবস্থায় আনলে ওদের আয়তন কমে যায়।

(iv) **রাসায়নিক পরিবর্তনঃ** তাপ প্রয়োগ করলে অনেক সময় পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। যেমন, কার্বনকে উত্তপ্ত করলে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে।

(v) **বৈদ্যুতিক ধর্ম ও চৌম্বক ধর্মের পরিবর্তনঃ** তাপ প্রয়োগ করলে পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহণ-ক্ষমতা কমে যায়। একটা চুম্বককে গরম করলে তার চৌম্বক ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়।

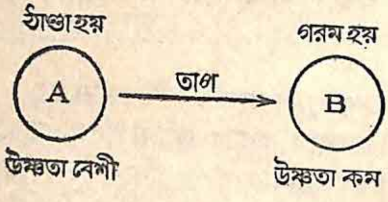
(vi) **আলোক-শক্তির সৃষ্টিঃ** পদার্থ খুব বেশী উত্তপ্ত হলে আলোকের সৃষ্টি হয়। বৈদ্যুতিক বাল্‌বের তার খুব উত্তপ্ত হয় বলে আলো দেয়।

(vii) **দহনঃ** কেরোসিন, স্পিরিট, কাগজ, কাঠ প্রভৃতি পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে জ্বলে উঠে।

6.3 উষ্ণতা

(i) ঠাণ্ডা বা গরম, সব পদার্থের মধ্যে কিছু-না-কিছু তাপ থাকে। ধরি, A ও B দুটি বস্তু আছে। দুটি বস্তুকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে যদি দেখা যায় B থেকে A-কে বেশী গরম মনে হচ্ছে, তাহলে আমরা বলি B-এর চেয়ে A-এর উষ্ণতা বেশী। (ii) ধরি, A এবং B দুটি

বস্তু একই উষ্ণতায় আছে। এখন A-কে বার্নার দিয়ে গরম করা হল—কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে A খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। A-এর গায়ে আর হাত দেওয়া যাচ্ছে না, B কিন্তু আগের মতই আছে—B-কে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাচ্ছে। বার্নার দিয়ে A-কে তাপ দেওয়ার ফলে A উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, ফলে ওর তাপমাত্রা বা উষ্ণতা বেড়ে গেছে। সুতরাং বলা যায়, **তাপ হল কারণ এবং উষ্ণতা হল তার ফল।**



(iii) এখন A ও B-কে পরস্পরের সংস্পর্শে রাখা হল। এইভাবে কিছুক্ষণ রাখার পর যদি দেখা যায় যে A আগের চেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আর B আগের চেয়ে আরও গরম হয়ে উঠেছে, তাহলে বুঝতে হবে A থেকে B-তে তাপ চলে এসেছে। এর কারণ হল A-এর উষ্ণতা B-এর উষ্ণতার চেয়ে বেশী ছিল।

সংজ্ঞাঃ তাপমাত্রা বা উষ্ণতা হল কোন বস্তুর তাপীয় অবস্থা। বস্তুর এই অবস্থাই ঠিক করে দেয়—দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে রাখলে কোন্‌টি তাপ ছাড়বে আর কোন্‌টি ঐ তাপ গ্রহণ করবে।

6.4 উষ্ণতা ও তাপের মধ্যে পার্থক্য

(i) **তাপ হল পদার্থের মধ্যে একরকম শক্তি, আর উষ্ণতা হল ঐ শক্তির প্রকাশ।** কোন বস্তুর তাপ বলতে বোঝায় বস্তুটির মধ্যে কি পরিমাণ তাপশক্তি আছে। কোন বস্তুর উষ্ণতা বলতে বস্তুটির তাপীয় অবস্থা বোঝায়, যা দ্বারা বোঝা যায় যে, বস্তুটিকে অন্য এক বস্তুর সংস্পর্শে আনলে বস্তুটি তাপ ছাড়বে—না গ্রহণ করবে।

(ii) **তাপ প্রয়োগ করলে বস্তুর উষ্ণতা বাড়ে,** অর্থাৎ তাপের জন্য বস্তুর উষ্ণতা বাড়ে। তাই বলা যায় যে, **তাপ হল কারণ এবং উষ্ণতা হল তার ফল।**

(iii) **দুটি বস্তুতে বিভিন্ন পরিমাণে তাপ থাকলেও বস্তু দুটির উষ্ণতা এক হতে পারে।**

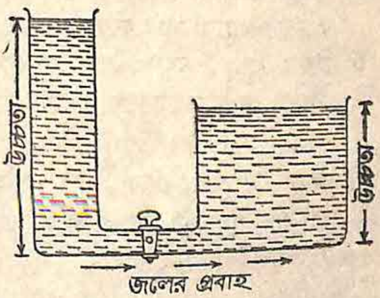
যেমন, এক কেটলি ফুটন্ত জল থেকে এক কাপ জল ঢেলে নিলে দেখা যাবে কেটলির জলের উষ্ণতা ও কাপের জলের উষ্ণতা একই। এখন কেটলির জল ও কাপের জলকে খোলা বাতাসে রেখে ঠাণ্ডা হতে দিলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে যে কাপের জল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কিন্তু কেটলির জল তখনো গরম আছে। এতেই বোঝা যায় যে, কাপের জলের মধ্যে যে পরিমাণ তাপ ছিল তার চেয়ে কেটলির জলের মধ্যে তাপের পরিমাণ অনেক বেশী ছিল অথচ দুটির উষ্ণতা একই ছিল।

(iv) **দুটি বস্তুর—একটিতে তাপের পরিমাণ বেশী, আর একটিতে তাপের পরিমাণ কম। এখন এই দুটি বস্তুকে পরস্পর সংস্পর্শে রাখলে, যে বস্তুটিতে বেশী তাপ আছে, সেখান থেকে, যে বস্তুতে কম তাপ আছে সেই বস্তুর মধ্যে তাপ চলে যাবে এমন কোন কথা নেই।**

যে বস্তুর উষ্ণতা বেশী, সেই বস্তু থেকে কম উষ্ণতাবিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে তাপ চলে যাবে। প্রথম বস্তুটির মধ্যে তাপের পরিমাণ বেশী থাকলেও, ওর উষ্ণতা দ্বিতীয় বস্তুর চেয়ে কম থাকলে, দ্বিতীয় বস্তু থেকে তাপ ওর মধ্যে চলে যাবে।

উদাহরণঃ একটি লোহার ছোট গোলককে আগুনে লোহিততপ্ত করে, এক বালতি গরম জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। বালতির জলের মধ্যে তাপের পরিমাণ, গরম লোহার গোলকের মধ্যের তাপের পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশী। এখন বালতির জলের মধ্যে গোলকটিকে ফেললে যেহেতু ওর উষ্ণতা বালতির জলের চেয়ে বেশী, সেইজন্য গোলক থেকে তাপ গরম জলে চলে যাবে, ফলে গরম জল আরো গরম হয়ে উষ্ণতা বাড়বে আর লোহার গোলক থেকে তাপ জলের মধ্যে চলে আসার ফলে গোলকটির উষ্ণতা কমে যাবে।

(v) মনে কর, দুটি চৌবাচ্চা আছে, প্রথমটিতে কম জল আছে আর দ্বিতীয়টিতে বেশী জল আছে। কিন্তু প্রথম চৌবাচ্চার জলের উচ্চতা দ্বিতীয়টির চেয়ে বেশী। এখন একটা নল দিয়ে ঐ দুটি চৌবাচ্চাকে পরস্পর যোগ করলে দেখা যাবে, প্রথম চৌবাচ্চা থেকে দ্বিতীয় চৌবাচ্চায় জল যাচ্ছে, যদিও দ্বিতীয় চৌবাচ্চায় প্রথমটির চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ জল আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি চৌবাচ্চার জলের উচ্চতা এক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জল প্রথমটি থেকে দ্বিতীয় চৌবাচ্চায় যেতে



জলের প্রবাহ

থাকবে। **কোন বস্তুর মধ্যস্থ তাপকে, জলের পরিমাণের সঙ্গে, আর উষ্ণতাকে জলের উচ্চতার সঙ্গে তুলনা করা যায়।** কোন বস্তুর মধ্যে কম তাপ থাকলেও ওর উষ্ণতা যদি বেশী হয়, তবে এই বস্তুটিকে আর একটি বস্তুর (যার মধ্যে তাপের পরিমাণ অনেক বেশী হলেও উষ্ণতা কম) সংস্পর্শে রাখলে প্রথম বস্তু থেকে দ্বিতীয় বস্তুর মধ্যে তাপ চলে **আসতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দুটি বস্তুর উষ্ণতা এক হয়।**

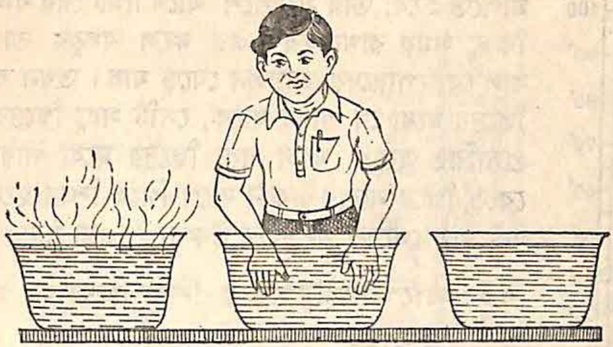
তাপ ও উষ্ণতার পার্থক্য

তাপ	উষ্ণতা
(1) তাপ হল শক্তির একটি বিশেষ রূপ।	(1) উষ্ণতা হল ঐ শক্তির প্রকাশ। বস্তুর উষ্ণতা বলতে বস্তুটির তাপীয় অবস্থা বোঝায়।
(2) কোন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে উষ্ণতা বাড়ে, অর্থাৎ তাপ হল উষ্ণতার কারণ। [**ব্যতিক্রম** : গলন এবং স্ফুটনের সময় তাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও উষ্ণতা বাড়ে না।]	(2) উষ্ণতা হল তাপের ফল।
(3) কোন বস্তুর মধ্যস্থ তাপের পরিমাণ, ঐ বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে তাপ প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করে না।	(3) যে বস্তুর উষ্ণতা বেশী সেই বস্তু থেকে কম উষ্ণতার বস্তুর মধ্যে তাপ প্রবাহিত হয়। দুটি বস্তুর উষ্ণতা এক হলে তাপ প্রবাহ বন্ধ হয়। অর্থাৎ বস্তুর উষ্ণতাই তাপ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।
(4) দুটি বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণ তাপ থাকলেও বস্তু দুটির উষ্ণতা এক হতে পারে।	(4) দুটি বস্তুর মধ্যে একই পরিমাণ তাপ থাকলেও ওদের উষ্ণতা যে একই হবে এমন কোন কথা নেই।
(5) বস্তুর মধ্যে তাপের পরিমাণ মাপা হয় ক্যালোরিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে।	(5) বস্তুর উষ্ণতা মাপা হয় থার্মোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে।
(6) কোন বস্তুর মধ্যস্থ তাপকে কোন পাত্রে রাখা জলের পরিমাণের সঙ্গে তুলনা করা হয়।	(6) কোন বস্তুর উষ্ণতাকে কোন পাত্রে রাখা জলের উপরতলের উচ্চতার সঙ্গে তুলনা করা হয়।
(7) কোন বস্তুতে মোট তাপ শক্তির পরিমাণ বস্তুটির ভর, উপাদান এবং উষ্ণতার উপর নির্ভর করে।	(7) একটি পদার্থের বিশেষ অবস্থার উষ্ণতাকে প্রমাণ ধরে, তার সঙ্গে তুলনা করে অন্য পদার্থের উষ্ণতা মাপা হয়।
(8) সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে তাপের পরিমাণ ক্যালোরি এককে প্রকাশ করা হয়।	(8) সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে উষ্ণতার একক হল ডিগ্রী সেল্সিয়াস।

6.5 উষ্ণতার পরিমাপ

আমাদের হাত দিয়ে কোন বস্তুর উষ্ণতা ঠিক বোঝা যায় না। পরবর্তী পৃষ্ঠার পরীক্ষাটি বাড়ীতে করে দেখ।

পরীক্ষাঃ তিনটি বড় পাত্র নাও। একটি পাত্রে সহ্য করতে পারা যায় এমন গরম জল, একটিতে বরফ জল ও আর একটিতে ঘরের উষ্ণতায় জল রাখা হল। এখন তোমার ডান হাতটি গরম জলের মধ্যে, আর বাম



গরম জল ঘরের উষ্ণতায় জল বরফ শীতল জল

হাতটি বরফ জলের মধ্যে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখ। তারপর একসঙ্গে ঘরের উষ্ণতায় যে জল আছে তার মধ্যে ডোবাও। দেখবে, যে হাতটি গরম জলে ছিল সেটিতে ঠাণ্ডা অনুভূতি হচ্ছে, আর যে হাতটি বরফ জলে ডোবানো ছিল সেটিতে গরম অনুভূতি হচ্ছে, কিন্তু ঐ জলের উষ্ণতা একই।

এইজন্য কোন বস্তুর উষ্ণতা যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়।

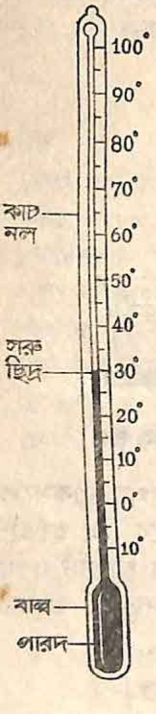
থার্মোমিটারঃ যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুর উষ্ণতা মাপা যায়, তাকে থার্মোমিটার বলে।

তরল পদার্থ তাপ গ্রহণ করলে আয়তনে বাড়ে। তরলের এই আয়তন প্রসারণ উষ্ণতার সমানুপাতিক। তরলের এই ধর্মের উপর নির্ভর করে থার্মোমিটার তৈরি করা হয়েছে। থার্মোমিটারে, অ্যালকোহল, পারদ ইত্যাদি তরলকে উষ্ণতা-নির্দেশক তরল রূপে ব্যবহার করা হয়।

● **পারদ থার্মোমিটারঃ যে থার্মোমিটারে পারদকে উষ্ণতা-নির্দেশক তরল হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাকে পারদ থার্মোমিটার বলে।**

থার্মোমিটারের বর্ণনাঃ এই যন্ত্রে খুব সরু আর **সমান ব্যাসের** ছিদ্রবিশিষ্ট একটি শক্ত কাচনল থাকে। এই নলের একপ্রান্তে পাতলা দেওয়ালবিশিষ্ট একটি বাল্‌ব থাকে। বাল্‌বের সবটুকু ও ছিদ্রের সামান্য অংশ, শুষ্ক এবং বিশুদ্ধ পারদ দ্বারা ভর্তি থাকে। নলের অপর প্রান্তটি তাপ প্রয়োগে গলিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। নলের মধ্যে ছিদ্রের বাকী

অংশে খুব সামান্য পারদ-বাষ্প থাকে। নলটির গায়ে বিভিন্ন উষ্ণতা-নির্দেশক দাগ কাটা থাকে।



পারদ থার্মোমিটার।

উষ্ণতা মাপার পদ্ধতিঃ এখন যে বস্তুর উষ্ণতা মাপতে হবে, তার সংস্পর্শে থার্মোমিটারের বাল্‌বটিকে কিছু সময় রাখা হয়। এর ফলে বস্তুর তাপ পেয়ে বাল্‌বের পারদের আয়তন বেড়ে যায়। তখন কাচনলের ছিদ্রের মধ্যে যে পারদ থাকে, সেটি সরু ছিদ্রের ভেতরে প্রসারিত হয়। ফলে সরু ছিদ্রের মধ্যে পারদ-সূত্রটি বেড়ে গিয়ে নলের একটা দাগে গিয়ে স্থির হয়ে থাকে। এই দাগ থেকেই বস্তুটির উষ্ণতা পাওয়া যায়।

6.6 থার্মোমিটারের নিম্ন-স্থিরাঙ্ক ও ঊর্ধ্ব-স্থিরাঙ্ক

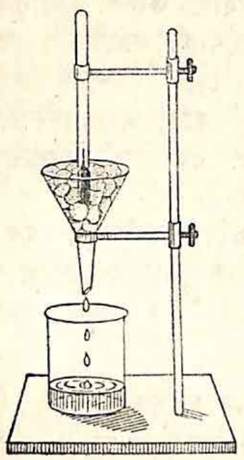
উষ্ণতা মাপার জন্য থার্মোমিটার স্কেল তৈরি করতে হলে প্রমাণ চাপে বিশুদ্ধ জলের দুটি অবস্থার উষ্ণতা নেওয়া হয়।

- **নিম্ন-স্থিরাংকঃ** প্রমাণ চাপে যে উষ্ণতায় বরফ গলে জলে পরিণত হয়, সেই উষ্ণতাকে **নিম্ন-স্থিরাংক** বলে।
- **ঊর্ধ্ব-স্থিরাংকঃ** প্রমাণ চাপে যে উষ্ণতায় জল তরল অবস্থা থেকে বাষ্পে পরিণত হয়, সেই উষ্ণতাকে **ঊর্ধ্ব-স্থিরাংক** বলে।

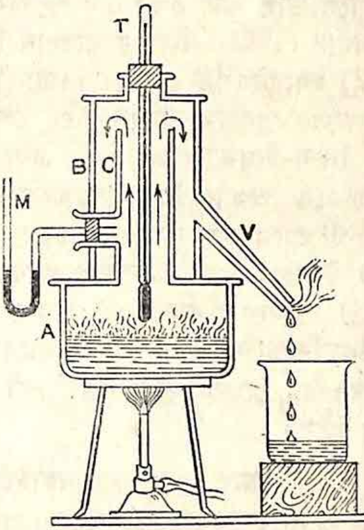
(i) **নিম্ন-স্থিরাংক নির্ণয়ঃ** একটি ফানেলে বিশুদ্ধ বরফের টুকরা রেখে ফানেলটিকে ক্ল্যাম্পের সাহায্যে স্ট্যান্ডের সঙ্গে আটকে, বরফের মধ্যে থার্মোমিটারের বাল্‌বটিকে ডুবিয়ে রাখা হয়। ফানেলের নিচে বরফ-গলা জল ধরার জন্য একটি বীকার রাখা হয়। বরফের মধ্যে থার্মোমিটারের বাল্‌বটিকে ডুবিয়ে রাখলে ঠাণ্ডায় বাল্‌বের পারদের সঙ্কোচন হয়, ফলে নলের পারদসূত্র নিচের দিকে নেমে এসে এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে। এখানে একটি দাগ দেওয়া হয় ; এই দাগটিকে **নিম্ন-স্থিরাংক বলে। প্রমাণ চাপে যে উষ্ণতায় বিশুদ্ধ বরফ গলে জল হয়, দাগটি সেই উষ্ণতা নির্দেশ করে।**

(ii) **ঊর্ধ্ব-স্থিরাংক নির্ণয়ঃ** হিপসোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে থার্মোমিটারের ঊর্ধ্ব-স্থিরাংক নির্ণয় করা হয়। এই যন্ত্রে A পাত্রে জল রাখা হয় এবং তাপ প্রয়োগে জলকে ফোটানো হয়। উপর থেকে একটি কর্কের

মধ্য দিয়ে একটি থার্মোমিটারকে ভেতরে এমনভাবে প্রবেশ করানো হয় যেন থার্মোমিটারের বাল্‌বটি জলতলের একটু উপরে থাকে। A পাত্র থেকে উৎপন্ন বাষ্প C নল দিয়ে উপরে ওঠে এবং B ও C নলের মাঝের জায়গায় অবস্থিত একটি নলের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যায়। C নলের সঙ্গে



নিম্ন-স্থিরাঙ্ক নির্ণয়।



ঊর্ধ্ব-স্থিরাঙ্ক নির্ণয়।

একটি ম্যানোমিটার M যুক্ত থাকে—এর থেকে বাইরের বায়ুচাপের সঙ্গে উৎপন্ন বাষ্পের চাপের পার্থক্য জানা যায়। থার্মোমিটারের বাল্‌বকে প্রমাণ চাপে ফুটন্ত জলের উপরে রাখা হয়। এর ফলে বাল্‌বের মধ্যে পারদের আয়তন বাড়ে। পারদ-সূত্রটি তখন উপরের দিকে উঠে যায় ও পরে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়ায়; এখানে একটি দাগ দেওয়া হয়। **এই দাগটিকে ঊর্ধ্ব-স্থিরাঙ্ক বলে। প্রমাণ চাপে যে উষ্ণতায় বিশুদ্ধ জল বাষ্পে পরিণত হয় দাগটি সেই উষ্ণতা নির্দেশ করে।**

6.7 উষ্ণতা মাপার বিভিন্ন স্কেল

● **প্রাথমিক অন্তর: থার্মোমিটারের স্থিরাঙ্ক দুটির মাঝের ব্যবধানকে মূল প্রভেদ বা প্রাথমিক অন্তর বলে।** ঊর্ধ্ব ও নিম্ন স্থিরাঙ্কের মাঝের দূরত্বকে বিভিন্ন সংখ্যক সমান অংশে ভাগ করলে, উষ্ণতার বিভিন্ন স্কেল পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি অংশকে ডিগ্রী বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উষ্ণতা মাপার জন্য তিন রকম স্কেল প্রচলিত আছে।

(1) **সেণ্টিগ্রেড স্কেল বা সেল্‌সিয়াস স্কেল:** বিজ্ঞানী এণ্ডিয়ার

সেল্‌সিয়াস উষ্ণতা মাপার জন্য এই স্কেলের প্রবর্তন করেন। এই স্কেল অনুযায়ী বরফের গলনাঙ্ককে অর্থাৎ **নিম্ন-স্থিরাঙ্ককে** 0° **সেল্‌সিয়াস** এবং প্রমাণ চাপে বিশুদ্ধ জলের স্ফুটনাঙ্ককে অর্থাৎ **ঊর্ধ্ব-স্থিরাঙ্ককে** 100° **সেল্‌সিয়াস** ধরে, এই দুই স্থিরাঙ্কের মাঝের দূরত্বকে **সমান** 100 **ভাগে ভাগ করা হয়।** এর প্রত্যেক ভাগ এক ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড বা সেল্‌সিয়াস ($1^\circ C$) উষ্ণতার ব্যবধান নির্দেশ করে।

(2) **ফারেনহাইট স্কেলঃ** বিজ্ঞানী **ফারেনহাইট উষ্ণতা** মাপার জন্য এই স্কেলের প্রবর্তন করেন। এই স্কেল অনুযায়ী বরফের গলনাঙ্ক অর্থাৎ **নিম্ন-স্থিরাঙ্ককে** 32° এবং প্রমাণ চাপে বিশুদ্ধ জলের স্ফুটনাঙ্ককে অর্থাৎ **ঊর্ধ্ব-স্থিরাঙ্ককে** 212° **ধরে,** মাঝের স্থানকে **সমান** 180 **ভাগে ভাগ করা হয়।** এর প্রত্যেক ভাগ এক ডিগ্রী ফারেনহাইট ($1^\circ F$) উষ্ণতার ব্যবধান নির্দেশ করে।

(3) **রোমার স্কেলঃ** এই স্কেল অনুযায়ী **নিম্ন-স্থিরাঙ্ককে** 0° এবং **ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ককে** 80° **ধরে,** মাঝের স্থানকে **সমান** 80 **ভাগে ভাগ করা হয়।** এর প্রত্যেক ভাগ এক ডিগ্রী রোমার ($1^\circ R$) উষ্ণতার ব্যবধান নির্দেশ করে।

● **সেল্‌সিয়াস এবং ফারেনহাইট স্কেলের সম্পর্কঃ** সেল্‌সিয়াম স্কেলের সঙ্গে ফারেনহাইট স্কেলের পাঠের সম্পর্ক নিচে দেওয়া হলঃ

সেলসিয়াস বা সেণ্টিগ্রেড স্কেলের 100 ঘর = ফারেনহাইট স্কেলের 180 ঘর অর্থাৎ, 100 সেলসিয়াস ডিগ্রীর পরিবর্তন = 180 ফারেনহাইট ডিগ্রীর পরিবর্তন।

$\therefore$ 1 সেল্‌সিয়াসে ডিগ্রীর পরিবর্তন $= \frac{180}{100} = \frac{9}{5}$ ফারেনহাইট ডিগ্রীর পরিবর্তন।

এবং 1 ফারেনহাইট ডিগ্রীর পরিবর্তন $= \frac{100}{180} = \frac{5}{9}$ সেল্‌সিয়াস ডিগ্রীর পরিবর্তন।

● এখন একই উষ্ণতার জন্য সেল্‌সিয়াস স্কেলে পাঠ C ডিগ্রী এবং ফারেনহাইট স্কেলে পাঠ F ডিগ্রী হলে বলা যায়—

C সেল্‌সিয়াস ডিগ্রী = প্রাথমিক অন্তরের $\frac{C}{100}$ ভাগ।

এখন ফারেনহাইট স্কেলে নিম্ন-স্থিরাঙ্ক = 32, তাই ঐ স্কেলে F দাগ পর্যন্ত পারদ-স্তম্ভ ওঠার মানে হল নিম্ন-স্থিরাঙ্ক থেকে $F - 32$ ভাগ উপরে ওঠা।

এখন, 1 ডিগ্রী ফারেনহাইট = প্রাথমিক অন্তরের $\frac{1}{180}$ ভাগ।

সুতরাং, F − 32 ডিগ্রী ফারেনহাইট = প্রাথমিক অন্তরের $\frac{F-32}{180}$ ভাগ, যেহেতু C এবং F একই উষ্ণতা নির্দেশ করে।

$$\frac{C}{100} = \frac{F-32}{180} \quad \text{বা,} \quad \frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$$

এই সূত্রের সাহায্যে যে কোন উষ্ণতাকে এক স্কেল থেকে অন্য স্কেলে প্রকাশ করা যায়।

উদাহরণঃ (1) কোন একটি বস্তুর উষ্ণতা 50°C ; তাহলে ঐ উষ্ণতা, ফারেনহাইট স্কেলে কত হবে?

উত্তরঃ এখানে C = 50°C

আমরা জানি,

$$\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9} \quad \text{বা,} \quad \frac{50}{5} = \frac{F-32}{9}$$

$$\text{বা,} \quad 90 = F-32 \quad \text{বা,} \quad F = 90+32$$

$$F = 122^\circ$$

(2) কোন বস্তুর উষ্ণতা সেল্‌সিয়াস স্কেলে 50° বাড়ে, তাহলে ফারেনহাইট স্কেলে ঐ উষ্ণতা কত বাড়বে?

উত্তরঃ আমরা জানি,

1 সেল্‌সিয়াস ডিগ্রী = $\frac{9}{5}$ ফারেনহাইট ডিগ্রী,

∴ 50 সেল্‌সিয়াস ডিগ্রী = $\frac{9 \times 50}{5}$ ফারেনহাইট ডিগ্রী,

= 90 ফারেনহাইট ডিগ্রী।

∴ বস্তুটির উষ্ণতা ফারেনহাইট স্কেলে 90° বাড়বে।

- **থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহার করা সুবিধাজনক কেন?**

(i) পারদ তাপের সুপরিবাহী—এর কোন অংশে তাপ প্রয়োগ করলে খুব তাড়াতাড়ি ঐ তাপ সমগ্র অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সহজেই উষ্ণ বস্তুর সমান উষ্ণতা পায়।

(ii) জল বা অন্যান্য তরলের মত পারদ কাচের গায়ে লেগে থাকে না। ফলে পারদ সরু কাচনলের মধ্যে সহজে উঠা-নামা করতে পারে।

(iii) অন্যান্য তরলের চেয়ে পারদ অনেক বেশী উষ্ণতা পর্যন্ত তরল থাকে, আবার অনেক কম উষ্ণতাতেও তরল থাকে। সুতরাং, এই বিস্তীর্ণ পাল্লার মধ্যে যে কোন উষ্ণতা, পারদ থার্মোমিটার দ্বারা মাপা যায়।

(পারদের স্ফুটনাঙ্ক = 357°C, হিমাঙ্ক = −39°C))

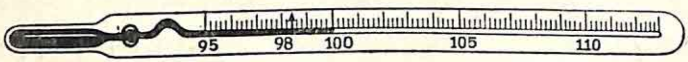
(iv) পারদ অস্বচ্ছ এবং চক্‌চকে বলে পারদের প্রসারণ কাচের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায়, এতে পাঠের সুবিধা হয়।

(v) পারদ তাপের সুপরিবাহী বলে বস্তু থেকে খুব কম তাপ গ্রহণ করেই প্রসারিত হয়। ফলে বস্তুর সঠিক উষ্ণতা পাওয়া যায়।

(vi) বিশুদ্ধ পারদ সহজলভ্য।

(vii) উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারদের আয়তন প্রসারণ একই মাত্রায় হয়।

• **ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার বা ডাক্তারী থার্মোমিটারঃ** মানুষের শরীরের উষ্ণতা মাপার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত যে থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়, তাকে **ডাক্তারী** বা **ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার বলে**।



ক্লিনিক্যাল বা ডাক্তারী থার্মোমিটার।

বর্ণনাঃ অসুস্থ অবস্থায় মানবদেহের উষ্ণতা 95°F-এর কম বা 108°F-এর বেশী হতে পারে না, তাই ডাক্তারী থার্মোমিটারে 95°F থেকে 110°F পর্যন্ত অংশাঙ্কিত করা থাকে।

সুস্থ মানুষের দেহের উষ্ণতা 98·4°F, তাই এই থার্মোমিটারে ঐ জায়গায় একটি দাগ দেওয়া থাকে। প্রত্যেক ডিগ্রীকে সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করা থাকে, ফলে প্রত্যেক ভাগের মান = 0·2°F হয়। এই থার্মোমিটারের বাল্‌বটির দেওয়াল খুব পাতলা হয়। ছিদ্রটি সমান প্রস্থচ্ছেদ-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম হয়। বাল্‌ব ও নলের ছিদ্রের মাঝে একটা বাঁকানো ছিদ্রপথ থাকে। এই অংশটি গাঁটের মত কাজ করে। থার্মোমিটারের সরু নলটি এই গাঁটের কাছে আরো সরু করা থাকে।

দেহের উষ্ণতা মাপার জন্য থার্মোমিটারের বাল্‌বটিকে জিভের নিচে প্রায় দেড় থেকে দু'মিনিট পর্যন্ত রাখা হয়। এর ফলে বাল্‌বের পারদ দেহের উষ্ণতা লাভ করে। দেহের উষ্ণতা অনুযায়ী বাল্‌বের পারদ আয়তনে বাড়ে এবং ঐ গাঁটটির ভেতর দিয়ে পারদ, নলের ছিদ্রের মধ্যে সহজে চলে যায় এবং দেহের উষ্ণতা নির্দেশ করে। এখন দেহের বাইরে থার্মোমিটারটিকে আনলে বাল্‌বের পারদ যখন সঙ্কুচিত হয় তখন নলের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যে পারদ চলে যায়, তা আর গাঁটের মধ্য দিয়ে বাল্‌বের মধ্যে ফিরে আসতে পারে না, ফলে ঐ পারদ থার্মোমিটারের উপরের অংশে নলের ছিদ্রের মধ্যেই থেকে যায়। এইজন্য শরীরের উষ্ণতা নেওয়ার পর থার্মোমিটারকে বাইরে নিয়ে এলেও পারদসূত্র নিচে নেমে আসে না—শরীরের উষ্ণতাই নির্দেশ করে। এই জাতীয় থার্মোমিটারকে **গরিষ্ঠ থার্মোমিটার বলে**।

[গরিষ্ঠ থার্মোমিটারে কোন একটি দিনের সর্বোচ্চ উষ্ণতা অনুযায়ী এর পারদ সূত্রটি প্রসারিত হয়ে উপরে উঠে যায়। এর পর দিনের উষ্ণতা কমে গেলেও পারদ সূত্রটি যতটা উপরে উঠেছিল তার নিচে আর নামে না। এর ফলে দিনের সর্বোচ্চ উষ্ণতা এই থার্মোমিটারের সাহায্যে মাপা যায়।

দিনের সর্বোচ্চ উষ্ণতা যে থার্মোমিটার থেকে পাওয়া যায়, তাকে গরিষ্ঠ থার্মোমিটার বলে।

এছাড়া **সিক্সের থার্মোমিটার** নামে একরকম থার্মোমিটার আছে যা থেকে **দিনের সর্বোচ্চ উষ্ণতা ও রাতের সর্বনিম্ন উষ্ণতার পাঠ পাওয়া যায়।**]

- **ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারের পাঠকে সেণ্টিগ্রেড স্কেলে রূপান্তরিতকরণঃ**

তোমার বন্ধুর জ্বর হয়েছে। থার্মোমিটারে দেখা গেল জ্বর 104° ; সেণ্টিগ্রেড স্কেলে জ্বর কত হবে?

উত্তরঃ যেহেতু ডাক্তারী থার্মোমিটার ফারেনহাইট স্কেলে থাকে, সুতরাং এখানে উষ্ণতা = 104°F

$\therefore \frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$ এখন $F = 104$ বসিয়ে

বা, $\frac{C}{5} = \frac{104-32}{9}$ বা, $\frac{C}{5} = \frac{72}{9}$

বা, $C = \frac{5 \times 72}{9}$ বা, $C = 40^\circ$

সেণ্টিগ্রেড স্কেলে জ্বর = **40°C**

- **ভাল সুবেদী থার্মোমিটার প্রস্তুতিতে নিচের বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখতে হয়।**

যে থার্মোমিটারে উষ্ণতার সামান্য পার্থক্য সহজে এবং কম সময়ে মাপা যায়, তাকে **সুবেদী থার্মোমিটার** বলে।

(i) থার্মোমিটারের বাল্‌বটির **দেওয়াল যেন খুব পাতলা হয়।** দেওয়ালটি পাতলা হলে সহজেই অপর বস্তুর তাপ বাল্‌বের পারদে চলে আসে।

(ii) **নলের ব্যাস এবং প্রস্থচ্ছেদ সব জায়গায় যেন সমান হয়।** তাহলে একই উষ্ণতা বৃদ্ধিতে পারদ-সূত্র সমান দৈর্ঘ্যে প্রসারিত হবে, আর তা না হলে সরু জায়গায় পারদ-সূত্রটি বেশী উঠবে, আর মোটা জায়গায় কম উঠবে; ফলে নির্ভুল স্কেল তৈরি করা কষ্টকর হবে।

(iii) **নলটি যত সরু এবং দীর্ঘ হবে, পাঠ নেওয়ার ততই সুবিধা হবে এবং দাগগুলি বেশ দূরে দূরে হবে, ফলে থার্মোমিটারটি সুবেদী হবে।**

(iv) থার্মোমিটারে ব্যবহৃত তরলটি যেন অল্প তাপ গ্রহণ করেই অন্য তরলের চেয়ে বেশী প্রসারিত হয়।

6.8 তাপ-সঞ্চালন

জল যেমন উঁচু জায়গা থেকে নিচু জায়গার দিকে প্রবাহিত হয়, তাপও সেইরকম যে জায়গার উষ্ণতা বেশী সেখান থেকে কম উষ্ণতার জায়গায় প্রবাহিত হয়।

● **এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাপের চলাচল করার ঘটনাকে তাপের সঞ্চালন বলে।**

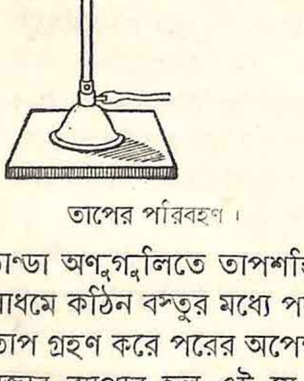
নিম্নলিখিত তিন রকম উপায়ে তাপ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সঞ্চালিত হয়—

(i) **পরিবহণ প্রণালী**, (ii) **পরিচলন প্রণালী** এবং (iii) **বিকিরণ প্রণালী**।

(1) পরিবহণ প্রণালীঃ

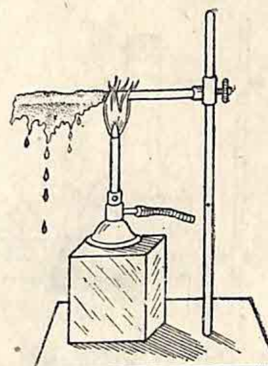
পরীক্ষাঃ একটুকরা লোহার শিক নিয়ে ওর এক প্রান্তকে বার্নারের আগুনের উপর ধরে অন্য প্রান্তটিকে হাত দিয়ে ধরে থাকা হল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল যে, লোহার শিকটির হাতে ধরে রাখা প্রান্তটি বেশ গরম হয়ে উঠেছে। তাহলে দেখা গেল, বার্নার থেকে তাপ, লোহার শিক বেয়ে হাতে এসে পৌঁছাল। একেই তাপের পরিবহণ বলে।

ব্যাখ্যাঃ এখন দেখা যাক্ কি করে তাপ হাতের কাছে এলো। লোহার শিকের যে প্রান্তটি বার্নারের উপর আছে বার্নার থেকে তাপ নিয়ে সেই অংশের অণুগুলি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, ফলে অণুগুলির কম্পন আরো বেড়ে যায়, ফলে ওদের গতিশক্তি বেড়ে যায়। এই উত্তপ্ত অণুগুলি কাঁপতে কাঁপতে পাশের শীতল অণুগুলিতে ক্রমাগত ধাক্কা দিতে থাকে, ফলে ঐ ঠাণ্ডা অণুগুলির কম্পন এবং গতিশক্তি বেড়ে যায়, ফলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পাশের অণুগুলি এইভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠার ফলে ওদের কম্পনও বেড়ে যায়, ওরা আবার ওদের পাশের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা অণুগুলিতে তাপশক্তি পৌঁছে দেয়। এইভাবে তাপশক্তি কম্পনের মাধমে কঠিন বস্তুর মধ্যে পরপর অবস্থিত অণুগুলি, উত্তপ্ত অণু থেকে তাপ গ্রহণ করে পরের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা অণুতে তাপশক্তি পৌঁছে দেয়। মজার ব্যাপার হল এই যে, তাপশক্তি এইভাবে কোন বস্তুর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছালেও বস্তুটির **কোন অণু কিন্তু নিজের জায়গা**


তাপের পরিবহণ।

ছেড়ে যায় না অর্থাৎ স্থানচ্যুত হয় না। এইভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাপ সঞ্চালন করার পদ্ধতিকে পরিবহণ প্রণালী বলে।

পরীক্ষা: একটি দীর্ঘ লোহার দণ্ডের এক প্রান্তের কিছুটা অঞ্চলে মোমের প্রলেপ দেওয়া হল। অন্য প্রান্তটিকে একটি ধারকের সঙ্গে আটকে স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে অনুভূমিক ভাবে আটকানো হল। এইবার দণ্ডটির যে প্রান্তে মোম নেই সেই প্রান্তে বার্নার দিয়ে তাপ দেওয়া হল। কিছু সময় পর দেখা গেল, অন্য প্রান্তের মোম গলে ফোঁটার আকারে নিচে পড়ছে। এখানে দণ্ডটির একপ্রান্তে তাপ দেওয়া হল—সেই তাপ পরিবহণ প্রণালীতে অন্য প্রান্তে সঞ্চালিত হয়ে মোমকে গলিয়ে দিল।



তাপ পরিবহণের পরীক্ষা।

● **পরিবহণ: যে প্রণালীতে কোন বস্তুর মধ্য দিয়ে উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে তাপ সঞ্চালিত হয়, অথবা কোন উষ্ণ বস্তু থেকে, বস্তুটির সঙ্গে যুক্ত অপর একটি শীতলতর বস্তুতে তাপ সঞ্চালিত হয় অথচ পদার্থের অণুগুলির স্থান পরিবর্তন হয় না, তাকেই পরিবহণ প্রণালী বলে। সাধারণত কঠিন পদার্থের তাপ সঞ্চালন পরিবহণ প্রণালীতে হয়।**

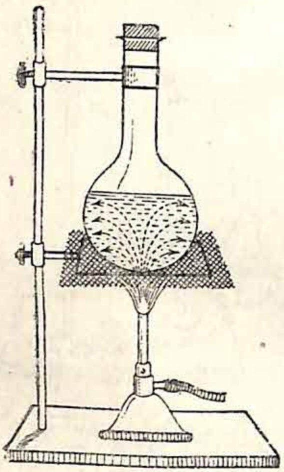
তাপের পরিবহণের জন্য (i) **জড় মাধ্যমের দরকার।** (ii) **মাধ্যমের কণাগুলি যত ঘন হয় পরিবহণও তত ভাল হয়।** তাই দেখা যায়, কঠিন **পদার্থের মধ্যে পরিবহণ প্রণালীতে তাপ সঞ্চালন হয়।**

(2) **পরিচলন প্রণালী:**

তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থে তাপ সঞ্চালন পরিচলন প্রণালীতে হয়।

পরীক্ষা: একটা গোলতল কাচের ফ্লাস্কের মধ্যে খানিকটা জল নিয়ে ওর মধ্যে সামান্য অ্যালুমিনিয়াম গুঁড়া জলে ভিজিয়ে ফেলে দেওয়া হল। অ্যালুমিনিয়ামের গুঁড়াগুলি ফ্লাস্কের তলায় গিয়ে জমা হয়। ক্ল্যাম্পের সাহায্যে ফ্লাস্কটিকে স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে আটকে ত্রিপদ স্ট্যাণ্ডে রাখা তারজালির উপর বসানো হল। এইবার ফ্লাস্কটিকে বার্নারের মৃদু শিখায় উত্তপ্ত করা হল। ফ্লাস্কটি গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল অ্যালুমিনিয়ামের চকচকে গুঁড়াগুলি ফোয়ারার মত জলের মধ্যে ফ্লাস্কের তলদেশ থেকে উঠে উপরের দিকে যাচ্ছে, আর উপরে উঠে ফ্লাস্কের দেওয়াল বেয়ে আবার নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

ব্যাখ্যা ঃ জলের কণাগুলি দৃঢ় নয়, তাই জলের মধ্যে পরিবহণ প্রণালীতে তাপ সঞ্চালন হয় না। প্রথমে পরিবহণ প্রণালী দ্বারা ফ্লাস্কের তলদেশ উত্তপ্ত হয়, এর ফলে ফ্লাস্কের তলদেশে যে জলের কণাগুলি আছে সেগুলি উত্তপ্ত হয়ে ওঠার ফলে জলের ঘনত্ব কমে যায়, তখন জলের ঐ গরম কণাগুলি হালকা হয়ে সঙ্গে তাপ নিয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। অ্যালুমিনিয়ামের গুঁড়াগুলিও এইসঙ্গে উপরের দিকে উঠে যায়। উপরের জলের কণাগুলি ঠান্ডা বলে, জলের গরম কণাগুলির চেয়ে ভারী, তাই ঠান্ডা জলের ভারী কণাগুলি ফ্লাস্কের গা বেয়ে নিচের দিকে নেমে আসে, সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠে যাওয়া অ্যালুমিনিয়ামের গুঁড়াগুলিও জলের স্রোতের সঙ্গে নেমে আসে। এই-ভাবে দুটি বিপরীতমুখী জলস্রোতের সৃষ্টি হয়—একটি ঊর্ধ্বগামী গরম স্রোত এবং অপরটি নিম্নগামী শীতল স্রোত। এইভাবে উত্তপ্ত জলকণাগুলির ওঠা-নামার দ্বারা ফ্লাস্কের সমস্ত জল ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফ্লাস্কের সব অংশের জল একই উষ্ণতায় না আসা পর্যন্ত জলস্রোতের এই রকম ওঠা-নামা চলতে থাকে। জলের মধ্যে এইভাবে সৃষ্ট স্রোতকে **পরিচলন স্রোত** বলে।



তাপের পরিচলন।

● **গ্যাসের পরিচলনঃ** একটি কাচপাত্রের মধ্যে একটি মোমবাতি জ্বেলে বসিয়ে ওর চারপাশে কিছু জল ঢালা হল। এইবার মোমবাতিকে ঘিরে একটি কাচের চিমনি জলের উপর বসানো হল। একটু পরে দেখা যাবে বাতিটি নিভে গেল। কারণ চিমনির ভেতরের গরম বাতাস হালকা হয়ে উপরের দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়—সুতরাং সেই পথ দিয়ে ঠান্ডা বাতাস চিমনির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। আবার নিচে জলের মধ্য দিয়েও ঠান্ডা বাতাস চিমনির ভেতরে ঢুকতে পারে না, ফলে অক্সিজেনের অভাবে বাতিটি নিভে যায়। এইবার T আকারের একটি টিনের পাত চিমনির মুখে মাঝামাঝি জায়গায় বসিয়ে জ্বলন্ত মোমবাতিকে ঘিরে চিমনিটি বসালে দেখা যাবে বাতি আর নিভছে না।

T পাতটি চিমনিকে দুটি প্রকোষ্ঠে ভাগ করে দেয়। একটির মধ্য দিয়ে বাইরের ঠান্ডা ভারী বাতাস চিমনির মধ্যে প্রবেশ করে এবং অন্যটির মধ্য দিয়ে চিমনির ভেতরের উত্তপ্ত এবং হালকা বাতাস বাইরে বেরিয়ে

যায়। এইভাবে চিমনির ভেতরে বায়ুর পরিচলন হয় এবং বাতাসের এই পরিচলন প্রবাহ মোমবাতিকে জ্বালিয়ে রাখে। T পাতের একদিকে একটি জ্বলন্ত ধূপকাঠি ধরলে চিমনির ভেতরের বাতাসের পরিচলন প্রবাহ পরিষ্কার দেখা যাবে।



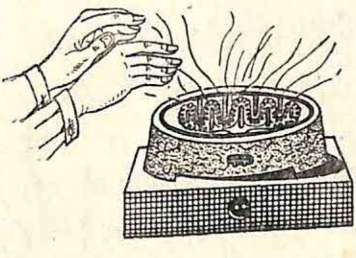
• **পরিচলনঃ যে প্রণালীতে কোন পদার্থের উত্তপ্ত কণাগুলি নিজেরাই উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে স্থান পরিবর্তন করে তাপ বয়ে নিয়ে যায়, সেই প্রণালীকে পরিচলন প্রণালী বলে।**

এই প্রণালীতে (i) **তাপ সঞ্চালনের জন্যে জড় মাধ্যমের দরকার,** (ii) **পদার্থের অণুগুলি উষ্ণতর স্থান থেকে তাপ নিয়ে শীতলতর স্থানে সেই তাপ বয়ে নিয়ে যায়,** (iii) **তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের ভেতরই এইরকম প্রণালীতে তাপ সঞ্চালন হয়।**

কঠিন পদার্থের অণুগুলি দৃঢ় বলে পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালন সম্ভব হয় না।

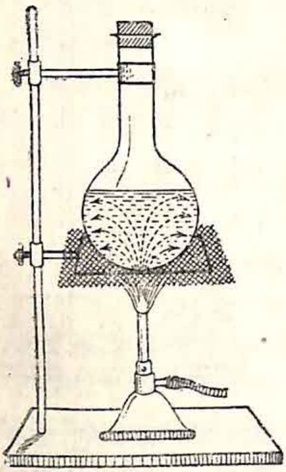
(3) **বিকিরণঃ**

পরীক্ষাঃ শীতকালে উনুনের পাশে বসে থাকলে কেমন আরাম লাগে, তাই না? কারণ উনুনের পাশে বসলে বেশ গরম লাগে কারণ উনুন থেকে তাপ তোমার কাছে চলে আসে। নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে সূর্য থেকে তাপ কোটি কোটি মাইল পথ ধরে কোন মাধ্যমের ভেতর দিয়ে না এসে, শেষে পৃথিবীর কাছাকাছি কয়েক শ' মাইল বাতাসের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে চলে আসছে। তাপ আসছে অথচ মজার ব্যাপার, যেটুকু মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আসছে, সেই মাধ্যম কিন্তু উত্তপ্ত হচ্ছে না—অর্থাৎ বাতাসের মধ্য দিয়ে সূর্যের তাপ পৃথিবীতে এলেও বায়ুস্তর গরম হয় না। এইভাবে যে প্রণালীতে তাপ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সঞ্চালিত হয়, সেই প্রণালীকে **বিকিরণ** বলে।



তাপের বিকিরণ।

ব্যাখ্যা ঃ জলের কণাগুলি দৃঢ় নয়, তাই জলের মধ্যে পরিবহণ প্রণালীতে তাপ সঞ্চালন হয় না। প্রথমে পরিবহণ প্রণালী দ্বারা ফ্লাস্কের তলদেশ উত্তপ্ত হয়, এর ফলে ফ্লাস্কের তলদেশে যে জলের কণাগুলি আছে সেগুলি উত্তপ্ত হয়ে ওঠার ফলে জলের ঘনত্ব কমে যায়, তখন জলের ঐ গরম কণাগুলি হালকা হয়ে সঙ্গে তাপ নিয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। অ্যালুমিনিয়ামের গুঁড়াগুলিও এইসঙ্গে উপরের দিকে উঠে যায়। উপরের জলের কণাগুলি ঠান্ডা বলে, জলের গরম কণাগুলির চেয়ে ভারী, তাই ঠান্ডা জলের ভারী কণাগুলি ফ্লাস্কের গা বেয়ে নিচের দিকে নেমে আসে, সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠে যাওয়া অ্যালুমিনিয়ামের গুঁড়াগুলিও জলের স্রোতের সঙ্গে নেমে আসে। এই-ভাবে দুটি বিপরীতমুখী জলস্রোতের সৃষ্টি হয়—একটি ঊর্ধ্বগামী গরম স্রোত এবং অপরটি নিম্নগামী শীতল স্রোত। এইভাবে উত্তপ্ত জলকণাগুলির ওঠা-নামার দ্বারা ফ্লাস্কের সমস্ত জল ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফ্লাস্কের সব অংশের জল একই উষ্ণতায় না আসা পর্যন্ত জলস্রোতের এই রকম ওঠা-নামা চলতে থাকে। জলের মধ্যে এইভাবে সৃষ্ট স্রোতকে **পরিচলন স্রোত** বলে।



তাপের পরিচলন।

• **গ্যাসের পরিচলনঃ** একটি কাচপাত্রের মধ্যে একটি মোমবাতি জেলে বসিয়ে ওর চারপাশে কিছু জল ঢালা হল। এইবার মোমবাতিকে ঘিরে একটি কাচের চিমনি জলের উপর বসানো হল। একটু পরে দেখা যাবে বাতিটি নিভে গেল। কারণ চিমনির ভেতরের গরম বাতাস হালকা হয়ে উপরের দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়—সুতরাং সেই পথ দিয়ে ঠান্ডা বাতাস চিমনির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। আবার নিচে জলের মধ্য দিয়েও ঠান্ডা বাতাস চিমনির ভেতরে ঢুকতে পারে না, ফলে অক্সিজেনের অভাবে বাতিটি নিভে যায়। এইবার T আকারের একটি টিনের পাত চিমনির মুখে মাঝামাঝি জায়গায় বসিয়ে জ্বলন্ত মোমবাতিকে ঘিরে চিমনিটি বসালে দেখা যাবে বাতি আর নিভছে না।

T পাতটি চিমনিকে দুটি প্রকোষ্ঠে ভাগ করে দেয়। একটির মধ্য দিয়ে বাইরের ঠান্ডা ভারী বাতাস চিমনির মধ্যে প্রবেশ করে এবং অন্যটির মধ্য দিয়ে চিমনির ভেতরের উত্তপ্ত এবং হালকা বাতাস বাইরে বেরিয়ে

যায়। এইভাবে চিমনির ভেতরে বায়ুর পরিচলন হয় এবং বাতাসের এই পরিচলন প্রবাহ মোমবাতিকে জ্বালিয়ে রাখে। T পাতের একদিকে একটি জ্বলন্ত ধূপকাঠি ধরলে চিমনির ভেতরের বাতাসের পরিচলন প্রবাহ পরিষ্কার দেখা যাবে।



• **পরিচলনঃ যে প্রণালীতে কোন পদার্থের উত্তপ্ত কণাগুলি নিজেরাই উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে স্থান পরিবর্তন করে তাপ বয়ে নিয়ে যায়, সেই প্রণালীকে পরিচলন প্রণালী বলে।**

এই প্রণালীতে (i) **তাপ সঞ্চালনের জন্যে জড় মাধ্যমের দরকার,** (ii) **পদার্থের অণুগুলি উষ্ণতর স্থান থেকে তাপ নিয়ে শীতলতর স্থানে সেই তাপ বয়ে নিয়ে যায়,** (iii) **তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের ভেতরই এইরকম প্রণালীতে তাপ সঞ্চালন হয়।**

কঠিন পদার্থের অণুগুলি দৃঢ় বলে পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালন সম্ভব হয় না।

(3) **বিকিরণঃ**

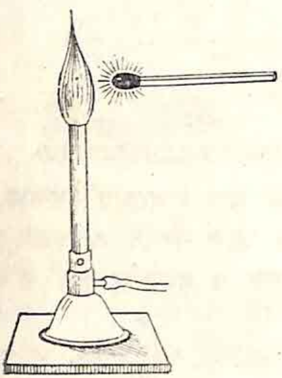
পরীক্ষাঃ শীতকালে উনুনের পাশে বসে থাকলে কেমন আরাম লাগে, তাই না? কারণ উনুনের পাশে বসলে বেশ গরম লাগে কারণ উনুন থেকে তাপ তোমার কাছে চলে আসে। নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে সূর্য থেকে তাপ কোটি কোটি মাইল পথ ধরে কোন মাধ্যমের ভেতর দিয়ে না এসে, শেষে পৃথিবীর কাছাকাছি কয়েক শ' মাইল বাতাসের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে চলে আসছে। তাপ আসছে অথচ মজার ব্যাপার, যেটুকু মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আসছে, সেই মাধ্যম কিন্তু উত্তপ্ত হচ্ছে না—অর্থাৎ বাতাসের মধ্য দিয়ে সূর্যের তাপ পৃথিবীতে এলেও বায়ুস্তর গরম হয় না। এইভাবে যে প্রণালীতে তাপ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সঞ্চালিত হয়, সেই প্রণালীকে **বিকিরণ** বলে।



তাপের বিকিরণ।

পরীক্ষাঃ একটি জ্বলন্ত বার্নারের পাশের দিকে একটু দূরে একটি দেশলাই কাঠিকে ধরা হল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল কাঠিটি জ্বলে উঠলো।

বাতাস তাপ পরিবহণ করতে পারে না, সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যায় না যে বাতাসের তাপ পরিবহণে কাঠিটি উত্তপ্ত হয়েছে। বাতাসের পরিচলন প্রণালীতেও কাঠিটি উত্তপ্ত হতে পারে না, কারণ পরিচলনে বাতাসের উত্তপ্ত কণাগুলি হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়—পাশের দিকে আসে না। কাজেই বলা যায় পরিবহণ বা পরিচলন প্রণালীতে দেশলাই কাঠিটি উত্তপ্ত হয় নি। এখানে তাপের যে সঞ্চালন পদ্ধতিতে তাপ বার্নার থেকে কাঠিতে এলো তা হচ্ছে **বিকিরণ** প্রণালী।



তাপ বিকিরণের পরীক্ষা।

• **বিকিরণঃ যে প্রণালীতে কোন বাস্তব মাধ্যম ছাড়া, অথবা মাধ্যম থাকলেও মাধ্যমকে উত্তপ্ত না করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাপ সঞ্চালিত হয়, তাকে বিকিরণ বলে। এই প্রণালীতে তাপশক্তি তরঙ্গের আকারে উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে সঞ্চালিত হয়।**

কোন তাপ, বিকিরণ প্রণালীতে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার সময় উপযুক্ত কোন ঘন পদার্থে বাধা পেলে, পদার্থটি সেই তাপের কিছুটা শোষণ করে নেয়, ফলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এইজন্য বায়ু-মণ্ডলের মধ্য দিয়ে সূর্যের তাপ, বিকিরণ প্রণালীতে পৃথিবীতে আসার সময় বায়ুমণ্ডলে বাধা পায় না, তাই বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয় না, কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠে বাধা পায়, তাই ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। (i) **তাপীয় বিকিরণ হল একরকম তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, তাই শূন্য মাধ্যমের মধ্য দিয়েও যেতে পারে।** (ii) **কাচ, কোয়ার্জ এবং কয়েকটি স্বচ্ছ কেলাসিত পদার্থের মধ্য দিয়ে বিকিরণ প্রণালীতে তাপ চলাচল করে।** (iii) ধাতব পদার্থ, কাঠ, পাথর প্রভৃতি অস্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়ে বিকিরণ প্রণালীতে তাপ চলাচল করতে পারে না।

তাপ-সঞ্চালনের তিন রকম পদ্ধতির মধ্যে তুলনাঃ

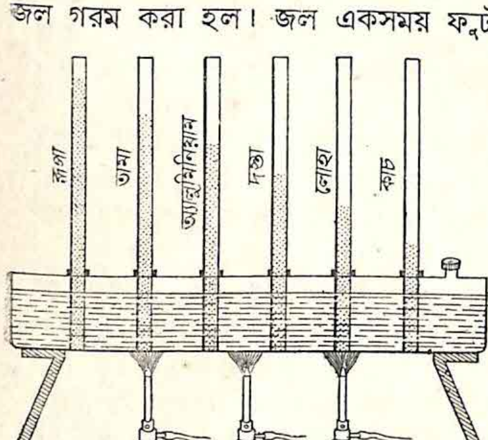
পরিবহণ প্রণালী	পরিচলন প্রণালী	বিকিরণ প্রণালী
(1) এই প্রণালীতে বস্তুর উত্তপ্ত কণাগুলি নিজের নিজের জায়গা ছেড়ে শীতলতর জায়গায় যায় না।	(1) এই প্রণালীতে উত্তপ্ত কণাগুলি নিজেরাই তাপ বহন করে শীতলতর স্থানে নিয়ে যায়।	(1) এই প্রণালীতে তাপ-শক্তি তরঙ্গের আকারে উষ্ণতর স্থান থেকে শীতলতর স্থানে যায়।
(2) কঠিন মাধ্যমের প্রয়োজন।	(2) তরল বা গ্যাসীয় মাধ্যমের প্রয়োজন।	(2) কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।
(3) এই প্রণালীতে তাপ-সঞ্চালনের বেগ কম।	(3) এই প্রণালীতে তাপ সঞ্চালনের বেগ কম।	(3) এই প্রণালীতে তাপ দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হয়। (আলোর বেগে)
(4) এই প্রণালীতে তাপ জড় পদার্থের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়।	(4) এই প্রণালীতে তাপ জড় পদার্থের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়।	(4) জড় পদার্থ ছাড়াই এই প্রণালীতে তাপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়।
(5) এই প্রণালীতে সঞ্চালিত তাপ মাধ্যমকে উত্তপ্ত করে।	(5) এই প্রণালীতে সঞ্চালিত তাপ মাধ্যমকে উত্তপ্ত করে।	(5) এই প্রণালীতে সঞ্চালিত তাপ মাধ্যমকে উত্তপ্ত করে না।
(6) পরিবহণ প্রণালীতে তাপ সরল পথে বা বক্র পথে চলে।	(6) পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ উপরের দিকে সঞ্চালিত হয়।	(6) বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ আলোর মত সব দিকে সরল রেখায় সঞ্চালিত হয়।
(7) এই পদ্ধতিতে কঠিন পদার্থ উত্তপ্ত হয়।	(7) পরিচলন পদ্ধতিতে তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থ উত্তপ্ত হয়।	(7) বিকিরণ প্রণালীতে বিকীর্ণ তাপ যে উপযুক্ত ঘন পদার্থে বাধা পায় তাকেই উত্তপ্ত করে।

6.9 পদার্থের তাপ পরিবাহিতা

বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবহণ করার ক্ষমতা বিভিন্ন হয়। সাধারণত ধাতুর তাপ পরিবহণ করার ক্ষমতা, অধাতু বা যৌগিক পদার্থের চেয়ে বেশী। সোনা, রূপা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর তাপ পরিবহণ করার ক্ষমতা কাচ, কাগজ, কাঠ, তুলা, পশম প্রভৃতির চেয়ে অনেক বেশী। একটা কাচদণ্ড হাতে নিয়ে অন্য প্রান্তটিকে বার্নারে ধরে থাক। দেখবে অনেকক্ষণ ধরে থাকলেও কাচদণ্ডের যেখানে ধরে আছ সেই জায়গাটা গরম হয় না। এখন একটি অ্যালুমিনিয়াম দণ্ড নিয়ে ঐ রকম করে দেখ, কিছুক্ষণ পরেই দেখবে যেখানে ধরেছ সেই প্রান্তটি এত গরম হয়ে উঠেছে যে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। বিভিন্ন পদার্থের তাপ

পরিবহণ করার ক্ষমতা বিভিন্ন। নিচের পরীক্ষাটি করলে বুঝতে পারবে।

পরীক্ষাঃ একটি আয়তাকার ধাতব পাত্র নেওয়া হল। এই পাত্রের একপাশে ছয়টি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলি কর্ক দিয়ে বন্ধ করে সমান ব্যাসের ও সমান দৈর্ঘ্যের রূপা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, লোহা ও কাচের তৈরি ছয়টি দণ্ডকে কর্কগুলির মধ্য দিয়ে পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করানো হল—লক্ষ্য রাখা হল, যেন পাত্রের মধ্যে প্রতিটি দণ্ডের সমান দৈর্ঘ্য ঢোকানো থাকে। এইবার দণ্ডগুলির বাইরের অংশে সমানভাবে মোমের প্রলেপ লাগিয়ে ধাতব পাত্রে জল ভর্তি করে তিনটি বার্নার দিয়ে পাত্রের জল গরম করা হল। জল একসময় ফুটতে থাকবে—দণ্ডগুলি সমান ব্যাসের সমান দৈর্ঘ্য, ফুটন্ত জলের মধ্যে থাকায় প্রত্যেকেই জলের উষ্ণতা লাভ করবে ও সমান তাপ পাবে। দণ্ডগুলির বাইরের অংশ প্রথমে ঠাণ্ডা থাকলেও পরিবহণ-প্রণালীতে ভেতরের তাপ বাইরের দিকে আসতে থাকবে। কিন্তু এক-একটি দণ্ডের তাপ-পরিবাহিতা বিভিন্ন হওয়ায়, কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে, বিভিন্ন দণ্ডের উপরে মোমের প্রলেপ বিভিন্ন দূরত্ব পর্যন্ত গলেছে। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাবে, **রূপার দণ্ডের মোম সবচেয়ে বেশী দূর পর্যন্ত গলেছে—তারপর মোম গলনের দূরত্ব তামা, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, লোহায় ক্রমশঃ কমতে কমতে কাচের দণ্ডে দেখা যাবে মোম সবচেয়ে কম দূর পর্যন্ত গলেছে।**



বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন তাপ-পরিবাহিতা।

সিদ্ধান্তঃ এতে বোঝা গেল যে, বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবাহিতা বিভিন্ন। রূপার তাপ পরিবহণ-ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী—তাই রূপার দণ্ডের মোম সবচেয়ে বেশী দূর পর্যন্ত গলেছে আর কাচের তাপ পরিবাহিতা সবচেয়ে কম, তাই মোম সবচেয়ে কম দূর পর্যন্ত গলেছে।

6.10 তাপের সুপরিবাহী এবং কুপরিবাহী পদার্থ

(i) **তাপের সুপরিবাহী পদার্থঃ যে সব পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে পরিবাহিত হয়, তাদের সুপরিবাহী পদার্থ বলে।** রূপা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, সোনা, লোহা প্রভৃতি তাপের সুপরিবাহী পদার্থ।

(ii) **তাপের কুপরিবাহী পদার্থ**ঃ **যে সব পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে পরিবাহিত হয় না, তাদের কুপরিবাহী পদার্থ বলে।** কাঠ, কর্ক, ফেল্ট, কাচ, পশম, রবার, চামড়া, কাগজ এবং প্রায় সব রকম তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ তাপের কুপরিবাহী।

(iii) **তাপের অপরিবাহী**ঃ **যাদের মধ্য দিয়ে তাপ একেবারেই পরিবাহিত হয় না, তাদের অপরিবাহী পদার্থ বলে।** শূন্য মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তাপের পরিবহণ একেবারেই হয় না—**শূন্য মাধ্যম হল অপরিবাহী।**

• **বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা বিভিন্ন—এই ঘটনা কয়েকটি পরীক্ষার সাহায্যে দেখানো হল—**

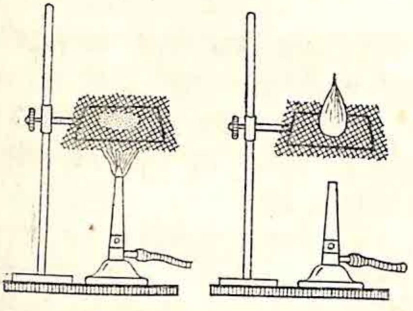
(i) **জল তাপের কুপরিবাহী**ঃ একটি বরফের টুকরাকে তার দিয়ে জড়িয়ে একটি টেস্ট-টিউবের মধ্যে রাখা হল। এইবার জল ঢেলে টেস্ট-টিউবটি ভর্তি করে একটু কাত করে হাত দিয়ে ধরে রেখে বার্নার দিয়ে টেস্ট-টিউবটির উপরের অংশ উত্তপ্ত করা হল। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে উপরের অংশের জল ফুটছে অথচ নিচের বরফ গলছে না। নিচের অংশে হাত দিয়ে দেখা গেল গরম হয় নি, ঠান্ডাই আছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জল তাপের কুপরিবাহী।



(ii) **কাচ তাপের কুপরিবাহী**ঃ একই দৈর্ঘ্যের একটি তামার দন্ড এবং একটি কাচদন্ড নিয়ে একপ্রান্ত বার্নারে ধরা হল। দেখা গেল তামার দন্ডটি তাড়াতাড়ি এত গরম হয়ে গেল যে আর ধরাই গেল না, অথচ কাচ দন্ডটির একপ্রান্ত উত্তপ্ত হয়ে লাল হয়ে গেলেও অপর প্রান্ত সামান্যই গরম হয়েছে।

(iii) **লোহা তাপের উত্তম পরিবাহী**ঃ বুনসেন বার্নার গ্যাসের সাহায্যে জ্বলে। বার্নারের মুখ দিয়ে গ্যাস বের হয়, ওতে আগুন দিলে বার্নার জ্বলতে থাকে। একটি বুনসেন বার্নার জ্বালিয়ে একটি তার-জালির নিচে রাখা হল—দেখা গেল বার্নারের শিখাটি তারজালির উপরে উঠছে না—নিচেই আছে। এর কারণ হল তারজালির লোহা তাপের উত্তম পরিবাহী বলে, লোহার তারজালিটি শিখার তাপ গ্রহণ করে চারদিকে দ্রুত সঞ্চালিত করে দেয়। এর ফলে তারজালিটির উপরের উষ্ণতা গ্যাসের জ্বলন উষ্ণতায় আসতে পারে না। তাই তারজালির উপরে আসা গ্যাস জ্বলে না।

এইবার বুনসেন বার্নারের উপর তারজালিটি রেখে বার্নারের গ্যাস খুলে দিলে, গ্যাসটি তারজালির ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তারজালির উপরে চলে আসবে। এই অবস্থায় তারজালির উপরে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ধরা হল। দেখা গেল তারজালির উপরে আসা গ্যাস জ্বলছে কিন্তু ঐ একই কারণে তারজালির নিচে থাকা গ্যাস আর জ্বলছে না। এই নীতির উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানী **হামফ্রে ডেভি** তাঁর বিখ্যাত সেফ্‌টি ল্যাম্প আবিষ্কার করেন।



(iv) **কাগজের পাত্রে জল ফোটানো**ঃ একটু পাতলা কাগজ দিয়ে দোয়াত বানিয়ে ওর মধ্যে কিছু পরিমাণ জল নিয়ে ত্রিপদ স্ট্যাণ্ডের উপর রাখা তারজালির উপর বসিয়ে বার্নার দিয়ে উত্তপ্ত করা হল। কিছু পরে দেখা গেল যে, কাগজের দোয়াতের জল ফুটছে অথচ কাগজে আগুন ধরছে না।

ব্যাখ্যাঃ এর কারণ হল, কাগজের জ্বলনাঙ্ক (যে উষ্ণতায় কাগজ জ্বলে ওঠে) জলের স্ফুটনাঙ্কের (100°C) চেয়ে অনেক বেশী। তাই বার্নারের তাপ পেলেও সেই তাপ পাতলা কাগজের মাধ্যমে দ্রুত জলের মধ্যে পরিবাহিত হয়। ফলে জলের উষ্ণতা বাড়তে বাড়তে 100°C-এ পৌঁছায়, ফলে জল ফুটতে থাকে, তাই ওর উষ্ণতা 100°C-এর বেশী হয় না, ফলে কাগজ তার জ্বলনাঙ্কে পৌঁছতে পারে না, তাই জ্বলে ওঠে না।



মোটা কাগজের পাত্রে জল রেখে বার্নার দিয়ে উত্তপ্ত করলে কিন্তু কাগজ পুড়ে যাবে। কারণ এক্ষেত্রে তাপ জলে পরিবাহিত হতে পারে না, ফলে বার্নারের সংস্পর্শে নিচের কাগজ সহজে জ্বলনাঙ্কে পৌঁছায়, ফলে কাগজ পুড়ে যায়।

(v) **পরিবহণের সাহায্যে মোমবাতি নেভানো**ঃ একটি জ্বলন্ত মোমবাতির শিখার মধ্যে একটি তামার তারের কুণ্ডলীকে ধরলে একটু পরই মোমবাতিটি নিভে যায়। তামা তাপের সুপরিবাহী, তাই তামার

তারের মধ্য দিয়ে শিখার তাপ দ্রুত সঞ্চালিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে শিখার উষ্ণতা কমে মোমের জ্বলনাঙ্কের নিচে নেমে যায়, তাই বাতিটি নিভে যায়।

6.11 তাপের পরিবহণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

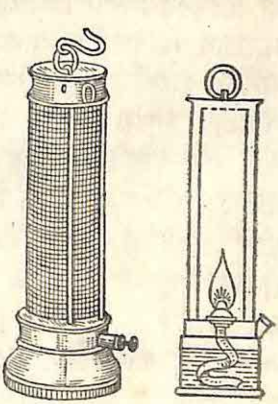
(1) **চায়ের কেটলির হাতলে বেত জড়ানো থাকে কেন?**

কেটলি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি—তাই ভাল তাপ পরিবহণ করে, ফলে তাড়াতাড়ি জল গরম হয়। উনুনে কেটলি বসালে খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়, সেইসঙ্গে হাতলটিও খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে হাতলটিতে হাত দেওয়া যায় না। বেত তাপের কুপরিবাহী—সেইজন্য হাতলটিতে বেত জড়ানো থাকলে হাতলটি ধরলেও গরম লাগে না, কারণ অ্যালুমিনিয়াম হাতলের তাপ বেতের মধ্য দিয়ে খুব কম পরিবাহিত হয়।

(2) **খড়ের ঘর গরমকালে ঠাণ্ডা আর শীতকালে গরম থাকে কেন?**

খড় তাপের কুপরিবাহী। খড়ের চাল হলে গরমকালে সূর্যের প্রচণ্ড তাপ খড়ের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়ে ঘরের ভেতরে আসতে পারে না, তাই ঘর ঠাণ্ডা থাকে। আবার শীতকালে বাইরের ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে যেতে পারে না বা ঘরের ভেতরের তাপ খড়ের মধ্য দিয়ে সহজে বাইরে যেতে পারে না ; তাই বাইরের ঠাণ্ডার তুলনায় ঘরের ভেতরটা গরম থাকে।

(3) **সেফ্‌টি ল্যাম্পঃ** কতকগুলি পদার্থ তাপের সুপরিবাহী, যেমন—তামা। পদার্থের এই গুণকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানী **হামফ্রে** ডেভি কয়লাখনির হাজার হাজার কর্মীর জীবন রক্ষা করেছেন। মার্স গ্যাস নামে একটি দাহ্য গ্যাস কয়লাখনিতে উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস আগুনের শিখার সংস্পর্শে এলেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হতো, ফলে বহু লোক ঐ দুর্ঘটনায় মারা যেতো। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা কয়লা খনির নিচে আলো নিয়ে যেতেই হতো—উপায় ছিল না—ফলে খনিতে প্রায়ই এই দুর্ঘটনা ঘটতো। বিজ্ঞানী ডেভি কাচের চিমনির বদলে তারজালি দিয়ে বাতির চিমনি তৈরি করেন। বাতির চিমনিটি তামার তার-জালির তৈরি বলে, তাপের সুপরিবাহী হওয়ায়, শলতের আগুনের তাপকে তামার তার দ্রুত চারিদিকে পরিবাহিত করে ছড়িয়ে দেয়। ফলে চিমনির বাইরের দিকটা কখনো মার্স গ্যাসের জ্বলনের উষ্ণতায় পৌঁছতে



ডেভির সেফ্‌টি ল্যাম্প।

পারে না, ফলে অগ্নিকাণ্ড হতো না। এই বাতিকে **ডেভির সেফ্‌টি ল্যাম্প** বলে।

(4) কাঠের গুঁড়া, অ্যাসবেস্টস, কাচ প্রভৃতি পদার্থগুলির তাপ পরিবহণ ও পরিচলন ক্ষমতা কম। তাই কোন পাত্রকে ঐ পদার্থগুলি দিয়ে ঢেকে রাখলে পাত্রটি থেকে তাপের পরিবহণ, পরিচলন এবং বিকিরণ প্রণালীতে তাপ সঞ্চালনের প্রবণতা অনেক কমে যায়। তাই পাত্রটিকে গরম অবস্থায় ঐ পদার্থগুলি দিয়ে ঢেকে রাখলে পাত্রটি অনেকক্ষণ গরম থাকে এবং ঠান্ডা অবস্থায় ঢাকলে অনেকক্ষণ ঠান্ডা থাকে। যেমন, বরফকে কাঠের গুঁড়া দিয়ে ঢেকে রাখলে বরফ সহজে গলে না। কাঠের গুঁড়া তাপের কুপরিবাহী, তাই বাইরের তাপ সহজে বরফের মধ্যে পরিবহণ পদ্ধতিতে আসতে পারে না।

(5) **শীতকালে সুতোর কাপড়ের চেয়ে পশমের কাপড় বেশী গরম বোধ হয়।**

শীতকালে আমরা গরম পোশাক পরি। এই পোশাক কিন্তু গরম নয়। এই পোশাক পরলে গরম লাগে বলে একে **গরম পোশাক** বলে। এই পোশাক পশমের তৈরি। পশম নিজে তাপের কুপরিবাহী, তাছাড়া পশমের আঁশগুলি আলগাভাবে থাকে এবং এর ফাঁকে ফাঁকে বেশী বাতাস আটকে থাকে। বাতাসও তাপের কুপরিবাহী। তাই পশমের পোশাক এবং ওর মধ্যস্থ বায়ু, উভয়ই তাপের কুপরিবাহী বলে এই পোশাক পরলে আমাদের শরীরের তাপ বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না বা বাইরের ঠান্ডা ভেতরে আসতে পারে না, তাই শরীর গরম থাকে। সুতোর আঁশগুলি আলগাভাবে থাকে না, তাই এর মধ্যে বায়ুস্তর আটকে থাকে না, ফলে শরীরের তাপ সহজে বাইরে বেরিয়ে যায়। এইজন্য সুতোর কাপড় পরলে ঠান্ডা বোধ হয়।

(6) একই জায়গায় রাখা একটি কাঠের চেয়ার এবং একটি লোহার চেয়ারে শীতকালে হাত দিলে লোহার চেয়ারটিকে কাঠের চেয়ারের চেয়ে বেশী ঠান্ডা মনে হয়। আবার গ্রীষ্মকালে কাঠের চেয়ারটির চেয়ে লোহার চেয়ারটিকে বেশী গরম মনে হয়, যদিও উভয় চেয়ারের উষ্ণতা একই থাকে। এর কারণ হল, লোহা তাপের সুপরিবাহী বলে শীতের দিনে একে স্পর্শ করলে, লোহার চেয়ারের উষ্ণতা হাতের উষ্ণতার চেয়ে কম থাকে বলে লোহা হাত থেকে বেশী তাপ পরিবহণ করে, ফলে ওকে বেশী ঠান্ডা মনে হয়। কাঠ তাপের কুপরিবাহী বলে হাত থেকে বেশী তাপ পরিবহণ করতে পারে না, তাই ওকে অপেক্ষাকৃত গরম মনে হয়। আবার গ্রীষ্ম-কালে লোহা বা কাঠের চেয়ারের উষ্ণতা হাতের উষ্ণতার চেয়ে বেশী থাকে। তাই লোহা কাঠের চেয়ে বেশী সুপরিবাহী বলে কাঠের চেয়ার

হাতে যে পরিমাণ তাপ পরিবহণ করবে, একই উষ্ণতায় থাকা লোহার চেয়ার তার চেয়ে অনেক বেশী তাপ পরিবহণ করবে, তাই লোহার চেয়ারকে গরমের দিনে কাঠের চেয়ারের চেয়ে বেশী উত্তপ্ত মনে হবে।

(7) শীতের দিনে পাথর বা সিমেণ্টের মেঝে খুব ঠাণ্ডা মনে হয়। পাথর বা সিমেণ্ট তাপের সুপরিবাহী, তাই দেহের তাপ সহজেই এর মধ্যে পরিবাহিত হয়, তাই ঠাণ্ডা বোধ হয়। মেঝেটি কার্পেট দিয়ে মোড়া থাকলে বেশ গরম বোধ হয়, কারণ কার্পেট হল তাপের কুপরিবাহী, তাই কার্পেটের উপর পা রাখলে দেহের তাপ সহজে এর মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয় না।

(8) পুরানো লেপের চেয়ে নতুন তৈরি লেপ গায়ে দিলে গরম বোধ হয়। এর কারণ নতুন লেপের তুলো আলগা থাকায় এর মধ্যে অনেক বাতাস আটকে থাকে। বাতাস তাপের কুপরিবাহী, তাই দেহের তাপ বাইরে বের হতে পারে না বা বাইরের ঠাণ্ডা লেপ ভেদ করে ভেতরে আসতে পারে না। পুরানো লেপের তুলো বসে যাওয়ার ফলে এর মধ্যে বেশী বাতাস আটকে থাকতে পারে না।

6.12 তাপের পরিচলন ও বায়ুপ্রবাহ

তরল আর গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় পরিচলন প্রণালীতে তাপ-সঞ্চালন হয়।

(i) কোন জায়গায় বাতাস তাপ শোষণ করলে ওর উষ্ণতা বেড়ে যায়। এর ফলে ঐ জায়গার বাতাসের আয়তন বেড়ে যায় এবং ঘনত্ব কমে যায়। আয়তন বেড়ে গেলে বাতাস হালকা হয়ে যায়, তখন ঐ হালকা বাতাস উপরের দিকে উঠে যায়।

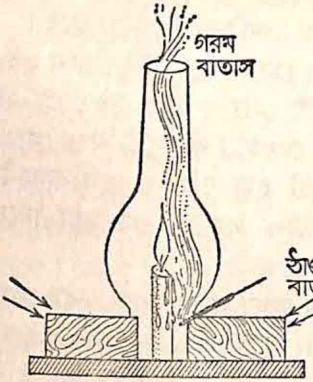
(ii) এইভাবে গরম ও হালকা বাতাস উপরের দিকে উঠে গেলে ঐ জায়গার চাপ কমে যায়। তরলের মত, চাপের সমতা রাখার জন্য আশে-পাশের ঠাণ্ডা ও ভারী বাতাস ঐ জায়গায় ছুটে আসে। এইভাবে বায়ু-প্রবাহ হয়।

• **পরীক্ষাঃ বাতাস গরম হলে হালকা হয়ে উপরে উঠে যায় আর ঠাণ্ডা বাতাস সেই জায়গায় ছুটে আসে**—এই ঘটনাটি নিচের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়।

যন্ত্রপাতিঃ একটি কাচের চিমনি, একটি মোমবাতি, দুটি কাঠের ব্লক, একটি ধূপকাঠি।

পদ্ধতিঃ দুটি কাঠের ব্লক পাশাপাশি এমনভাবে রাখা হল, যেন ওদের মাঝে কিছুটা ফাঁক থাকে। এইবার মোমবাতিটি দুটি কাঠের মাঝে বসিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হল। এখন কাচের চিমনিটি নিয়ে মোমবাতিটিকে ঘিরে কাঠ দুটির উপর বসিয়ে দিলে দেখা গেল মোমবাতিটি বেশ ভাল-

ভাবেই জ্বলছে। এখন ধূপকাঠিটি জ্বালিয়ে দেখা গেল ধোঁয়া বের হচ্ছে। এই জ্বলন্ত ধূপকাঠিটি কাঠের ব্লক দুটির মাঝের মোমবাতির নিচে ধরা হল।



পর্যবেক্ষণঃ দেখা গেল, ধূপের নীল ধোঁয়া নিচে নেমে উপরের দিকে উঠে চিমনির উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ মোমবাতির শিখায় চিমনির ভেতরের বাতাস গরম হয়ে উপরে উঠে যায়, ফলে ঐ জায়গায় বাতাসের চাপ অনেক কমে যায়। এখন মোমবাতির আশেপাশের ঠাণ্ডা ও ভারী বাতাস ঐ শূন্য জায়গা ভর্তি করতে ছুটে আসে। এইভাবে একটা বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। ধূপের ধোঁয়ার গতি দেখে এই বায়ুপ্রবাহের গতি বোঝা যায়।

তাহলে দেখা গেল, **ভূ-পৃষ্ঠের উপরে বায়ুপ্রবাহটা বড় রকমের পরিচলন-প্রণালী ছাড়া আর কিছুই নয়।** পৃথিবীর বুকে নানা জায়গায় নানা রকমের বায়ুপ্রবাহ দেখা যায়। সমুদ্রবায়ু এবং স্থলবায়ু হল একরকম বায়ুপ্রবাহ।

সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুঃ যে সব অঞ্চলে স্থলভাগের কাছেই সমুদ্র আছে সেইসব অঞ্চলে এই দুই রকম বায়ুপ্রবাহ দেখা যায়।

(a) **সমুদ্রবায়ুঃ** কঠিন পদার্থ, তরল পদার্থের চেয়ে তাড়াতাড়ি গরম হয়ে ওঠে, আবার তাড়াতাড়ি তাপ বিকিরণ করে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

দিনের বেলায় সূর্যের কিরণে জলভাগের চেয়ে স্থলভাগ তাড়াতাড়ি বেশী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এর ফলে স্থলভাগের উপরের বাতাস সেই তাপ শোষণ করে আয়তনে বাড়ে ও হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। ফলে স্থলভাগের উপরে বায়ুচাপ কমে যায়।



সমুদ্রবায়ু।

সমুদ্রের জল কিন্তু সূর্যকিরণে তখনো গরম হয় না—অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডাই থাকে, ফলে সমুদ্রের উপরের বাতাস ঠাণ্ডা ও ভারী থাকে। স্থলভাগের বাতাস হালকা হয়ে উপরে উঠে গেলে সমুদ্রের উপরের ঠাণ্ডা ও ভারী বাতাস স্থলভাগের দিকে ছুটে আসে ঐ শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য। এর ফলে সমুদ্রের দিক থেকে স্থলভাগের দিকে বায়ু-প্রবাহ হতে থাকে। এইরকম বায়ুপ্রবাহকে সমুদ্রবায়ু বলে। বিকালের দিকে এইরকম বায়ুপ্রবাহ হয়। শীতকাল ছাড়া অন্য সময় বিকালের দিকে কলকাতার উপর দিয়ে সমুদ্রের দিক থেকে—অর্থাৎ দক্ষিণ দিক থেকে **সমুদ্রবায়ু** বয়ে যায়।

(b) **স্থলবায়ুঃ** সারাদিন কিরণ দেওয়ার পর সূর্য ডুবে গেলে স্থলভাগ তাড়াতাড়ি তাপ বিকিরণ করে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সমুদ্রের জল কিন্তু সেই হারে তাপ বিকিরণ করতে পারে না। তাই বেশী রাতের দিকে স্থলভাগ যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়ে যায়, কিন্তু সমুদ্রের উপরের বায়ু তখনো গরম থাকে। ফলে সমুদ্রের উপরের বাতাস গরম হয়ে হালকা হয় ও উপরের দিকে উঠে যায়। এই সময় স্থলভাগ ঠাণ্ডা থাকায় ওর উপরের বাতাস ঠাণ্ডা থাকে, এই ঠাণ্ডা ও ভারী বাতাস তখন সমুদ্রের দিকে ছুটে যায়। এর ফলে স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে বায়ুপ্রবাহ হতে শুরু করে, একেই স্থলবায়ু বলে। কলকাতায় গভীর রাতের পর থেকে এইরকম বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রের দিকে ছুটে চলে।



স্থলবায়ু

6.13 বস্তুর বিভিন্ন তাপ বিকিরণের ক্ষমতাভেদে কয়েকটি সাধারণ ঘটনার ব্যাখ্যা

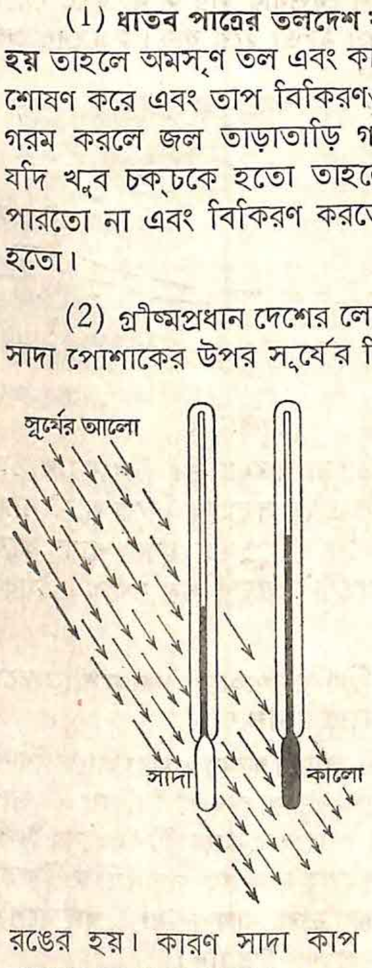
প্রত্যেক পদার্থের তাপ বিকিরণ ও শোষণ করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু বিভিন্ন বস্তুর তাপ শোষণ ও বিকিরণ করার ক্ষমতা বিভিন্ন। তাপ বিকিরণ করার ও শোষণ করার ক্ষমতা পদার্থের কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন—(i) **পারিপার্শ্বিকের তুলনায় পদার্থটির উষ্ণতা,** (ii) **বস্তুর পৃষ্ঠতলের প্রকৃতি (চকচকে মসৃণ বা খসখসে),** (iii) **বস্তুর উপাদান** এবং (iv) **বস্তুর বর্ণ** ইত্যাদি।

সাধারণভাবে দেখা গেছে, **যে সব পদার্থ বেশী তাপ বিকিরণ করতে**

পারে তাদের তাপ শোষণ করার ক্ষমতাও বেশী। আবার যে সব পদার্থ তাপ বিকিরণ ভাল করতে পারে না, তাদের তাপ শোষণ ক্ষমতাও কম। যেমন—(i) **কালো রঙের বস্তু** যেমন তাপ শোষণ করে, তাপ বিকিরণও তেমনি করতে পারে ; আবার সাদা রঙ বা চক্‌চকে বস্তু তাপ শোষণ করে কম আর বিকিরণও কম করে। এই জাতীয় বস্তু তাপ প্রতিফলিত করে দেয়। (ii) যে সব বস্তুর **পৃষ্ঠদেশ অমসৃণ** সেগুলি ভাল তাপ শোষক এবং ভাল তাপ বিকিরক। (iii) বস্তুর উষ্ণতা বাড়লে বিকিরণ ক্ষমতা বাড়ে। বিকীর্ণ তাপের এই নীতির প্রয়োগ আমাদের চারপাশের ঘটনার মধ্যে দেখা যায়।

(1) **ধাতব পাত্রের তলদেশে যদি অমসৃণ হয় আর ভুসাকালি মাখানো হয়** তাহলে অমসৃণ তল এবং কালো রঙ হওয়ার জন্য পাত্রটি বেশী তাপ শোষণ করে এবং তাপ বিকিরণও বেশী করে, ফলে এইরকম পাত্রে জল গরম করলে জল তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়। রান্নার হাঁড়ির তলদেশ যদি খুব চক্‌চকে হতো তাহলে হাঁড়িটি বেশী তাপ শোষণ করতে পারতো না এবং বিকিরণ করতেও পারতো না, ফলে রান্না হতে দেরি হতো।

(2) গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকেরা সাদা পোশাক ব্যবহার করে, কারণ সাদা পোশাকের উপর সূর্যের বিকীর্ণ তাপের বেশীর ভাগ প্রতিফলিত হয়, খুব কম অংশ শোষিত হয়, ফলে শরীরে বেশী গরম লাগে না। কিন্তু শীতের দেশের লোকেরা কালো পোশাক পরে। কালো রঙের পোশাক বেশী করে সূর্যের বিকীর্ণ তাপ শোষণ করে আর বেশী তাপকে ভেতরের দিকে বিকিরণ করে দেয়, ফলে শরীর গরম থাকে।



(3) (i) বাইরের দিকে সাদা চুনকাম করা দেওয়ালে সূর্যের তাপকে বেশী করে প্রতিফলিত করে, ফলে কম তাপ শোষিত হয়। এইজন্য ঘরের ভেতরটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকে। (ii) চায়ের কাপ সাদা রঙের হয়। কারণ সাদা কাপ থেকে তাপের বিকিরণ কম হয়, ফলে কাপের চা গরম থাকে।

(4) দুটি সেণ্টিগ্রেড স্কেলের থার্মোমিটার নিয়ে, একটির

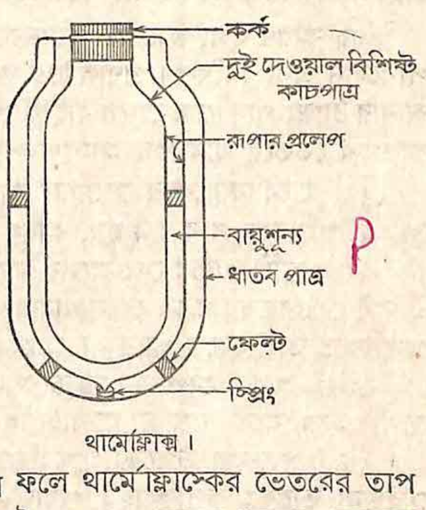
বাল্‌বটিতে কালো রঙ করে দেওয়া হল এবং অন্যটিতে সাদা রঙ করে দেওয়া হল। এইবার থার্মোমিটার দুটিকে রোদের মধ্যে পাশাপাশি রেখে দিলে কিছুক্ষণ পর দেখা গেল কালো রঙ লাগানো থার্মোমিটারটির পাঠ অন্যটির চেয়ে বেশী হয়েছে। এর কারণ হল, কালো রঙ লাগানো বাল্‌বটি রোদ থেকে বিকীর্ণ তাপ বেশী সংগ্রহ করেছে এবং ঐ বিকীর্ণ তাপ থার্মোমিটারকে দিয়েছে।

(5) তোমরা দেখে থাকবে পেট্রোলের বড় বড় ট্যাঙ্কগুলির উপর অ্যালুমিনিয়ামের চক্‌চকে সাদা রঙ দেওয়া থাকে। কারণ চক্‌চকে সাদা রঙ সূর্যের বিকীর্ণ তাপকে প্রতিফলিত করে দেয়; ফলে ট্যাঙ্ক কম উত্তপ্ত হয়।

(6) **মেঘাচ্ছন্ন দিনে গরম লাগে কেন?**—সূর্য থেকে বিকিরিত তাপের প্রায় সবটাই মেঘ শোষণ করতে পারে—মেঘের তাপ শোষণ ক্ষমতা বেশী। তাই মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমাদের গরম লাগে। মেঘশূন্য পরিষ্কার দিনে সূর্যের বিকিরিত তাপ বাতাস শোষণ করতে পারে না—তাই মেঘ-শূন্য দিনে অতটা গরম লাগে না। ভূ-পৃষ্ঠের বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেলে শিশির পড়ে। তাই দেখা যায়—শীতকালে মেঘাচ্ছন্ন রাতে শিশির কম পড়ে।

6.14 থার্মোফ্লাস্ক

একটা বাটিতে গরম চা রাখলে কিছুক্ষণ পর দেখবে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এর কারণ চায়ের তাপ, **পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ**—এই তিনটি তাপ-সঞ্চালন প্রণালী দ্বারা অন্য জায়গায় চলে যায়। এখন যদি তাপ চলাচলের এই তিন রকম প্রণালীকে কোন উপায়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে দেখা যাবে, গরম চা অনেকক্ষণ পর্যন্ত গরম থাকবে। থার্মোফ্লাস্ক হল এই রকম একটি পাত্র, যার ভেতর থেকে এই তিন রকম প্রণালী দ্বারা তাপের বাইরে চলে যাওয়া বা বাইরের তাপের ভেতরে আসার ব্যবস্থাকে কমিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে থার্মোফ্লাস্কের ভেতরের তাপ সহজে বাইরে যেতে পারে না বা বাইরের তাপ সহজে ভেতরে আসতে



থার্মোফ্লাস্ক।

পারে না। ফলে এর মধ্যে গরম বা ঠাণ্ডা পানীয় রেখে অনেকক্ষণ পরও ব্যবহার করা যায়।

বর্ণনাঃ (i) থার্মোফ্লাস্ক হল দুই দেওয়ালবিশিষ্ট কাচপাত্র। কাচ **তাপের কুপরিবাহী।** সেইজন্য এই কাচ দিয়েই থার্মোফ্লাস্কের দুটি দেওয়াল তৈরি। (ii) এই দুটি দেওয়ালের মাঝে যে বাতাস থাকে, বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র দিয়ে তা বের করে নিয়ে ঐ ফাঁকা অংশটি বায়ুশূন্য করা হয়। **কাজেই দুই দেওয়ালের মাঝে কোন মাধ্যম না থাকায় পরিচলন প্রণালীতে তাপ চলাচল বাধা পায়।** (iii) পাত্রের ভেতরের কাচের দেওয়ালের বাইরের তলে ও বাইরের দেওয়ালের ভেতরের তলে রূপার প্রলেপ লাগিয়ে চকচকে করা থাকে। **দেওয়াল চকচকে থাকার ফলে বিকিরণ প্রণালীতে ভেতরের তাপ বাইরে আসতে পারে না বা বাইরের তাপ ভেতরে যেতে পারে না।** (iv) ফ্লাস্কের মুখটি তাপের কুপরিবাহী পদার্থ—একটি কর্কের ছিপি দ্বারা বন্ধ করা থাকে। (v) সমস্ত ফ্লাস্কটি একটি ধাতুর তৈরি পাত্রের মধ্যে রাখা হয়। পাত্র ও কাচের দেওয়ালের মাঝের অংশটি তাপের কুপরিবাহী ফেল্ট বা তুলো দিয়ে ভর্তি করা থাকে, এর ফলে ফ্লাস্কের মধ্যস্থ পদার্থের তাপকে ফ্লাস্ক ধরে রাখতে পারে। কাচের ফ্লাস্কটি যেন ভেঙে না যায়, সেজন্য একটি স্প্রিং-এর উপর একে বসিয়ে রাখা হয়।

● থার্মোফ্লাস্কের মধ্যে গরম পানীয় গরম থাকে আবার ঠাণ্ডা পানীয় অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঠাণ্ডা থাকে কেন?

এর কারণ হল, ফ্লাস্কের মধ্যে রাখা গরম পানীয় থেকে পরিবহণ, পরিচলন এবং বিকিরণ প্রণালীতে তাপের সঞ্চালন অনেক কমে যায়। আবার ঠাণ্ডা পানীয়ের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে তাপ ঐ তিন রকম প্রণালীতে ফ্লাস্কের ভেতরে খুব কম আসতে পারে।

(i) থার্মোফ্লাস্কের দেওয়াল কাচ দিয়ে তৈরি বলে ওর মধ্য দিয়ে তাপের পরিবহণ খুব কম হয়, কারণ কাচ তাপের কুপরিবাহী।

(ii) দুটি কাচের দেওয়ালের মাঝের ফাঁকা স্থানটি বায়ুশূন্য বলে ঐ দুই দেওয়ালের মাঝে কোন মাধ্যম থাকে না, ফলে ওর মধ্যে পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ যেতে পারে না বা বের হতে পারে না।

(iii) কাচের দেওয়াল চকচকে বলে বিকিরণ প্রণালীতে ভেতরের তাপ বাইরে যেতে পারে না বা বাইরের তাপ ভেতরে যেতে পারে না।

(iv) ফ্লাস্কের উপরের মুখ দিয়ে যেন তাপ চলে যেতে না পারে সেইজন্য তাপের কুপরিবাহী পদার্থ—কর্কের ছিপি দিয়ে বন্ধ করা থাকে।

(v) কাচপাত্র ও দেওয়ালের মাঝে তাপের কুপরিবাহী ফেল্ট বা তুলো দিয়ে ভর্তি করা থাকে বলে ফ্লাস্কের ভেতরের পদার্থটি নিজের তাপ ধরে রাখতে পারে।

প্রশ্নাবলী

1. **জ্ঞানমূলক ঃ**

(i) তাপ কি ?
(ii) তাপ প্রয়োগের ফলে পদার্থের কি কি পরিবর্তন দেখা যায় ?
(iii) উষ্ণতা কাকে বলে ?
(iv) পারদ থার্মোমিটার কি ?
(v) উষ্ণতা মাপার জন্য কয় রকম এবং কি কি স্কেল ব্যবহৃত হয় ?
(vi) থার্মোমিটারের নিম্ন-স্থিরাঙ্ক বলতে কি বোঝ ?
(vii) থার্মোমিটারের মূল প্রভেদ কি ?
(viii) তাপের সুপরিবাহী এবং কুপরিবাহী কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।
(ix) পরিচলন স্রোত কি ?
(x) তাপ বলতে কি বোঝ ? তাপ যে একরকম শক্তি তা কি করে জানা যায় ?
(xi) বস্তুর উষ্ণতা বলতে কি বোঝ ?
(xii) থার্মোমিটার কি ? থার্মোমিটারের নিম্ন-স্থিরাঙ্ক ও ঊর্ধ্ব-স্থিরাঙ্ক বলতে কি বোঝ ? এই দুই স্থিরাঙ্কের মাঝের দূরত্বকে কি বলে ?
(xiii) উষ্ণতার স্কেল বলতে কি বোঝ ?
(xiv) গরিষ্ঠ থার্মোমিটার কি ? ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারের বর্ণনা দাও।
(xv) তাপ সঞ্চালন বলতে কি বোঝ ? কত রকম ভাবে তাপ সঞ্চালন হয় ?
(xvi) তাপের বিকিরণ কাকে বলে ?
(xvii) স্থলবায়ু এবং সমুদ্রবায়ু কাকে বলে ?

2. **বোধমূলক ঃ**

(i) কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে উষ্ণতা মাপা হয় ?
(ii) তাপ সঞ্চালনের কোন্ প্রণালীতে বস্তুর কণাগুলি নিজেই উত্তপ্ত হয়ে স্থান পরিবর্তন করে ?
(iii) সূর্য থেকে কোন্ প্রণালীতে পৃথিবীতে তাপ আসে ?
(iv) দিনের বেলায় সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে বায়ুপ্রবাহ হয় কেন ?
(v) কালো রঙের বস্তু এবং সাদা রঙের বস্তুকে একসঙ্গে রোদে রাখলে কোন্‌টি বেশী উত্তপ্ত হবে এবং কেন ?
(vi) চকচকে হাঁড়িতে রান্না করলে কি অসুবিধা হতো ?
(vii) লোহা এবং কাঠ—দুটির মধ্যে কোন্‌টি তাপের সুপরিবাহী ?
(viii) তাপ ও উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।

(ix) উষ্ণতা মাপার জন্য কত রকম স্কেল প্রচলিত আছে ? তাদের বর্ণনা দাও। সেল্সিয়াস এবং ফারেনহাইট স্কেলের সম্পর্ক কি ?

(x) ডাক্তারী থার্মোমিটারে কোন্ স্কেল দেওয়া থাকে ? এই থার্মোমিটারকে ফুটন্ত জলে দিলে কি হবে ?

(xi) থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহার করা সুবিধাজনক কেন ? একটি সুবেদী থার্মোমিটারের কি কি গুণ থাকা দরকার ?

(xii) পরিবহণ প্রণালী দ্বারা কিভাবে তাপ সঞ্চালন হয় ? একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।

(xiii) তাপ পরিচলন হয় কিভাবে ? উদাহরণ দাও।

(xiv) দেখাও যে, তাপ বিকিরণের জন্য কোন মাধ্যমের দরকার হয় না।

(xv) সূর্য পৃথিবী থেকে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে—এই বিরাট দূরত্বের মাঝে কোন পদার্থ নেই—সবটাই শূন্য। তাহলে সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাপ আসে কি করে ?

(xvi) কি জাতীয় বস্তু বিকীর্ণ তাপে উত্তপ্ত হয় ? জ্বলন্ত উনুনের পাশে দাঁড়ালে গরম লাগে—উনুনটির উপরের দিকে আরো বেশী গরম লাগে কেন ?

(xvii) সমুদ্রবায়ু প্রবাহের তীব্রতা কখন বাড়ে এবং কেন ?

(xviii) শীতকালে পশমের পোশাক গরম বোধ হয় কেন ?

(xix) রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা পুলিসের ছাতা সাদা হয় কেন ?

(xx) শীতকালে পুকুরের জল গরম থাকে কেন ?

(xxi) বরফকে কাঠের গুঁড়ার মধ্যে রাখা হয় কেন ?

(xxii) থার্মোফ্লাস্কের ভেতরের দেওয়াল চক্চকে হয় কেন ?

(xxiii) গরমকালে সাদা পোশাক আরাম লাগে কেন ?

(xxiv) কেটলির হাতল বেত দিয়ে মোড়া থাকে কেন ?

(xxv) গ্রীষ্মকালে খড়ের ঘরের ভেতরে ঠাণ্ডা থাকে, আবার শীতকালে বেশ গরম থাকে কেন ?

(xxvi) মসৃণ মেঝে, অমসৃণ মেঝের চেয়ে ঠাণ্ডা হয় কেন ?

(xxvii) রান্নার হাঁড়ির তলদেশ অমসৃণ এবং কালো রং করা থাকে কেন ?

(xxviii) ডাক্তারী থার্মোমিটারে 98·4-এর কাছে একটি তীরচিহ্ন থাকে কেন ? এই থার্মোমিটারে পারদ-সূত্র উত্তপ্ত হয়ে একবার উঠে গেলে যখন ঠাণ্ডা হয় তখন পারদ-সূত্র সঙ্কুচিত হয়ে আবার কুণ্ডলীতে ফিরে যায় না কেন ?

(xxix) যেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে সেদিন গরম লাগে কেন ?

(xxx) চায়ের কাপ সাদা হয় কেন ? কালো হলে ক্ষতি কি হতো ?

(xxxi) থার্মোফ্লাস্কের গাত্রে দুই দেওয়ালের মাঝের অংশটি বায়ুশূন্য করা হয় কেন ?

(xxxii) বুন্সেন বার্নারে আগুন দিয়ে উৎপন্ন শিখাটির উপর একটি তারজালি রাখলে শিখাটি তারজালির উপরে উঠে না কেন

(xxxiii) শীতকালে সিমেণ্টের মেঝে ঠাণ্ডা বোধ হয় কেন ?

(xxxiv) থার্মোমিটারের নলের প্রস্থচ্ছেদ সর্বত্র সমান রাখা হয় কেন ?

3. **প্রয়োগমূলক :**

(i) সেল্সিয়াস স্কেলে 5° উষ্ণতা বৃদ্ধি হলে ফারেনহাইট স্কেলে কত উষ্ণতা বৃদ্ধি হবে ?

(ii) থার্মোমিটারের নলটির ব্যাস সমান না হলে কি অসুবিধা হতো ?

(iii) লোহার শিকের একপ্রান্ত বার্নারে ধরা হল। কিছুক্ষণ পর যে প্রান্ত হাতে ধরা হয়েছিল সেই প্রান্তটি গরম হয়ে গেল—কি প্রণালীতে তাপ এলো ?

(iv) একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাও যে দুটি বস্তুর উষ্ণতা এক হলেও তাপের পরিমাণ বিভিন্ন হয়।

(v) তোমার বন্ধুর গায়ে জ্বর দেখা গেল 100°। সেল্সিয়াস স্কেলে তোমার বন্ধুর জ্বর কত নির্ণয় কর।

(vi) পরিচলন কিভাবে হয় পরীক্ষার সাহায্যে বিষয়টি বুঝিয়ে দাও।

(vii) পরিবহণ, পরিচলন এবং বিকিরণ প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য কি ?

(viii) বিভিন্ন পদার্থে একই তাপ প্রয়োগ করলেও উষ্ণতা এক হবে না—একটি পরীক্ষার সাহায্যে উক্তিটির সত্যতা প্রমাণ কর।

(ix) 'বিভিন্ন বস্তুর তাপ পরিবহণ ক্ষমতা এক নয়'—উপযুক্ত পরীক্ষার সাহায্যে দেখাও।

(x) বিভিন্ন বস্তুর তাপ শোষণ এবং বিকীর্ণ করার ক্ষমতা বিভিন্ন—উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

(xi) একটি বস্তুর উষ্ণতা 40°C। ফারেনহাইট স্কেলে বস্তুটির উষ্ণতা-পাঠ কত হবে ? [Ans. 104°F]

(xii) তুমি শীতকালে পশমের পোশাক পর কেন ?

(xiii) রাস্তায় রোদে দাঁড়ানো পুলিসের মাথার হেলমেট সাদা রং-এর ও চক্চকে হয় কেন ?

(xiv) গরম জল তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করতে হলে তুমি সাদা বাটি না কালো বাটিতে গরম জলটি রাখবে ?

(xv) একই আকারের একটি কালো এবং একটি সাদা রঙের বাটিতে একই উষ্ণতায় একই পরিমাণ গরম দুধ আছে—কোন্টি আগে ঠাণ্ডা হবে কারণ সহ বল।

(xvi) একটি 5 গ্রাম ভরের লোহার গোলকের উষ্ণতা 400°C, একটি পাত্রের 2 কিগ্রা জলের উষ্ণতা 80°C, গোলকটিকে পাত্রের জলে ফেললে কে তাপ দেবে এবং কে তাপ নেবে ? কার উষ্ণতা বাড়বে এবং কার উষ্ণতা কমবে ?

(xvii) A পদার্থের মধ্যে অনেক বেশী তাপ আছে, B পদার্থের মধ্যে কম তাপ আছে। A এবং B-কে পরস্পরের সংস্পর্শে রাখলে B থেকে A-তে তাপ পরিবাহিত হয়। কার উষ্ণতা বেশী—A-এর না B-এর ?

4. **দক্ষতামূলক :**

(i) চিত্র এঁকে স্থলবায়ুর গতির অভিমুখ দেখাও।

(ii) চিত্র এঁকে সমুদ্রবায়ুর গতির অভিমুখ দেখাও।

(iii) পরিষ্কার ছবি এঁকে একটি থার্মোফ্লাস্কের গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
(iv) তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থের পরিচলন স্রোত দেখাবার জন্য পরীক্ষা বর্ণনা কর।

Objective type Questions :

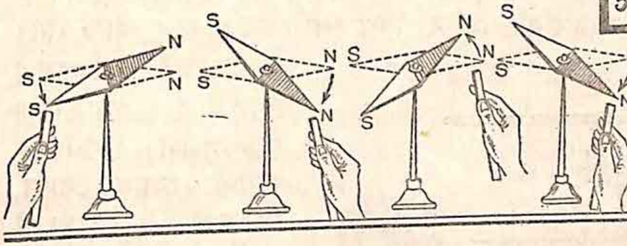
1. **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(i) কোন বস্তু থেকে তাপ বেরিয়ে গেলে তার — কমে।
(ii) বেশী উষ্ণতাবিশিষ্ট বস্তু থেকে — উষ্ণতাবিশিষ্ট বস্তুতে তাপ যায়।
(iii) — পদ্ধতিতে তাপ-সঞ্চালনে বস্তুর কণার স্থান পরিবর্তন হয় না।
(iv) যে প্রণালীতে কোন বস্তুর — অংশের কণা — অংশে তাপ বয়ে নিয়ে যায়, তাকে তাপের — প্রণালী বলে।
(v) তাপ হল — এবং উষ্ণতা হল তার —।
(vi) প্রমাণ চাপে জলের স্ফুটনাঙ্ক —।
(vii) 1 সেল্সিয়াস ডিগ্রী = — ফারেনহাইট ডিগ্রী।
(viii) সুবেদী থার্মোমিটারের নলটি খুব — এবং — হবে।
(ix) তাপের বিকিরণের জন্য মাধ্যমের — হয় না।

2. **সঠিক উত্তরগুলিতে '✓' চিহ্ন দাও ঃ**

(i) কালো রং-এর বস্তু তাপ শোষণ করতে পারে/পারে না।
(ii) বিকিরণ প্রণালীতে তাপ-সঞ্চালনের মাধ্যম উত্তপ্ত হয়/হয় না।
(iii) উষ্ণতা বাড়লে কোন বস্তুর তাপ কমে/বাড়ে।
(iv) সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাপ আসে পরিবহণ/পরিচলন/বিকিরণ প্রণালীতে।
(v) চক্চকে ও মসৃণ তল তাপ বিকিরণ করতে পারে/পারে না।
(vi) জলের হিমাঙ্ক 32°F/100°C/0°C।
(vii) তাপ হল একরকম শক্তি/পদার্থ।
(viii) কোন বস্তুর উপর তাপ প্রয়োগ করলে আয়তন বাড়ে/কমে/একই থাকে।
(ix) ডাক্তারী থার্মোমিটারে সেল্সিয়াস/ফারেনহাইট স্কেলে দাগ কাটা থাকে।
(x) সূর্যের তাপ পৃথিবীতে আসার সময় বায়ুস্তর গরম হয়/ঠাণ্ডা হয়/একই থাকে।
(xi) তামার চেয়ে কাচের তাপ পরিবাহিতা কম/বেশী।
(xii) কাঠ তাপের সুপরিবাহী/কুপরিবাহী।
(xiii) গরম বাতাসের ঘনত্ব ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে কম/বেশী।
(xiv) স্থলভাগের চেয়ে জলভাগের তাপ বিকিরণের হার বেশী/কম।
(xv) ফারেনহাইট থার্মোমিটারে মূল প্রভেদকে সমান 100/180/80 ভাগে ভাগ করা থাকে।
(xvi) থার্মোফ্লাস্কের ভেতরের দেওয়াল চক্চকে করা হয় তাপের বিকিরণ/পরিবহণ/পরিচলন বন্ধ করার জন্য।

সপ্তম অধ্যায়

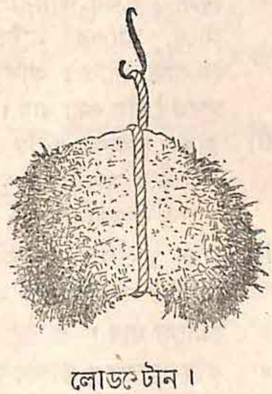


চুম্বক (MAGNET)

7.1 চুম্বক

সওদাগরপুত্র চলেছেন নীল সাগরের বুকে জাহাজে সাদা পাল উড়িয়ে দেশ থেকে বিদেশে বাণিজ্য করতে। হঠাৎ দেখা গেল, জাহাজ আর মাঝিদের আয়ত্তে নেই, ছুটে চলেছে দূরের ঐ বাদামী রঙের পাহাড়ের দিকে তীব্রবেগে, কেউ তাকে বাগে আনতে পারছে না। শেষে প্রচণ্ড বেগে ঐ পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ চুরমার হয়ে গেল। রূপ-কথার গল্প নয়, সত্যিকারের এরকম পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়টি এক-রকম পাথরে ভর্তি। এই পাথরগুলি হল লোহা আর অক্সিজেনের একটি যৌগ, নাম তার **ম্যাগনেটাইট** (Fe_3O_4)।

(i) **প্রাকৃতিক চুম্বক (লোডস্টোন)**ঃ প্রকৃতির মধ্যে যে ম্যাগনেটাইট পাথর পাওয়া যায়, তাকে **লোডস্টোন** বলে। লোডস্টোন দেখতে পাথরের মত এবং **লোহাকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে**। তাছাড়া, একটুকরা ম্যাগনেটাইটকে সুতায় বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে দেখা যায়, পাথরটি উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে—অর্থাৎ এর **দিগ্‌দর্শী ধর্ম আছে**। এই পাথরই হল **প্রাকৃতিক চুম্বক**। প্রাকৃতিক চুম্বকের দিগ্‌দর্শী ধর্মের জন্য প্রাচীনকালে মহাসাগরের বুকে যে সব নাবিক সাগর পাড়ি দিত, তারা দিক্ নির্ণয়ের জন্য এইরকম প্রাকৃতিক চুম্বক ব্যবহার করতো। তাই এর নাম দিগ্‌দর্শী পাথর বা leading stone ; কালক্রমে এর থেকেই লোডস্টোন কথাটির উৎপত্তি হয়।

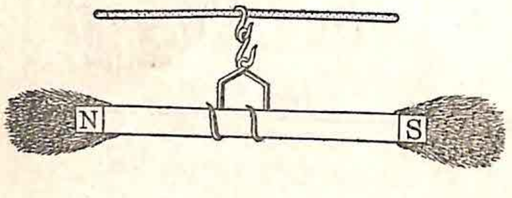


লোডস্টোন।

● **সংজ্ঞাঃ যে বস্তু লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে এবং যার দিগ্‌দর্শী ধর্ম আছে, তাকেই চুম্বক বলে।**

যে ধর্মের জন্য চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, সেই ধর্মকে চুম্বকত্ব বলে।

(ii) **কৃত্রিম চুম্বকঃ** প্রাকৃতিক চুম্বকের বিশেষ কোন নির্দিষ্ট আকার নেই। ওর আকর্ষণী ধর্ম বা দিগ্‌দর্শী ধর্মও খুব স্পষ্ট নয়।



কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কতকগুলি চৌম্বক পদার্থ, যেমন—**লোহা, নিকেল, কোবাল্ট** প্রভৃতি ধাতুকে চুম্বকে পরিণত করা যায়।

• **সংজ্ঞাঃ চৌম্বক পদার্থকে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত করা হলে, ঐ চুম্বককে কৃত্রিম চুম্বক বলে।**

যে পদ্ধতিতে চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করা যায়, তাকে **চুম্বকীকরণ** বলে।

প্রাকৃতিক চুম্বকের চেয়ে কৃত্রিম চুম্বকের আকর্ষণী বা বিকর্ষণী শক্তি বেশী। জ্যামিতিক আকারবিশিষ্ট হওয়ার জন্য এদের ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

কৃত্রিম চুম্বক এবং প্রাকৃতিক চুম্বকের তুলনাঃ

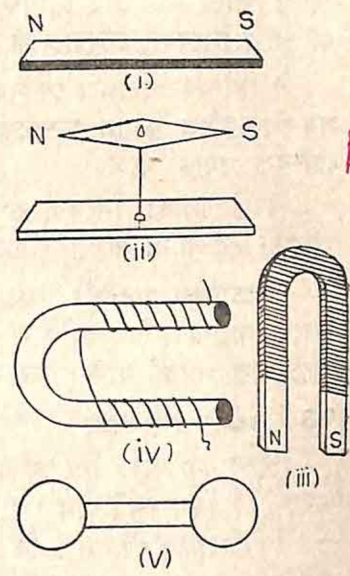
কৃত্রিক চুম্বক	প্রাকৃতিক চুম্বক
(i) কৃত্রিম চুম্বকের জ্যামিতিক আকার আছে, কাজের সুবিধার জন্য ইচ্ছামত বিভিন্ন আকারের কৃত্রিম চুম্বক তৈরি করা যায়।	(i) প্রাকৃতিক চুম্বকের কোন নির্দিষ্ট আকার থাকে না।
(ii) কৃত্রিম চুম্বকের দুটি মেরু থাকে এবং এরা সাধারণত চুম্বকের দুই প্রান্তে অবস্থান করে।	(ii) প্রাকৃতিক চুম্বকে একের বেশী সংখ্যক মেরু থাকতে পারে।
(iii) কৃত্রিম চুম্বকের চৌম্বক-শক্তি একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বাড়ানো বা কমানো যায়।	(iii) প্রাকৃতিক চুম্বকের মেরুর শক্তি পরিবর্তন করা যায় না।
(iv) কৃত্রিম চুম্বকের চৌম্বকত্ব অস্থায়ী।	(iv) প্রাকৃতিক চুম্বকের চৌম্বকত্ব স্থায়ী।

• **বিভিন্ন আকৃতির কৃত্রিম চুম্বকঃ** আকার অনুযায়ী সাধারণত **চার** রকম কৃত্রিম চুম্বক ব্যবহৃত হয়। কয়েকটি কৃত্রিম চুম্বকের বর্ণনা নিচে দেওয়া হল—

(i) **দণ্ড-চুম্বকঃ আয়তাকার** ইস্পাত দণ্ডকে চুম্বকে পরিণত করা হলে ঐ চুম্বককে দণ্ড-চুম্বক বলে (চিত্র i)। পরীক্ষাগারে এই ধরনের চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

(ii) **চুম্বক-শলাকাঃ** এটি হল খুব হালকা চুম্বকিত ইস্পাতের পাত। এর দুই প্রান্ত সূচাগ্র। এই পাতটির মধ্যবিন্দু একটি পিনের উপর বসানো থাকে, তাই শলাকাটি অনুভূমিক তলে মুক্ত অবস্থায় নড়তে পারে (চিত্র ii) এবং উত্তর ও দক্ষিণ মুখ করে অবস্থান করে। দিক্ নির্দেশক যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

(iii) **অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকঃ** ইংরেজী U-আকারবিশিষ্ট ইস্পাত দণ্ডকে চুম্বকে পরিণত করলে সেই চুম্বককে **অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক** বলে। এর দুটি মেরু (N এবং S) পাশাপাশি থাকে, তাই মেরু দুটির মধ্যে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় (চিত্র iii)।



বিভিন্ন প্রকারের চুম্বক।

(iv) **তড়িৎ-চুম্বকঃ** অন্তরিত তার দিয়ে একটি কাঁচা লোহার দণ্ডকে জড়িয়ে ঐ তারে সমপ্রবাহী তড়িৎ চালনা করলে দণ্ডটি চুম্বকত্ব লাভ করে—এর দুই প্রান্তে দুটি মেরুর সৃষ্টি হয়। তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করলে লোহার দণ্ডটি চুম্বকত্ব হারায়।

● **তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে কোন চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করা হলে, ঐ চুম্বককে তড়িৎ-চুম্বক বলে** (চিত্র iv)।

খুব জোরালো তড়িৎ-চুম্বক তৈরি করতে হলে কাঁচা লোহার দণ্ডটিকে U-আকারের করা হয়—যার দুই বাহুর উপর অন্তরিত তার জড়ানো থাকে। এই তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ মাত্রা বাড়ালে এবং তারের পাক সংখ্যা বাড়ালে U-দণ্ডের দুই প্রান্তে শক্তিশালী চুম্বক মেরুর সৃষ্টি হয়।

(v) **গোলক-মুখ চুম্বকঃ** এইরকম চুম্বক হল গোল প্রস্থচ্ছেদযুক্ত দণ্ড-চুম্বক—যার দুই প্রান্তে দুটি গোলক যুক্ত থাকে (চিত্র v)।

7.2 চৌম্বক পদার্থ ও অচৌম্বক পদার্থ

পরীক্ষাঃ (i) একটি চুম্বক-শলাকা টেবিলের উপর রাখা হল। এইবার একটি লোহার দণ্ডকে চুম্বক-শলাকার উত্তর মেরুর কাছে নিয়ে এলে দেখা গেল, উত্তর মেরুটি লোহার দণ্ডের কাছে ঘুরে সরে এলো।

দক্ষিণ মেরুর কাছে নিয়ে গেলেও ঠিক ঐভাবে দক্ষিণ মেরুটিও লোহার দণ্ডের কাছে সরে আসবে। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, লোহাও ঐ রকমভাবে চুম্বককে আকর্ষণ করে। এখানে লোহার দণ্ডটি নড়তে পারে না, তাই চুম্বক-শলাকার মেরু ঘুরে সরে আসে। ঠিক এইভাবে নিকেল, কোবাল্টের দণ্ডকেও চুম্বক আকর্ষণ করতে পারে।

• **চৌম্বক পদার্থ ঃ যে সব পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং যে সব পদার্থকে কৃত্রিম চুম্বকে পরিণত করা যায়, সেই সব পদার্থকে চৌম্বক পদার্থ বলে।**

(ii) লোহা, নিকেল ও কোবাল্ট ছাড়া অন্যান্য ধাতু চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না বা ওদের কৃত্রিম উপায়ে চুম্বকে পরিণত করা যায় না।

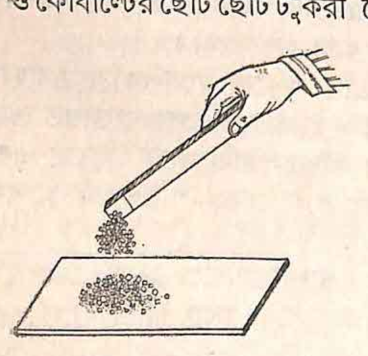
অচৌম্বক পদার্থ ঃ যে সব পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না কিংবা যাদের কৃত্রিম চুম্বকে পরিণত করা যায় না, সেই সব পদার্থকে অচৌম্বক পদার্থ বলে। যেমন—কাঠ, কাচ, তামা, সোনা ইত্যাদি।

7.3 চুম্বকের ধর্ম

চুম্বকের দুটি বিশেষ ধর্ম আছে ; যেমন—(1) **আকর্ষণী ধর্ম** এবং (2) **দিগ্‌দর্শী ধর্ম।**

(1) **আকর্ষণী ধর্ম ঃ যে ধর্মের প্রভাবে কোন চুম্বক, লোহা, কোবাল্ট প্রভৃতি চৌম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করে, তাকে চুম্বকের আকর্ষণী ধর্ম বলে। এই ধর্মের জন্যই চুম্বক লোহা, নিকেল, কোবাল্ট নামে কয়েকটি ধাতুকে আকর্ষণ করতে পারে।**

(A) **পরীক্ষা ঃ** টেবিলের উপরে রুপা, তামা, কাচ, লোহা, নিকেল ও কোবাল্টের ছোট ছোট টুকরা রেখে দেওয়া হল। এইবার একটা দণ্ড-চুম্বকের যে কোন একটা প্রান্ত প্রতিটি টুকরার কাছে নিয়ে এলে দেখা গেল রুপা, তামা ও কাচের টুকরা চুম্বকের গায়ে লেগে উঠে এলো না, কিন্তু লোহা, কোবাল্ট ও নিকেলের টুকরাগুলি চুম্বকের সঙ্গে লেগে উঠে এলো। চুম্বকের অন্য প্রান্ত ব্যবহার করলেও একই ঘটনা ঘটবে।

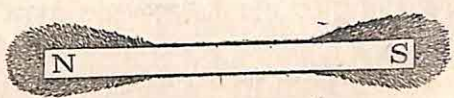


সিদ্ধান্ত ঃ লোহা, নিকেল, কোবাল্ট ধাতুকে চুম্বক আকর্ষণ করে। এই ধাতুগুলিকে চৌম্বক পদার্থ বলে।

(B) **পরীক্ষা ঃ** টেবিলের উপর একটি সাদা কাগজ রেখে ওর উপর

একটি দণ্ড-চুম্বক রেখে দেওয়া হল। এইবার উপর থেকে একটু একটু করে লোহাচুর চুম্বকের উপর ফেলা হল। মজার ব্যাপার দেখা গেল যে, যে লোহাচুরগুলি চুম্বকের উপর ফেলা হচ্ছে তার বেশীর ভাগ গিয়ে চুম্বকটির দুই প্রান্তে আটকে যাচ্ছে। চুম্বকটির মাঝামাঝি জায়গায় লোহাচুর একেবারেই আটকায় নি। এইবার চুম্বকটিকে টেবিল থেকে তুলে নিলেও দেখা গেল লোহাচুরগুলি পড়ে যাচ্ছে না—চুম্বকটির গায়ে আটকে আছে।

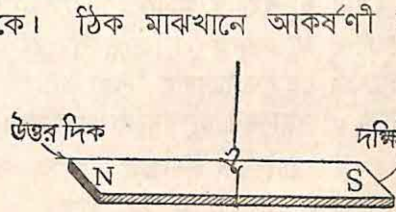
সিদ্ধান্তঃ (i) চুম্বকের আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। এই আকর্ষণী ধর্মের জন্য চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।



চুম্বকের আকর্ষণী ধর্ম।

(ii) চুম্বকের এই আকর্ষণী ক্ষমতা ওর দুই প্রান্তেই সবচেয়ে বেশী।

(iii) চুম্বকের মাঝের দিকে যতই যাওয়া যায়—এই আকর্ষণী ক্ষমতা ক্রমশ ততই কমতে থাকে। ঠিক মাঝখানে আকর্ষণী ক্ষমতা একেবারেই নেই—এই অঞ্চলটিকে **উদাসীন অঞ্চল** বলে।



চুম্বকের দিগ্‌দর্শী ধর্ম।

(2) **দিগ্‌দর্শী ধর্মঃ** একটি দণ্ড-চুম্বকের মাঝখানে অর্থাৎ ভারকেন্দ্রে একটি পাকহীন সুতা দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। লক্ষ্য রাখা হল, চুম্বকটি যেন অবাধে অনুভূমিক তলে ঝুলতে পারে। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক করার পর চুম্বকটি যখন স্থির অবস্থায় এলো, তখন দেখা গেল যে, দণ্ড-চুম্বকটি উত্তর-দক্ষিণমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চুম্বকটিকে আবার ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলেও দেখা গেল স্থির অবস্থায় এলে চুম্বকটি আবার আগের মতই উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে দাঁড়ালো। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, চুম্বকের দিগ্‌দর্শী ধর্ম আছে।

7.4 কতকগুলি সংজ্ঞা

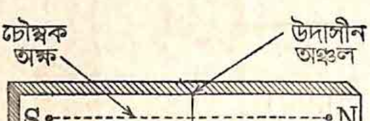
(i) **চুম্বক মেরুঃ চুম্বকের দুই প্রান্তে যে বিন্দুতে আকর্ষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী, সেই দুই বিন্দুকে চুম্বকের মেরু বলে।** চুম্বকটিকে পাকহীন সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দিলে তার যে মেরুটি

উত্তর দিকে থাকে তাকে **উত্তর সন্ধানী** বা **উত্তর মেরু** এবং যে মেরুটি দক্ষিণ দিকে থাকে, তাকে **দক্ষিণ সন্ধানী** বা **দক্ষিণ মেরু** বলে।

(ii) **চৌম্বক অক্ষ**ঃ চুম্বকের দুটি মেরুকে একটি রেখা দিয়ে যোগ করলে যে সরলরেখা পাওয়া যায়, তাকে **চৌম্বক অক্ষ** বলে।

(iii) **চৌম্বক দৈর্ঘ্য**ঃ চুম্বকের মেরু দুটির মাঝের দূরত্বকে **চৌম্বক দৈর্ঘ্য** বলে। চুম্বকের দুটি মেরু প্রান্ত থেকে কিছুটা ভেতরে থাকে, তাই চৌম্বক দৈর্ঘ্য, চুম্বকটির জ্যামিতিক দৈর্ঘ্যের চেয়ে সামান্য ছোট হয়।

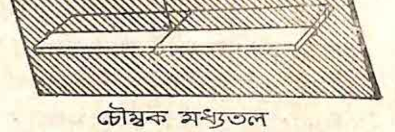
(iv) **উদাসীন অঞ্চল**ঃ চুম্বক দণ্ডের ঠিক মাঝখানে চুম্বকের আকর্ষণী ক্ষমতা প্রায় থাকে না। এই অঞ্চলকে **উদাসীন অঞ্চল** বলে।



(v) **উদাসীন রেখা**ঃ চৌম্বক অক্ষের সমদ্বিখণ্ডক রেখার যে অংশ চুম্বকের মধ্যে থাকে, তাকে **উদাসীন রেখা** বলে। এই রেখা-সংলগ্ন কোন বিন্দুতেই চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি থাকে না।

(vi) **চুম্বকীয় মধ্যরেখা**ঃ কোন স্থানে একটি দণ্ড-চুম্বককে ওর ভারকেন্দ্রে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দিলে, স্থির অবস্থায় এলে চুম্বকটি ভূ-পৃষ্ঠের যে যে বিশেষ দিক্ বরাবর অবস্থান করে সেই দিক বরাবর রেখাকে ঐ স্থানের **চুম্বকীয় মধ্যরেখা** বলে।

(vii) **চৌম্বক মধ্যতল**ঃ কোন স্থানে একটি চুম্বককে ওর ভার-কেন্দ্র থেকে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দিলে স্থির অবস্থায় এলে চুম্বকটির চৌম্বক অক্ষের মধ্য দিয়ে কল্পিত উল্লম্ব তলকে ঐ স্থানের **চৌম্বক মধ্যতল** বলে।



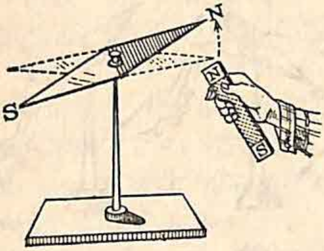
চৌম্বক মধ্যতল

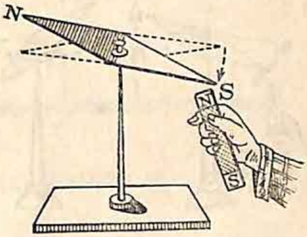
(viii) **চৌম্বক ক্ষেত্র**ঃ চুম্বকের চারদিকে যে স্থান জুড়ে চুম্বকের আকর্ষণী বল অনুভূত হয়, তাকে চুম্বকটির **চৌম্বক ক্ষেত্র** বলে।

7.5 সমমেরু পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করে ও বিপরীত মেরু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে

পরীক্ষাঃ একটি চুম্বক-শলাকাকে টেবিলের উপর রেখে দিলে দেখা গেল, চুম্বক-শলাকাটি উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

এইবার একটি দণ্ড-চুম্বকের উত্তর মেরুকে চুম্বক-শলাকার উত্তর মেরুর কাছে নিয়ে এলে দেখা গেল শলাকার উত্তর মেরুটি ভয় পেয়ে সরে গেল অর্থাৎ বিকর্ষণ হল। এইবার দণ্ড-চুম্বকের উত্তর মেরুটিকে চুম্বক-শলাকার দক্ষিণ মেরুর কাছে নিয়ে এলে দেখা গেল চুম্বক-শলাকার দক্ষিণ মেরুটি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে দণ্ড-চুম্বকের উত্তর মেরুর





কাছে সরে এলো অর্থাৎ আকৃষ্ট হল। এইবার দণ্ড-চুম্বকের দক্ষিণ মেরুকে শলাকার দক্ষিণ মেরুর কাছে ধরলে দেখা গেল, দক্ষিণ মেরুটি বিকর্ষিত হল। দণ্ড-চুম্বকের দক্ষিণ মেরুটিকে শলাকার উত্তর মেরুর কাছে আনলে দেখা গেল, শলাকার উত্তর মেরুটি দণ্ড-চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছে সরে এলো অর্থাৎ আকৃষ্ট হল।

এইবার একটি লোহার দণ্ডকে চুম্বক-শলাকার উত্তর মেরু অথবা দক্ষিণ মেরুর কাছে আনলে দেখা গেল, উভয় ক্ষেত্রেই মেরু দুটি লোহার দণ্ড দ্বারা আকৃষ্ট হল।

সিদ্ধান্তঃ এই পরীক্ষা করে বোঝা গেল যে—

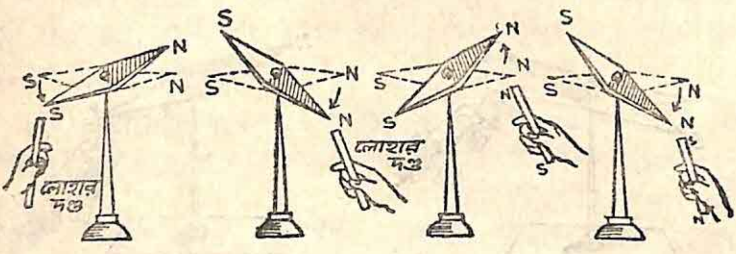
(i) **চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে।**
(ii) **চুম্বকের সমমেরু পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।**
(iii) **চৌম্বক পদার্থ (লোহা) চুম্বকের দুই মেরুকেই আকর্ষণ করে।**

7.6 চুম্বকত্বের পরীক্ষাঃ আকর্ষণের চেয়ে বিকর্ষণই চুম্বকত্বের একমাত্র প্রমাণ

টেবিলের উপর একটি দণ্ড-চুম্বক ও ঠিক ঐরকম দেখতে একটি লোহার দণ্ড আছে। এখন যদি বলা হয় দণ্ড দুটির মধ্যে কোন্‌টি লোহার দণ্ড এবং কোন্‌টি চুম্বক খুঁজে বের কর, তাহলে তা জানার জন্য নিচের পরীক্ষাটি করতে হবে।

● **পরীক্ষা**ঃ একটি চুম্বক-শলাকাকে টেবিলের উপর রাখা হল। এইবার (i) প্রথম দণ্ডটিকে চুম্বক-শলাকার উত্তর মেরুর কাছে আনলে

দেখা গেল, শলাকার উত্তর মেরুটি দণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হল। দণ্ডটিকে শলাকার দক্ষিণ মেরুর কাছে আনলে যদি দক্ষিণ মেরুটিও দণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে দণ্ডটি হল লোহার দণ্ড—চুম্বক নয়।



(ii) এইবার দ্বিতীয় দণ্ডটির একটি প্রান্তকে চুম্বক-শলাকার দক্ষিণ মেরুর কাছে আনলে দেখা গেল, শলাকার দক্ষিণ মেরুটি দ্বিতীয় দণ্ডটির প্রান্ত দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছে। এখন দণ্ডটির একই প্রান্তকে চুম্বক-শলাকার উত্তর মেরুর কাছে আনলে যদি দেখা যায় যে শলাকার উত্তর মেরুটি বিকর্ষিত হয়ে সরে গেল, তাহলে বুঝতে হবে দ্বিতীয় দণ্ডটি হল দণ্ড-চুম্বক।

সিদ্ধান্তঃ এই পরীক্ষা করে বোঝা গেল যে—

(i) কোন চৌম্বক পদার্থ দ্বারা তৈরি দণ্ডকে চুম্বক-শলাকার দুই মেরুর কাছে নিয়ে এলে **যদি দুটি মেরুই আকৃষ্ট হয়, তবে বুঝতে হবে দণ্ডটি চুম্বক নয়—কোন চৌম্বক পদার্থ।**

(ii) দণ্ডটির কোন একটি প্রান্তকে চুম্বক-শলাকার দুটি মেরুর কাছে পর পর ধরলে যদি **একটির ক্ষেত্রে বিকর্ষণ ও অপর ক্ষেত্রে আকর্ষণ হয়, তবে বুঝতে হবে, দণ্ডটি নিজেই চুম্বক।**

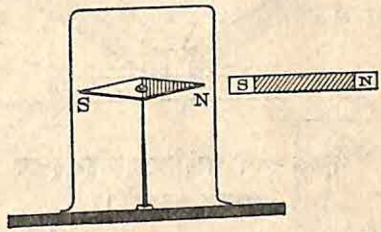
(iii) **দণ্ডের কোন প্রান্তই যদি চুম্বক-শলাকার কোন মেরুকেই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ না করে, তবে বুঝতে হবে দণ্ডটি অচৌম্বক পদার্থ দিয়ে তৈরি।**

তাহলে বোঝা গেল, বিকর্ষণ হলেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কোন বস্তু চুম্বক কি না। **এই পরীক্ষাটি চুম্বক, চৌম্বক পদার্থ এবং অচৌম্বক পদার্থের সনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়।**

● **চুম্বক—অচৌম্বক পদার্থের মধ্য দিয়েও ক্রিয়া করে—প্রমাণঃ**

কাঠ, কাগজ, কাচ প্রভৃতি হল অচৌম্বক পদার্থ—এরা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না বা এদের চুম্বকে পরিণত করা যায় না। কিন্তু দেখা গেছে,

কোন চৌম্বক পদার্থ এবং চুম্বকের মাঝখানে এই জাতীয় পদার্থ রাখলে এরা চৌম্বক পদার্থের উপর চুম্বকের ক্রিয়া রোধ করতে পারে না।



পরীক্ষাঃ একটি চুম্বক-শলাকাকে একটি কাচের বীকার দিয়ে ঢেকে রেখে দণ্ড-চুম্বকের N মেরুকে শলাকার N মেরুর কাছে আনলে বিকর্ষণ দেখা যাবে আর শলাকার S মেরুর কাছে আনলে আকর্ষণ দেখা যাবে। একটি লোহার দণ্ডকে কাছে আনলে দেখা যাবে শলাকার দুই মেরুই লোহার দণ্ড দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছে।

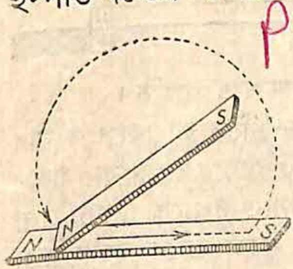
এর দ্বারা প্রমাণিত হল, অচৌম্বক পদার্থ চৌম্বক পদার্থের উপর চুম্বকের প্রভাব রোধ করতে পারে না।

7.7 কৃত্রিম উপায়ে চুম্বক প্রস্তুত করার প্রণালী

দুটি পদ্ধতিতে কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত করা যায় ; যেমন—(1) **ঘর্ষণ পদ্ধতি** এবং (2) **বৈদ্যুতিক পদ্ধতি।**

(1) **ঘর্ষণ পদ্ধতিঃ** এই পদ্ধতিটি আবার তিন প্রকারের ; যথা—

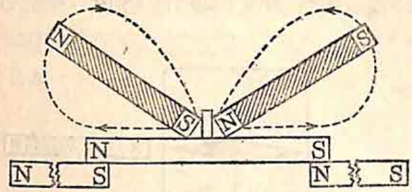
(i) **একক স্পর্শ পদ্ধতিঃ** একটি ইস্পাতের দণ্ডকে টেবিলের উপর রেখে একটি শক্তিশালী চুম্বকের কোন এক মেরুকে (ধর, উত্তর মেরু) ইস্পাত-দণ্ডের এক প্রান্তে স্পর্শ করানো হয়। এই অবস্থায় ঐ ইস্পাত-দণ্ডের উপর দিয়ে চুম্বকটিকে টেনে অপর প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়। চুম্বক-দণ্ডটি অন্য প্রান্তে এলে, ওকে তুলে নিয়ে আবার ইস্পাতের দণ্ডের যে প্রান্তে চুম্বকটিকে প্রথমে রাখা হয়েছিল, ওখানে স্পর্শ করিয়ে অন্য এক প্রান্তের দিকে আগের মত টেনে নেওয়া হয়। এইভাবে কয়েকবার করার পর ইস্পাত-দণ্ডটিকে উল্টে নিয়ে আগের মত বার বার ঘর্ষণ করা হয়। এর ফলে ইস্পাত-দণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হবে। এইভাবে যে দণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হয়, তার শেষ যে প্রান্ত থেকে চুম্বকের মেরুটিকে উঠিয়ে নেওয়া হয়, সেই প্রান্তে ঐ মেরুর বিপরীত মেরু অর্থাৎ এক্ষেত্রে দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হয়।



একক ঘর্ষণ পদ্ধতিতে কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত প্রণালী।

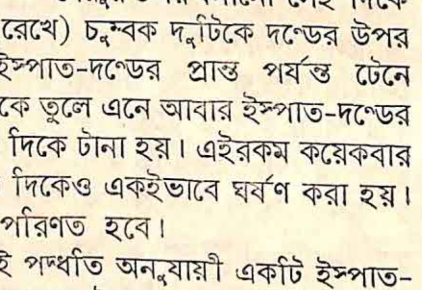
(ii) **পৃথক স্পর্শ পদ্ধতিঃ** একটি ইস্পাত-দণ্ডের এক প্রান্তকে

একটি স্থায়ী চুম্বকের দক্ষিণ মেরু S-এর উপর এবং অন্য প্রান্তটিকে আর একটি চুম্বকের উত্তর মেরু N-এর উপর বসানো হয়। এইবার আরো দুটি সমশক্তি-সম্পন্ন স্থায়ী চুম্বককে আনত-ভাবে ধরে চুম্বক দুটির বিপরীত মেরুকে ইস্পাত-দণ্ডের মাঝখানে স্পর্শ করিয়ে (দণ্ডের যে প্রান্তটি S-মেরুর উপর বসানো সেই দিকে S-মেরু এবং অপর পাশে N-মেরু রেখে) চুম্বক দুটিকে দণ্ডের উপর দিয়ে পরস্পরের বিপরীত দিকে ইস্পাত-দণ্ডের প্রান্ত পর্যন্ত টেনে নেওয়া হয়। প্রান্ত থেকে চুম্বক দুটিকে তুলে এনে আবার ইস্পাত-দণ্ডের মাঝখানে বসিয়ে আগের মত প্রান্তের দিকে টানা হয়। এইরকম কয়েকবার করার পর দণ্ডটিকে উল্টে বিপরীত দিকেও একইভাবে ঘর্ষণ করা হয়। এর ফলে ইস্পাত-দণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হবে।

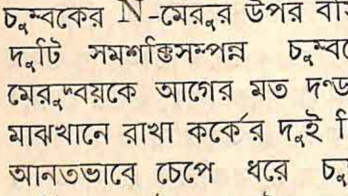


পৃথক স্পর্শ পদ্ধতিতে কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত প্রণালী।

(iii) **যুগ্ম স্পর্শ পদ্ধতিঃ** এই পদ্ধতি অনুযায়ী একটি ইস্পাত-দণ্ডকে চুম্বকিত করতে হলে, আগের মত ইস্পাত-দণ্ডের এক প্রান্তকে একটি স্থায়ী চুম্বকের S-মেরুর উপর এবং অন্য প্রান্তটিকে আর একটি চুম্বকের N-মেরুর উপর বসিয়ে দুটি সমশক্তিসম্পন্ন চুম্বকের মেরুদ্বয়কে আগের মত দণ্ডটির মাঝখানে রাখা কর্কের দুই দিকে আনতভাবে চেপে ধরে চুম্বক দুটিকে একইসঙ্গে টেনে দুপাশে ইস্পাত-দণ্ডের প্রান্ত পর্যন্ত আনা হয়। এইবার চুম্বক দুটিকে আর না উঠিয়ে দণ্ডটির গা বেয়ে আবার বিপরীত দিকে ঘর্ষণ করে মাঝখানে আনা হয়। এইভাবে কয়েকবার ঘর্ষণ করার পর ইস্পাত-দণ্ডকে উল্টে অন্য পিঠেও একই রকম ভাবে ঘর্ষণ করা হলে দণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হয়। দণ্ডটির যে প্রান্তে ঘর্ষণকারী চুম্বকের যে মেরু আসে, সেই প্রান্তে—তার বিপরীত মেরুর সৃষ্টি হয়।



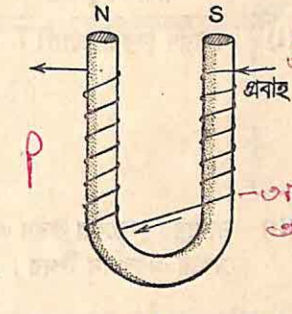
যুগ্ম স্পর্শ পদ্ধতি।



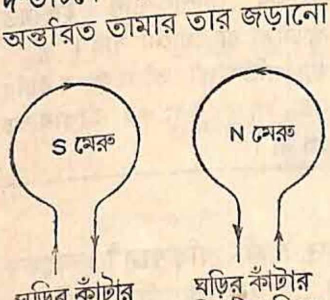
তড়িৎ-চুম্বক।

(2) **বৈদ্যুতিক পদ্ধতিঃ** একটা লোহার দণ্ডকে অন্তরিত (বিদ্যুৎ-অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে মোড়া)

তামার তার দিয়ে জড়িয়ে, ঐ তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করলে লোহার দণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হয়। **তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা বাড়ালে এবং তামার তার জড়ানোর পাক-সংখ্যা বাড়ালে চুম্বকের শক্তি বাড়ে। এইভাবে ইস্পাত-দণ্ডকে শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বকে পরিণত করা যায়।** একটি কাঁচা লোহার দণ্ডকে ঐভাবে অন্তরিত তামার তার দিয়ে জড়িয়ে, ঐ তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালে নরম লোহার দণ্ডটি চুম্বক হয়ে যায় কিন্তু ঐ চুম্বকত্ব, যতক্ষণ প্রবাহ চলে ততক্ষণ স্থায়ী থাকে, প্রবাহ বন্ধ হলেই নরম লোহাটির চুম্বকত্ব নষ্ট হয়। **নরম লোহাকে এইভাবে তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা চুম্বকে পরিণত করলে তাকে তড়িৎ-চুম্বক বলে।**



খুব জোরালো তড়িৎ-চুম্বক তৈরি করতে হলে কাঁচা লোহার দণ্ডটিকে ইংরেজী U-আকারের করা হয় এবং দুটি বাহুর উপর অন্তরিত তামার তার জড়ানো হয়। একটি বাহুর উপর তার জড়ানো শেষ হলে তারের প্রান্তটিকে এই বাহুটির উপর পৃষ্ঠ দিয়ে বের করে অন্য বাহুটির তলা দিয়ে নিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় বাহুটিকে তার দিয়ে জড়াতে হবে। এইভাবে তার জড়ানো হয়ে গেলে তারের শেষ প্রান্তটি বাহুটির উপর প্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসবে। এইভাবে দুটি বাহুতে পরস্পর বিপরীত দিকে তার জড়াতে হয়।



ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রবাহ   ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে প্রবাহ

● **তড়িৎ-চুম্বকের মেরু নির্ণয়ঃ** এখন তারটির মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করলে ইংরেজী U-আকারের দণ্ডের **প্রান্তের দিক থেকে লম্বভাবে তাকালে, যে প্রান্তে তারের মধ্য দিয়ে ঘড়ির কাঁটার দিকে তড়িৎ-প্রবাহ চলে, সেই প্রান্তে দক্ষিণ মেরু আর অন্য প্রান্তে উত্তর মেরুর সৃষ্টি হয়।**

● **শক্তিশালী তড়িৎ-চুম্বক তৈরি করতে হলে—**

(i) অন্তরিত তারের পাকসংখ্যা বাড়ালে চৌম্বক-শক্তি বাড়ে।

(ii) তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ বাড়ালে চুম্বকের শক্তি বাড়ে।

● **তড়িৎ-চুম্বকের ব্যবহারঃ** (i) বৈদ্যুতিক পাখা, রেডিও, মোটর, ডায়নামো এবং পরমাণু ভাঙগার যন্ত্রে (সাইক্লোট্রোন) শক্তিশালী তড়িৎ-

চুম্বক ব্যবহৃত হয়। চোখে লোহার গুঁড়া পড়ে গেলে এই চুম্বকের সাহায্যে তুলে ফেলা হয়।

সাধারণ চুম্বক ও তড়িৎ-চুম্বকের মধ্যে পার্থক্যঃ

সাধারণ চুম্বক	তড়িৎ-চুম্বক
(i) সাধারণ চুম্বক স্থায়ী।	(i) তড়ি-চুম্বক অস্থায়ী যতক্ষণ প্রবাহ চলে ততক্ষণ এর চৌম্বকত্ব থাকে। (ব্যতিক্রম—ইস্পাতের দণ্ড ব্যবহার করলে স্থায়ী চুম্বক তৈরি হয়।)
(ii) সাধারণ চুম্বকের উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর অবস্থান স্থির।	(ii) প্রবাহের অভিমুখ পরিবর্তন করে তড়িৎ-চুম্বকের মেরুর অবস্থান পরিবর্তন করা যায়।
(iii) সাধারণ চুম্বকের চৌম্বক-শক্তি বাড়ানো বা কমানো যায় না।	(iii) প্রবাহের তীব্রতা এবং তারের পাক সংখ্যার পরিবর্তন করে তড়িৎ-চুম্বকের চৌম্বক-শক্তি ইচ্ছামত বাড়ানো বা কমানো যায়।
(iv) খুব শক্তিশালী সাধারণ চুম্বক তৈরি করা ব্যয়-সাপেক্ষ এবং এর আকার বিরাট হয়।	(iv) খুব শক্তিশালী তড়িৎ-চুম্বক তৈরি করা সহজ এবং এর আকার বড় হয় না।

7.8 চৌম্বক আবেশ

• **সংজ্ঞাঃ একটি চৌম্বক পদার্থকে কোন একটি শক্তিশালী চুম্বকের সঙ্গে স্পর্শ করালে বা খুব কাছে আনলে ঐ চৌম্বক পদার্থটি সাময়িক-ভাবে চুম্বকে পরিণত হয়। চুম্বকটি সরিয়ে নিলে চৌম্বক পদার্থটির চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায়। এই ঘটনাকে চৌম্বক-আবেশ বলে।**

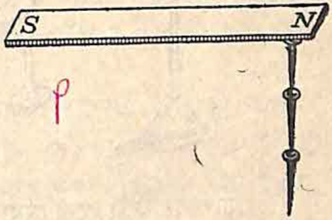
যে চুম্বকটির সাহায্যে চৌম্বক পদার্থটিকে এইভাবে আবেশ দ্বারা চুম্বকে পরিণত হয়, তাকে **আবেশকারী চুম্বক** বলে।

আবেশের ফলে যে চৌম্বক পদার্থটি চুম্বকে পরিণত হয়, তাকে **আবিষ্ট চুম্বক** বলে।

আবেশের ফলে চৌম্বক পদার্থে উৎপন্ন চুম্বকত্বকে **আবিষ্ট চুম্বকত্ব** বলে।

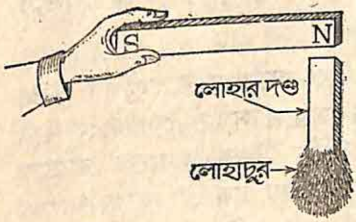
• **পরীক্ষাঃ** (a) একটি দণ্ড-চুম্বকের যে-কোন মেরু, ধর উত্তর মেরুর নিচে একটি কাঁচা লোহার পেরেক স্পর্শ করানো হল—পেরেকটি আকর্ষণের জন্য ঝুলতে থাকবে। এখন আর একটি পেরেক নিয়ে প্রথম

পেরেকটির তলায় স্পর্শ করানো হল—দেখা গেল, দ্বিতীয় পেরেকটি প্রথম পেরেকের তলায় ঝুলছে। এইভাবে কয়েকটি পেরেক পর পর রেখে একটা পেরেকের চেন তৈরি করা যায়। এতে বোঝা যায় যে, প্রত্যেকটি পেরেক চুম্বকে পরিণত হয়েছে। এইবার প্রথম পেরেকটিকে এক হাত দিয়ে ধরে অন্য হাত দিয়ে চুম্বক-দণ্ডটি সরিয়ে নেওয়া হল—দেখা গেল, পেরেকগুলি সব খসে পড়লো। এতে বোঝা যায় যে, পেরেকগুলির চুম্বকত্ব সাময়িক। যতক্ষণ পর্যন্ত দণ্ড-চুম্বকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত পেরেকগুলি চুম্বকের মত ব্যবহার করছিল।



চৌম্বক-আবেশ

(b) একটি কাঁচা লোহার দণ্ডকে লোহাচুরের মধ্যে ডুবিয়ে উপরে তোলা হল—দেখা গেল, ওর গায়ে একটিও লোহাচুর আটকে নেই। এই-বার দণ্ডটিকে লোহাচুরের মধ্যে রেখে, দণ্ডটির উপরের প্রান্তের কাছে একটি শক্তিশালী চুম্বকের যে-কোন মেরু—ধরি, উত্তর মেরু ধরা হল, আর এই অবস্থায় লোহার দণ্ডটিকে উপরে তোলা হল। দেখা গেল, দণ্ডের নিচে লোহাচুর লেগে আছে। এখন শক্তিশালী চুম্বকটিকে সরিয়ে ফেলা হল, সঙ্গে সঙ্গে লোহাচুরগুলি লোহার দণ্ডের গা থেকে খসে পড়লো। এই পরীক্ষায় বোঝা যায়—শক্তিশালী চুম্বকটির দ্বারা আবিষ্ট লোহার দণ্ডটি সাময়িকভাবে চুম্বকে পরিণত হয়েছিল।

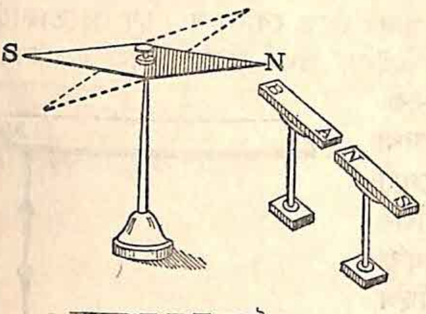


চৌম্বক-আবেশ।

7.9 চৌম্বক আবেশের ফলে আবেশকারী মেরুর নিকট প্রান্তে বিপরীত মেরু ও দূর প্রান্তে সমমেরুর সৃষ্টি হয়।

পরীক্ষাঃ একটি দণ্ড-চুম্বকের উত্তর মেরুকে একটি চুম্বক-শলাকার উত্তর মেরু থেকে এমন দূরে রাখা হল, যেন দুটি মেরুর মধ্যে কোন বিকর্ষণ বল প্রায় থাকে না। এই অবস্থায় ওদের মাঝে একটি কাঁচা লোহার দণ্ড রাখলে চুম্বক-শলাকার উত্তর মেরুটিকে বিকর্ষিত হয়ে সরে যেতে দেখা যাবে। দণ্ড-চুম্বকের N-মেরুর প্রভাবে লোহার দণ্ড

AB-এর A-প্রান্তে দক্ষিণ মেরু এবং B-প্রান্তে উত্তর মেরুর সৃষ্টি হয়। B-প্রান্তের কাছে চুম্বক-শলাকার উত্তর মেরু থাকায় পরস্পরের বিকর্ষণের ফলে শলাকার উত্তর মেরুটি দূরে সরে যায়।



আবেশের ফলে সৃষ্ট মেরু।

এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, চৌম্বক আবেশের ফলে **আবেশকারী মেরুর নিকট প্রান্তে বিপরীত মেরু এবং দূর প্রান্তে সমমেরুর সৃষ্টি হয়।**

- **আকর্ষণের পূর্বে আবেশ হয়ঃ**

একটি দণ্ড-চুম্বককে লোহার দণ্ডের (চৌম্বক পদার্থ) কাছে আনলে লোহাটি ঐ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণের পেছনে দুটি ঘটনা ঘটে।

(i) লোহার দণ্ডটির কাছে চুম্বকটিকে আনলে আবেশের ফলে ঐ লোহার দণ্ডের নিকট প্রান্তে বিপরীত মেরুর সৃষ্টি হয় এবং দূর প্রান্তে সমমেরুর সৃষ্টি হয়। যেমন—চুম্বকটির উত্তর মেরুকে লোহার দণ্ডটির কোন প্রান্তের কাছে আনলে, লোহার দণ্ডের ঐ প্রান্তে দক্ষিণ মেরু এবং দূর প্রান্তে উত্তর মেরুর সৃষ্টি হয়। এইভাবে পদার্থটি ঐ অবস্থায় অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়। (ii) এখন বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাই লোহায় সৃষ্ট ঐ বিপরীত মেরুকে দণ্ড-চুম্বকের মেরু আকর্ষণ করে। তাই বলা হয়, **আকর্ষণের আগে আবেশ সৃষ্টি হয়।**

- **চৌম্বক আবেশের নিয়মঃ**

(i) একমাত্র চৌম্বক পদার্থেই চৌম্বক আবেশ হয়।

(ii) যে চুম্বকের প্রভাবে কোন চৌম্বক পদার্থে চুম্বকত্ব সৃষ্টি হয় সেই চুম্বকটিকে সরিয়ে নিলে চৌম্বক পদার্থটির চৌম্বকত্ব নষ্ট হয়।

(iii) আবিষ্ট চৌম্বক পদার্থের যে প্রান্তটি আবেশকারী চুম্বকের নিকটে আছে, সেই প্রান্তে বিপরীত মেরু এবং দূর প্রান্তে সমমেরুর সৃষ্টি হয়।

● **আবিষ্ট চুম্বকের চৌম্বকত্বের পরিমাণ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করেঃ**

(i) **আবেশকারী চুম্বকের মেরুশক্তির উপরঃ** আবেশকারী চুম্বকের মেরুশক্তির উপর আবিষ্ট চুম্বকের চৌম্বকত্বের পরিমাণ নির্ভর করে। আবেশকারী চুম্বকের মেরুর শক্তি বাড়ালে আবিষ্ট চুম্বকের চৌম্বকত্বের পরিমাণ বাড়ে, কমালে আবিষ্ট চুম্বকের চৌম্বকত্বের পরিমাণ কমে।

(ii) **আবেশকারী চুম্বক থেকে চৌম্বক পদার্থের দূরত্বের উপরঃ** আবেশকারী চুম্বকের মেরু এবং আবেশাধীন চৌম্বক পদার্থের মাঝের দূরত্ব যত কম হবে, আবিষ্ট চুম্বকের চৌম্বকত্বের পরিমাণ তত বাড়ে. দূরত্ব বাড়লে আবিষ্ট চুম্বকত্ব কমে।

(iii) **চৌম্বক পদার্থের প্রকৃতির উপরঃ** আবেশাধীন চৌম্বক পদার্থটির প্রকৃতির উপর আবিষ্ট চুম্বকের চৌম্বকত্বের পরিমাণ নির্ভর করে। যেমন, বিভিন্ন চৌম্বক পদার্থে আবিষ্ট চুম্বকত্বের পরিমাণ বিভিন্ন হয়। লোহার চেয়ে কোবাল্ট বা নিকেলে আবিষ্ট চুম্বকের চৌম্বকত্বের পরিমাণ কম হয়।

(iv) অনেকগুলি সমমেরু একসঙ্গে নিয়ে ইচ্ছামত চৌম্বক আবেশ ক্রিয়া বাড়ানো যায় এবং বিপরীত মেরুর সমাবেশ দ্বারা চুম্বকের আবেশ ক্রিয়া কমানো যায়।

পরীক্ষাঃ একটি দন্ড-চুম্বকের উত্তর মেরুতে কাঁচা লোহার তৈরি একটি পেরেক স্পর্শ করালে পেরেকটি দন্ড-চুম্বকের সঙ্গে আটকে থাকে। আর একটি একই ধরনের পেরেককে প্রথমটির তলায় স্পর্শ করালে দেখা গেল সেটিও প্রথম পেরেকের গায়ে ঝুলে আছে। এইভাবে একটির তলায় আর একটি পেরেক ঝুলিয়ে পেরেকের একটি শৃঙখল তৈরি করা যায়। কত গুলি পেরেক এইভাবে পর পর ঝুলে থাকবে তা নির্ভর করে আবেশকারী চুম্বকের শক্তির উপর।



এই পরীক্ষায় ধরা যাক দন্ড-চুম্বকটির গায়ে পর পর চারটি একই ওজনের পেরেক ঝুলে থাকতে পারে। এই অবস্থায় সমশক্তির অন্য একটি দন্ড-চুম্বকের উত্তর মেরুকে প্রথম চুম্বকটির উত্তর মেরুর উপর রাখলে দেখা গেল আরো বাড়তি চারটি অর্থাৎ মোট আটটি পেরেক ঝুলে থাকতে পারে। এক্ষেত্রে বোঝা গেল চৌম্বক আবেশ শক্তি দ্বিগুণ হয়েছে। দ্বিতীয়

চুম্বকটির সমমানের দক্ষিণ মেরুকে প্রথম চুম্বকটির উত্তর মেরুর উপর চেপে ধরলে দেখা যাবে সব পেরেক খসে পড়েছে।

● চুম্বকের চৌম্বকত্ব নষ্ট হওয়ার কারণঃ

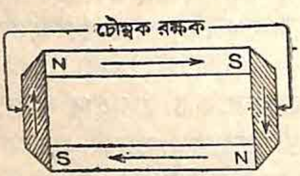
(i) দন্ড-চুম্বকের দুই সমমেরুকে যদি পাশাপাশি রেখে দেওয়া হয়, তা হলে আবেশের ফলে প্রত্যেক মেরু অন্যের উপর বিপরীত মেরু আবিষ্ট করবে। এর ফলে দুটি চুম্বকেরই মেরুর ক্ষমতা কমে যায়।

(ii) কোন চুম্বককে আঘাত করলে বা চুম্বক দিয়ে কোন বস্তুকে আঘাত করলে চুম্বকটির চৌম্বকত্ব কমে যায়।

(iii) চুম্বককে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতার উপরে উত্তপ্ত করলে চুম্বকের মধ্যস্থ চুম্বক অণুগুলির সারিবদ্ধ অবস্থা নষ্ট হয়ে যায়, ফলে তার চুম্বকত্ব নষ্ট হয়। যে উষ্ণতায় উত্তপ্ত হলে চুম্বকের চুম্বকত্ব নষ্ট হয়, তাকে **কুরী পয়েণ্ট** বলে।

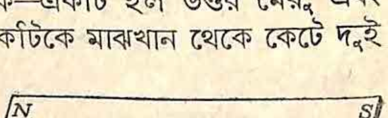
(iv) চুম্বকের মধ্য দিয়ে পরিবর্তী প্রবাহ (A.C.) চালনা করলে চুম্বকের চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

● চৌম্বক রক্ষকঃ দুটি দন্ড-চুম্বককে এমনভাবে পাশাপাশি রাখা হয় যেন চুম্বক দুটির বিপরীত মেরু পাশাপাশি থাকে। নরম লোহার ছোট ছোট দুটি দন্ড দিয়ে চুম্বকের বিপরীত মেরুগুলিকে যোগ করা হয়। এর দ্বারা আবেশের ফলে সমস্ত মেরুগুলি বদ্ধমুখ শৃঙ্খল গঠন করে, ফলে চুম্বকের চৌম্বকত্ব বজায় থাকে। **কাঁচা লোহার দন্ড দুটিকে চৌম্বক রক্ষক বলে।**



7.10 প্রত্যেক চুম্বকে সর্বদা দুটি মেরু থাকবে—এক-মেরুবিশিষ্ট চুম্বক কখনো সম্ভব নয়

একটি চুম্বকের দুটি মেরু থাকে—একটি হল উত্তর মেরু এবং অপরটি দক্ষিণ মেরু। এখন যদি চুম্বকটিকে মাঝখান থেকে কেটে দুই টুকরা করা হয় তাহলে মনে হতে পারে যে, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুকে আলাদা করে দেওয়া হল। কিন্তু পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, ঐ দুটি টুকরার প্রত্যেকটিতে দুটি বিপরীত মেরুর সৃষ্টি হয়েছে। এই টুকরোর একটিকে নিয়ে আবার ক্রমাগত ভাঙতে থাকলে প্রতি ক্ষেত্রে

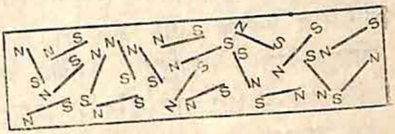


যেসব ছোট ছোট টুকরো পাওয়া যাবে, দেখা যাবে ওরা প্রত্যেকেই এক-একটি দুই-মেরুবিশিষ্ট চুম্বক। এইভাবে যত ছোট টুকরোই হোক না কেন, এক-মেরুবিশিষ্ট চুম্বক আর পাওয়া যাবে না।

7.11 চুম্বকত্ব সম্বন্ধে সহজ মতবাদ

একটি চুম্বকে সর্বদা দুটি মেরু থাকবে। একটা চুম্বককে ভেঙে বহু টুকরো করলেও উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, অর্থাৎ প্রত্যেকটি টুকরোই স্বয়ংসম্পূর্ণ চুম্বক হবে। কিন্তু চুম্বকটিকে এইভাবে ভাঙতে ভাঙতে গেলে শেষে সবচেয়ে ছোট একটা কণা পাওয়া যাবে—যাকে বলে অণু। তাহলে দণ্ড-চুম্বকটির সবচেয়ে ছোট অংশ হল ওর অণু। সুতরাং এই অণুর মধ্যেও উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু নিশ্চয় বর্তমান থাকবে। বিজ্ঞানী **ওয়েবার** তাই বলেন যে, চৌম্বক পদার্থের প্রত্যেকটি অণুই হল এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চুম্বক—এই রকম চুম্বককে **অণু-চুম্বক** বলে।

ওয়েবারের মতে চুম্বক এবং চৌম্বক পদার্থ উভয়ই এই রকম অণু-চুম্বক দিয়ে তৈরি। এখন প্রশ্ন হতে পারে, চৌম্বক পদার্থগুলি যদি অণু-চুম্বক দিয়ে তৈরি হয় তাহলে ঐ পদার্থগুলি সব সময় চুম্বকের মত আচরণ করে না কেন? এর কারণ হল, চৌম্বক পদার্থের মধ্যে এই অণু-চুম্বকগুলি এমন এলোমেলো-ভাবে অবস্থান করে যে একটি অণু-চুম্বকের মেরুর ক্রিয়া অন্য একটি অণু-চুম্বকের মেরুর ক্রিয়াকে নষ্ট করে দেয়। অনেক সময় চৌম্বক পদার্থের মধ্যে এই অণু-চুম্বকগুলি বদ্ধমুখ শৃঙ্খলের মত অবস্থান করে। এর ফলে মেরুগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তাই পদার্থটির মধ্যে চৌম্বক ধর্ম আর দেখা যায় না।



অণু-চুম্বকের বদ্ধমুখ শৃঙ্খল।

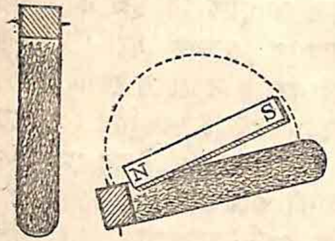
এখন যদি **চুম্বকন** প্রক্রিয়া দ্বারা এই অণু-চুম্বকগুলিকে এমনভাবে সাজানো যায় যে অণু-চুম্বকগুলির প্রত্যেকটির উত্তর মেরুগুলি একদিকে ও দক্ষিণ মেরুগুলি বিপরীত দিকে অবস্থান করে, তাহলে ঐ চৌম্বক পদার্থটি চুম্বকে পরিণত হয়।

চুম্বকের মধ্যে ওর অণু-চুম্বকগুলি পর পর এমনভাবে সাজানো থাকে যে অণু-চুম্বকগুলির সব উত্তর মেরু একদিকে এবং সবকটি দক্ষিণ মেরু অপর দিকে অবস্থান করে। এর ফলে চুম্বকটির যেদিকে অণু-চুম্বকের উত্তর মেরুগুলি থাকে—সেই দিকে উত্তর মেরু এবং

যেদিকে অণু-চুম্বকের দক্ষিণ মেরুগুলি থাকে—সেই দিকে দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হয়।

এই ঘটনা একটি পরীক্ষার দ্বারা সহজে বোঝা যায়।

পরীক্ষাঃ একটি টেস্ট-টিউবের মধ্যে লম্বা আকারের কিছু লোহার কুচি একটু আলগাভাবে ভর্তি করে টেস্ট-টিউবের মুখটি কর্ক দিয়ে বন্ধ করা হল। এই অবস্থায় টেস্ট-টিউবটি একটি চৌম্বক পদার্থের মত ব্যবহার করে। লোহার কুচিপূর্ণ টেস্ট-টিউবটির কাছে একটি দণ্ড-চুম্বক আনলে দেখা যায় ওর দুই প্রান্তই চুম্বক আকৃষ্ট হয়।



লোহার কুচিপূর্ণ টেস্ট-টিউবকে চুম্বকে পরিণত করা।

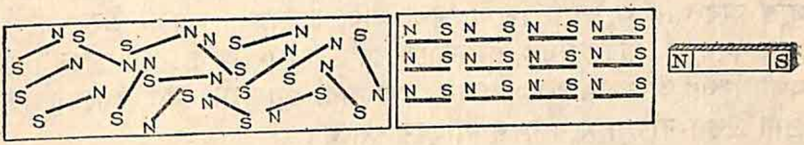
এইবার টেস্ট-টিউবটিকে টেবিলের উপর অনুভূমিকভাবে রেখে একটি শক্তিশালী দণ্ড-চুম্বক টেস্ট-টিউবটির একপ্রান্ত থেকে টেনে অপর প্রান্তে নিয়ে চুম্বকটিকে তুলে আবার আগের মত একইভাবে টানলে দেখা যাবে লোহার কুচিগুলি পর পর দৈর্ঘ্য বরাবর সজ্জিত হয়ে গেছে এবং লোহার কুচিপূর্ণ টেস্ট-টিউবটি একটি দণ্ড-চুম্বকের মত ব্যবহার করছে। এর এক প্রান্তে উত্তর মেরু এবং অপর প্রান্তে দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হয়েছে। এখন দণ্ড-চুম্বকটিকে সরিয়ে নিয়ে টেস্ট-টিউবটিকে বার বার ঝাঁকুনি দিলে দেখা গেল, লোহার কুচিগুলি আবার এলোমেলো হয়ে গেল। এই অবস্থায় চুম্বক-শলাকা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল, টেস্ট-টিউব তার চুম্বক ধর্ম হারিয়ে ফেলেছে।

7.12 আণবিক তত্ত্বের সাহায্যে চৌম্বক আবেশের ব্যাখ্যা

একটি শক্তিশালী চুম্বকের একটি মেরুকে চৌম্বক পদার্থের কাছে আনলে আবেশের ফলে চৌম্বক পদার্থের নিকট প্রান্তে বিপরীত মেরু এবং দূর প্রান্তে সমমেরুর সৃষ্টি হয়। এই ঘটনাটি চুম্বকের আণবিক তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

কোন চৌম্বক পদার্থের কাছে একটি শক্তিশালী চুম্বকের কোন মেরুকে আনলে, চৌম্বক পদার্থের অণু-চুম্বকের বদ্ধমুখ শৃঙ্খলগুলি খুলে যায়। ধরি, শক্তিশালী চুম্বকের উত্তর মেরুকে চৌম্বক পদার্থের কাছে আনা হল, এর ফলে ওর খুলে যাওয়া বদ্ধ শৃঙ্খলের অণু-চুম্বকগুলির দক্ষিণ মেরুগুলি, চুম্বকের উত্তর মেরুর আকর্ষণে উত্তর মেরুর

দিকে এবং অণু-চুম্বকের উত্তর মেরুগুলি বিকর্ষণের প্রভাবে বিপরীত দিকে ঘুরে যায়। এর ফলে শক্তিশালী চুম্বকটির আবেশী মেরু অর্থাৎ



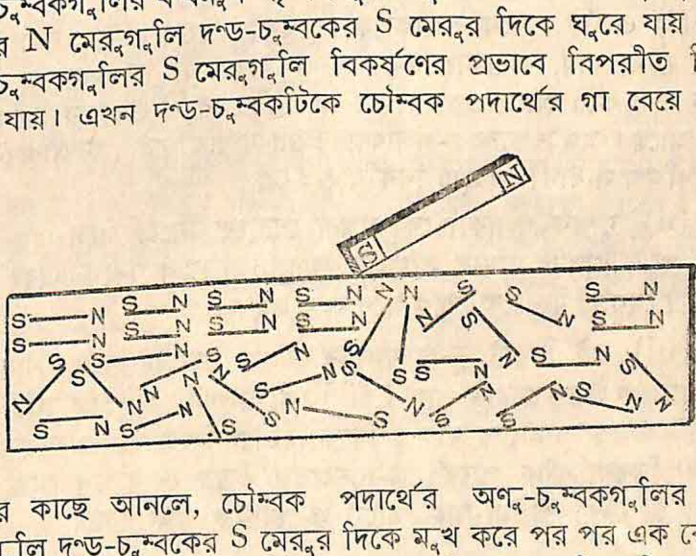
চৌম্বক পদার্থে অণু-চুম্বকের বদ্ধমূল শৃঙ্খল।

আবেশের ফলে অণু-চুম্বকগুলির বিন্যাস।

N মেরুর নিকট প্রান্তে বিপরীত মেরু অর্থাৎ দক্ষিণ মেরু S এবং দূর প্রান্তে সমমেরু অর্থাৎ উত্তর মেরু N সৃষ্টি হয়।

7.13 আণবিক তত্ত্বের সাহায্যে ঘর্ষণে চুম্বকিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা

একটি শক্তিশালী দণ্ড-চুম্বকের ধরি S মেরুকে একটি চৌম্বক পদার্থের একপ্রান্তে স্পর্শ করালে আকর্ষণের প্রভাবে চৌম্বক পদার্থের অণু-চুম্বকগুলির বদ্ধমুখ শৃঙ্খলগুলি খুলে যায় এবং অণু-চুম্বকগুলির N মেরুগুলি দণ্ড-চুম্বকের S মেরুর দিকে ঘুরে যায় এবং অণু-চুম্বকগুলির S মেরুগুলি বিকর্ষণের প্রভাবে বিপরীত দিকে ঘুরে যায়। এখন দণ্ড-চুম্বকটিকে চৌম্বক পদার্থের গা বেয়ে অন্য



প্রান্তের কাছে আনলে, চৌম্বক পদার্থের অণু-চুম্বকগুলির N মেরুগুলি দণ্ড-চুম্বকের S মেরুর দিকে মুখ করে পর পর এক রেখায় সজ্জিত হয়ে যায়, ফলে ঐ প্রান্তে ঘর্ষণকারী মেরুর বিপরীত মেরু এক্ষেত্রে N মেরুর উৎপত্তি হয় এবং যে প্রান্তে ঘর্ষণ আরম্ভ করা হয়েছিল সেই প্রান্তে সমমেরু অর্থাৎ S মেরুর সৃষ্টি হয়, ফলে চৌম্বক পদার্থটি চুম্বকে পরিণত হয়।

7.14 ভূ-চুম্বকত্ব

একটি দণ্ড-চুম্বককে মাঝখানে পাকহীন সুতার সাহায্যে বেঁধে মুক্ত অবস্থায় ঝুলিয়ে দিলে দেখা যায়, চুম্বকটি সর্বদা উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে দাঁড়ায়। চুম্বক-শলাকাকে যে কোন দিকে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে যখন স্থির অবস্থায় আসে তখন দেখা যায়, ওর দুটি মেরু আগের মতই প্রায় উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা জানি, কোন চুম্বকের উত্তর মেরু অন্য একটি চুম্বকের উত্তর মেরুকে বিকর্ষণ করে এবং দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ সমমেরুর মধ্যে বিকর্ষণ এবং বিপরীত মেরুর মধ্যে আকর্ষণ হয়—এটাই চুম্বকের ধর্ম। সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি, নিশ্চয় কোন শক্তিশালী চুম্বকের আকর্ষণে চুম্বক-দণ্ড বা চুম্বক-শলাকাটি ঐ ভাবে উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে থাকে।

এইসব দেখে বিজ্ঞানী **ডঃ গিলবার্ট** মত প্রকাশ করেন যে, পৃথিবী নিজেই একটি বিরাট চুম্বক হিসাবে আচরণ করে। তিনি বলেন, যেহেতু পৃথিবী নিজেই একটি বিরাট চুম্বক, সুতরাং তার দুটি মেরুও নিশ্চয় থাকবে।

(i) একটি চুম্বক-শলাকাকে পৃথিবীর উত্তর মেরুর কাছে নিয়ে গেলে দেখা যায়, শলাকার উত্তর সন্ধানী মেরুটি সোজাসুজি নিচের দিকে মুখ করে আছে এবং দক্ষিণ সন্ধানী মেরুটি উপরের দিকে মুখ করে আছে। অর্থাৎ চুম্বক-শলাকার উত্তর সন্ধানী মেরুটি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং দক্ষিণ সন্ধানী মেরুটি বিকর্ষিত হচ্ছে।

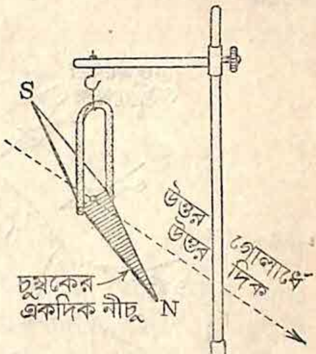
(ii) চুম্বক-শলাকাটিকে দক্ষিণ মেরুতে নিয়ে গেলে এর উল্টো ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ দক্ষিণ সন্ধানী মেরুটি নিচের দিকে এবং উত্তর সন্ধানী মেরুটি উপরের দিকে মুখ করে থাকে।

(iii) এই বিরাট ভূ-চুম্বকটির উত্তর মেরুটি আছে আমাদের ভৌগোলিক উত্তর মেরুর প্রায় 1,500 কিলোমিটার পশ্চিমে আর দক্ষিণ মেরুটি আছে আমাদের দক্ষিণ দিকে, ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুর প্রায় 1,400 কিলোমিটার পূর্বে, ভূ-চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু যোগ করলে যে রেখা পাওয়া যায়, তাকে ভূ-চৌম্বক অক্ষ বলে।

7.15 পৃথিবী যে একটি বিরাট চুম্বক নিচের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায়

• পরীক্ষাঃ (i) অচৌম্বক পদার্থ দিয়ে তৈরি, ধরা যাক্, একটা পিতলের দণ্ডকে তার ভারকেন্দ্র থেকে সুতা দিয়ে ঝুলিয়ে দিলে দেখা

যাবে সেটা অনুভূমিক অবস্থায় ঝুলছে। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় পিতলের দণ্ডটিকে নিয়ে গেলে দেখা যাবে, সব জায়গায় দণ্ডটি অনুভূমিক অবস্থায় আছে। এখন একটি চুম্বক-শলাকাকে তার ভার-কেন্দ্র থেকে অবাধে ঝুলতে পারে এমন অবস্থায় রাখলে দেখা যাবে চুম্বক-শলাকার অক্ষটি সব জায়গায় অনুভূমিক অবস্থায় থাকছে না; বিষুবরেখার কাছাকাছি জায়গায় এটি অনুভূমিক অবস্থায় থাকবে—তারপর যত উত্তর দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, শলাকার উত্তর সন্ধানী মেরুটি ক্রমেই নিচের দিকে ঝুলে থাকবে, আর দক্ষিণ সন্ধানী মেরু উপরের দিকে উঠে থাকবে। আবার দক্ষিণ দিকে নিয়ে গেলে দক্ষিণ সন্ধানী মেরুটি ক্রমশ নিচের দিকে ঝুলে থাকে ও উত্তর সন্ধানী মেরু উপরের দিকে উঠে থাকে।



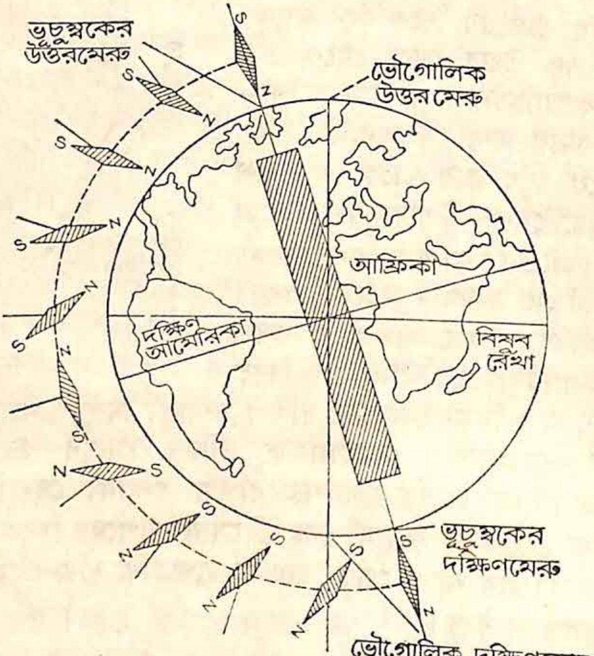
ভৌগোলিক উত্তর মেরু থেকে প্রায় 1,500 কিলোমিটার পশ্চিমে চুম্বক-শলাকার উত্তর সন্ধানী মেরুটি সোজা নিচের দিকে মুখ করে থাকে ও দক্ষিণ সন্ধানী মেরু সোজা উপরের দিকে মুখ করে থাকে। এতে বোঝা যায়, ভূ-চুম্বকের উত্তর মেরুটি এই জায়গায় অবস্থান করে। এর আকর্ষণের জন্য শলাকার উত্তর সন্ধানী মেরুটি সোজা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে, আর বিকর্ষণের জন্য দক্ষিণ-সন্ধানী মেরুটি খাড়া উপরের দিকে মুখ করে থাকে। **ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুর প্রায় 1,400 কিলোমিটার পূর্বে চুম্বক-শলাকার দক্ষিণ সন্ধানী মেরুটি সোজা নিচের দিকে এবং উত্তর সন্ধানী মেরুটি সোজা উপরের দিকে মুখ করে অবস্থান করে। এর দ্বারা বোঝা যায় ভূ-চুম্বকের দক্ষিণ মেরুটি এই জায়গায় অবস্থান করে।**

এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পৃথিবী নিজেই একটি বিরাট চুম্বক।

(ii) মাটির নিচে কোন চৌম্বক পদার্থকে অনেক দিন ধরে পুঁতে রাখলে ভূ-চুম্বকের প্রভাবে ঐ চৌম্বক পদার্থের মধ্যে সামান্য চৌম্বক ধর্ম প্রকাশ পায়। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে উল্লম্বভাবে রাখা লোহার দণ্ডের নিচপ্রান্তে উত্তর সন্ধানী মেরু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে অনুরূপ-ভাবে রাখা লোহার দণ্ডের নিচপ্রান্তে দক্ষিণ সন্ধানী মেরুর সৃষ্টি হয়। এর কারণ হল পৃথিবীর চৌম্বক শক্তি।

(iii) অন্যান্য চুম্বকের মত ভূ-চুম্বকও চৌম্বক পদার্থকে সামান্য ভাবে চুম্বকে পরিণত করতে পারে। একটি ইস্পাত দণ্ডকে ভূ-চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণমুখী করে ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরাল অবস্থায় অনেকদিন ধরে রেখে দিলে ইস্পাত দণ্ডটি দুর্বল চুম্বকে পরিণত হয়।

(iv) একটি বড় প্রাকৃতিক চুম্বককে পৃথিবীর আকারের মত তৈরি করে ওর গায়ে একটি ছোট চুম্বক-শলাকাকে অবাধে ঝুলিয়ে বিভিন্ন জায়গায় রাখলে দেখা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঝুলন্ত চুম্বক-শলাকা রাখলে যেমন আচরণ করে, এই শলাকাটিও ঠিক ঐ রকম আচরণ করছে।



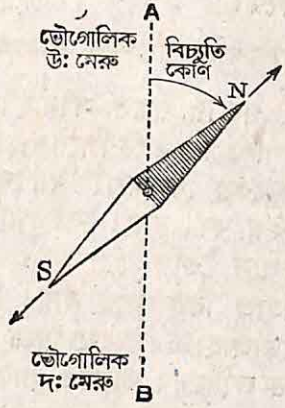
এই সব ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পৃথিবী নিজেই একটি বিরাট চুম্বক।

7.16 ভু-চুম্বকের চৌম্বক মূলরাশি (Magnetic elements of earth)

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্যের মান, অভিমুখ বিভিন্ন হয়। কোন স্থানের চৌম্বক ক্ষেত্র সঠিকভাবে প্রকাশ

করার জন্য যে রাশিগুলির প্রয়োজন, তাদের **ভূ-চৌম্বক মূলরাশি** বলে। এদের মধ্যে দুটি প্রধান; যেমন—(i) বিচ্যুতি কোণ ও (ii) বিনতি কোণ।

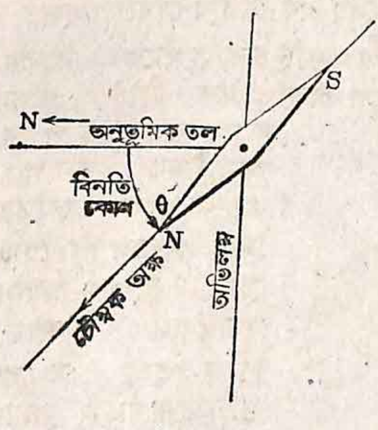
(1) **বিচ্যুতি কোণঃ** একটি চুম্বক-শলাকাকে মুক্তভাবে অনুভূমিক তলে রাখলে, শলাকাটি মোটামুটি উত্তর-দক্ষিণ-মুখী হয়ে থাকে। ভালভাবে লক্ষ্য করলে কিন্তু দেখা যাবে, ওর অক্ষ ঠিক উত্তর-দক্ষিণমুখী থাকে না। স্থানভেদে কমবেশী পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ঘুরে থাকে।



বিচ্যুতি কোণ।

● **সংজ্ঞাঃ কোন জায়গার চৌম্বক মধ্যতল, ভৌগোলিক মধ্যতলের সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে, তাকে ঐ জায়গার বিচ্যুতি কোণ বলে।**

'কোন জায়গার বিচ্যুতি কোণ $\frac{1}{2}^{\circ}$E' এই কথা বলতে এই বোঝায় যে, ঐ জায়গায় ভৌগোলিক এবং চৌম্বক মধ্যতলের মধ্যে $\frac{1}{2}^{\circ}$ কোণ উৎপন্ন হয় এবং চুম্বক-শলাকাটির উত্তর সন্ধানী মেরুটি ভৌগোলিক অক্ষের পূর্বদিকে অবস্থান করে।



বিনতি কোণ।

(2) **বিনতি কোণঃ** কোন জায়গায় উল্লম্বতলে মুক্ত অবস্থায় একটি চুম্বক-শলাকা ঝোলালে, চুম্বক-শলাকার বিলম্ব বিন্দুর মধ্য দিয়ে আঁকা অনুভূমিক তলের সঙ্গে, চুম্বক-শলাকার অক্ষ যে কোণ উৎপন্ন করে, তাকে ঐ জায়গার **বিনতি কোণ** বলে।

● **সংজ্ঞাঃ অবাধে ঘুরতে পারে এমন চুম্বক-শলাকার অক্ষ অনুভূমিক রেখার সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে, তাকে ঐ স্থানের বিনতি কোণ বলে।** 'কলকাতার বিনতি কোণ 31°N' বলতে বোঝায় যে, একটি বাধাহীন দন্ড-চুম্বককে উল্লম্ব তলে, তার ভারকেন্দ্র থেকে ঝুলিয়ে দিলে চুম্বক দন্ডটির অক্ষ, ভারকেন্দ্রের মধ্য দিয়ে অঙ্কিত অনুভূমিক

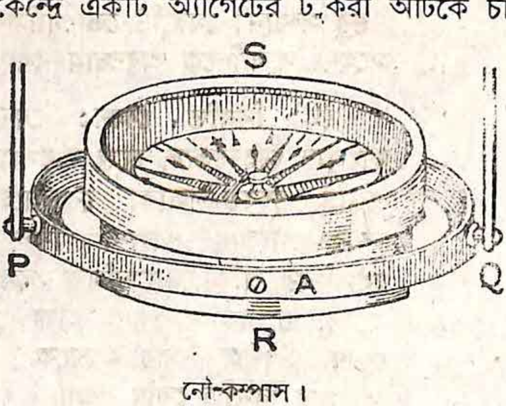
তলের সঙ্গে 31° কোণ উৎপন্ন করবে এবং উত্তর মেরুটি নিচের দিকে থাকবে।

7.17 কম্পাসের ব্যবহার (Uses of Compass)

গভীর রাতে সীমাহীন সমুদ্রের মাঝে বা মেঘলা দিনে ধু-ধু তেপান্তরের মাঠে গিয়ে পড়লে দিক্ ঠিক করতে পারা অসম্ভব ব্যাপার। চুম্বকের দিগ্‌দর্শী ধর্মকে এখানে কাজে লাগিয়ে অনায়াসেই দিক্ নির্ণয় করা যায়। সেইজন্য চুম্বক-শলাকা দিয়েই দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্র বা কম্পাস তৈরি করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে অকূল সমুদ্রের মাঝে জাহাজ ঠিক পথে যায়। বিশাল আকাশের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় উড়োজাহাজ এই যন্ত্র দিয়ে দিক্ নির্ণয় করে এগিয়ে চলে। তাছাড়া, এই যন্ত্র জরিপের কাজেও লাগে।

• **নৌ-কম্পাস**ঃ সমুদ্রের মাঝে জাহাজ চালাবার জন্য যে কম্পাস ববহার করা হয়, তাকেই **নৌ-কম্পাস** বলে। এই কম্পাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, ঢেউয়ের দোলায় জাহাজ যখন দুলতে থাকে, তখন নৌ-কম্পাসের চুম্বক-শলাকাটি না দুলেই অনুভূমিক তলে অবাধে ঘুরতে পারে। নিচে নৌ-কম্পাসের একটি ছবি দেখানো হলঃ

বর্ণনাঃ নৌ-কম্পাসে গোল কাগজের একটি চাকতি থাকে। চাকতির কেন্দ্রে একটি অ্যাগেটের টুকরা আটকে চাকতিটিকে একটি ছুঁচালো দণ্ডের উপরে অনুভূমিক অবস্থায় বসানো থাকে। চাকতির নিচে কতকগুলি ছোট ছোট চুম্বক-শলাকা সমান্তরাল সজ্জায়, চাকতির সঙ্গে আটকানো থাকে, অর্থাৎ চুম্বক-শলাকার উত্তর মেরুগুলিকে একদিকে পর পর রেখে চাকতির সঙ্গে আটকানো হয়। এই ব্যবস্থার ফলে চুম্বক-শলাকা ঘুরলে চাকতিটিও ঘুরতে থাকে। চাকতির উপরের পরিধিকে সমান 32 ভাগে ভাগ করা হয়। এই অবস্থায় চাকতির ব্যাসার্ধগুলি দ্বারা বিভিন্ন দিক্ নির্দেশ করা হয়। ভাগগুলির যে ভাগটি চুম্বক-শলাকার ঠিক উত্তর মেরুর উপর অবস্থিত সেখানে একটা মুকুট চিহ্ন থাকে। এটা সব সময় উত্তর মেরু নির্দেশ করে।



নৌ-কম্পাস।

জাহাজের দোলানি হলেও চুম্বক-শলাকা যেন সর্বদা অনুভূমিক তলে থাকে, সেইজন্য চাকতি ও চুম্বক-শলাকাকে একটি গোল বাক্সের ভেতরে বসিয়ে বাক্সটিকে একটি অনুভূমিক আংটার দুই বিপরীত বিন্দু RS-এর সঙ্গে এমনভাবে আটকানো থাকে যেন বাক্সটি আংটার RS ব্যাসকে অক্ষ করে দুলতে পারে। এই আংটা কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে P ও Q বিন্দুতে এমনভাবে আটকানো থাকে যেন আংটাটি PQ রেখাকে অক্ষ করে দুলতে পারে। PQ ও RS রেখা দুটি পরস্পর সমকোণে অবস্থান করে বলে সমুদ্রে দোলানি হলেও চুম্বক-শলাকাসহ চাকতিটি সব সময় অনুভূমিক তলে থাকে। এই ব্যবস্থাকে **গিম্বল** (Gimbal) ব্যবস্থা বলে।

- **ভাল নৌ-কম্পাসে নিচের গুণগুলি থাকা দরকার**

(i) কম্পাস কাঁটাটির দৈর্ঘ্য ছোট হবে। (ii) কম্পাস কাঁটাটি যেন শক্তিশালী চুম্বক হয়। (iii) কম্পাস কাঁটার চুম্বকত্ব যেন স্থায়ী হয়। (iv) কম্পাস কাঁটার কম্পন যেন তাড়াতাড়ি স্থির হয়। (v) বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় কম্পাস কাঁটাটি যেন স্থির থাকে।

প্রশ্নাবলী

[A] জ্ঞানমূলক:

(i) লোডস্টোন কি? চুম্বক কাকে বলে? চুম্বকত্ব বলতে কি বোঝ?
(ii) প্রাকৃতিক চুম্বক এবং কৃত্রিম চুম্বক কাকে বলে? বিভিন্ন আকারের কয়েকটি কৃত্রিম চুম্বকের নাম কর।
(iii) চুম্বকের কোন্ দুটি ধর্ম দেখা যায়?
(iv) উদাসীন রেখা কি?
(v) তড়িৎ চুম্বক কাকে বলে? এই চুম্বক কি করে তৈরি হয়?
(vi) চৌম্বক আবেশ কি? আবিষ্ট চুম্বক বলতে কি বোঝ?
(vii) গিলবার্ট কিজন্য বিখ্যাত?
(viii) তড়িৎ চুম্বক স্থায়ী না অস্থায়ী। এই চুম্বকের শক্তি কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
(ix) চৌম্বক পদার্থ কাকে বলে? তিনটি চৌম্বক পদার্থের নাম কর।
(x) চৌম্বক অক্ষ কাকে বলে?
(xi) (a) চৌম্বক অক্ষ, (b) চুম্বক মেরু, (c) চৌম্বক মধ্যতল বলতে কি বোঝ?
(xii) চুম্বকত্ব সম্বন্ধে সহজ মতবাদটি বর্ণনা কর।
(xiii) (a) বিনতি কোণ, (b) বিচ্যুতি কোণ বলতে কি বোঝ?
(xiv) ভৌগোলিক মধ্যতল এবং চৌম্বক মধ্যতল বলতে কি বোঝ?
(xv) নৌ-কম্পাস কি?

(xvi) কোন্ ধরনের চুম্বকের নির্দিষ্ট আকার নেই?
(xvii) তড়িৎ চুম্বক তৈরির সময় কাঁচা লোহা না ইস্পাত—কোন্‌টি ব্যবহার করবে?
(xviii) যে তাপমাত্রায় চুম্বক তার চৌম্বকত্ব হারায় তাকে কি বলে?
(xix) চৌম্বক-রক্ষক বলতে কি বোঝ?
(xx) ভূ-চুম্বকের দক্ষিণ মেরু কোন্ গোলার্ধে অবস্থিত?
(xxi) কুরী বিন্দু কাকে বলে?
(xxii) চুম্বকের ধর্ম কি?

[B] **বোধমূলক**ঃ

(i) U-আকারের তড়িৎ চুম্বকের কোন্ প্রান্তে কি মেরুর সৃষ্টি হল জানবে কি করে?
(ii) কৃত্রিম চুম্বক কি উপায়ে তৈরি করা হয় বর্ণনা কর।
(iii) একটি নৌ-কম্পাসের বর্ণনা দাও। এর ব্যবহার বল।
(iv) কৃত্রিম চুম্বক এবং প্রাকৃতিক চুম্বকের তুলনা কর।
(v) 'পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক'—উক্তিটি বুঝিয়ে দাও।
(vi) 'বিকর্ষণই চুম্বকত্বের একমাত্র প্রমাণ'—ব্যাখ্যা কর।
(vii) চৌম্বক পদার্থ এবং অচৌম্বক পদার্থের উদাহরণ দাও এবং এদের মধ্যে তুলনা কর।
(viii) একটি চুম্বক শলাকাকে টেবিলের উপর রাখা হল। এর মেরুগুলি কিভাবে অবস্থান করবে? কারণ ব্যাখ্যা কর।
(ix) চুম্বকের মাঝখানে আকর্ষণ থাকে না কেন? মাঝখান থেকে একটি দণ্ড-চুম্বককে দু ভাগ করলে এর ধর্মের কি পরিবর্তন হবে?
(x) কোন জায়গার বিচ্যুতি কোণ $\frac{1}{2}^\circ$ E বলতে কি বোঝ?
(xi) কলকাতার বিনতি কোণ 31° N বলতে কি বোঝ?
(xii) অস্ট্রেলিয়ায় লোহার বেড়ার নিচ প্রান্তে কখনো কখনো দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হয় কেন?
(xiii) আণবিক তত্ত্ব অনুসারে চৌম্বক পদার্থের প্রতিটি অণুই হল এক একটি ছোট চুম্বক। উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।
(xiv) ইস্পাত একটি চৌম্বক পদার্থ অথচ একটি ইস্পাত-দণ্ড চুম্বক নয় কেন? এই ইস্পাত-দণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হবে কখন?
(xv) উত্তর মেরুর কাছে একটি লোহার বেড়ার নিচ প্রান্তে কোন্ মেরুর সৃষ্টি হবে এবং কেন?
(xvi) উত্তর-দক্ষিণমুখী লোহার সেতুর মধ্যে সামান্য চুম্বকত্ব দেখা দেয় কেন?
(xvii) সমুদ্রের ঢেউ জাহাজে দোলানির সৃষ্টি করলেও নৌ-কম্পাসের কাঁটা সর্বদা অনুভূমিক থাকে কি করে?
(xviii) 'আকর্ষণের আগে আবেশ হয়'—কথাটির মানে বুঝিয়ে দাও।
(xix) কোন্ কোন্ কারণে চুম্বকের চৌম্বকত্ব নষ্ট হয়?

(xx) 'চুম্বকের দিকদর্শী ধর্ম আছে'—উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

(xxi) আবিষ্ট চুম্বকের শক্তি কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

(xxii) বিষুবরেখায় বিনতি কোণ কত? কোন্ স্থানের বিনতি কোণ 90°?

[C] **প্রয়োগমূলক:**

(i) একইরকম দেখতে তিনটি দণ্ড আছে—এর একটি হল চুম্বক, আর একটি লোহা এবং শেষেরটি সীসা। কোন্ দণ্ডটি কি, কিভাবে নির্ণয় করবে?

(ii) 'পৃথিবী নিজেই বিরাট চুম্বক'—উক্তিটির যথার্থতা প্রমাণ কর।

(iii) তোমাকে দুটি লোহার দণ্ড দেওয়া হল যাদের মধ্যে একটি চুম্বক। অন্য কোন কিছুর সাহায্য না নিয়ে কি করে বুঝবে কোন্‌টি চুম্বক?

(iv) একটি দণ্ড-চুম্বক এবং একটি চুম্বক শলাকাকে এমন দূরত্বে রাখা হল যেন এদের সমমেরু দুটি মুখোমুখি থাকে অথচ বিকর্ষণ হয় না। এই অবস্থায় ওদের মাঝে একটি কাঁচা লোহার দণ্ড রাখলে কি হবে কারণ সহ বল।

(v) চুম্বকের মাঝখানে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ হয় না কেন?

(vi) ছাদে আটকানো উত্তর-দক্ষিণমুখী লোহার বরগা পরীক্ষা করলে এর মধ্যে সামান্য চুম্বকত্ব ধরা পড়ে—এর কারণ ব্যাখ্যা কর।

(vii) ঘর্ষণ প্রণালী দ্বারা চুম্বক তৈরি করার সময় কাঁচা লোহার বদলে ইস্পাত নেওয়া হয় কেন?

(viii) একটি তড়িৎ চুম্বকের শক্তি বৃদ্ধি করার উপায় বল।

(ix) সাধারণ চুম্বক এবং তড়িৎ চুম্বকের পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর।

[D] **দক্ষতামূলক:**

(i) বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম চুম্বকের চিত্র আঁক।

(ii) একটি U-আকারের তড়িৎ চুম্বকের চিত্র আঁক এবং কাঁচা লোহাটির উপর কিভাবে অন্তরিত তামার তার জড়ানো থাকে দেখাও।

(iii) যুগ্ম স্পর্শ-পদ্ধতি দ্বারা চুম্বকিত করার প্রক্রিয়ার চিত্র আঁক।

(iv) একটি দণ্ড-চুম্বকের চিত্র এঁকে উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, চৌম্বক অক্ষ, উদাসীন অঞ্চল, চৌম্বক দৈর্ঘ্য দেখাও।

(v) সাধারণ অবস্থায় একটি ইস্পাতের দণ্ডে ওর চুম্বক অণুগুলির বিন্যাস এবং দণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হলে পর চুম্বক অণুগুলির বিন্যাস চিত্র সাহায্যে দেখাও।

(vi) একটি নৌ-কম্পাসের চিত্র আঁক।

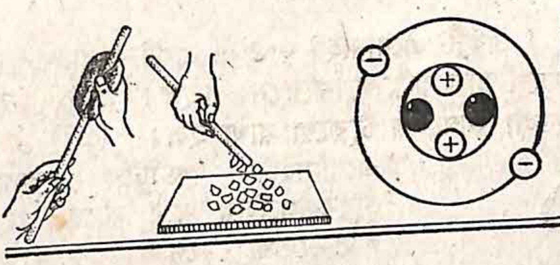
Objective type Questions :

1. **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(i) চুম্বকের দুটি বিশেষ ধর্ম আছে ; একটি হল — আর একটি —। (ii) দুটি চুম্বকের সমমেরু পরস্পর পরস্পরকে — আর বিপরীত মেরু পরস্পর পরস্পরকে — করে। (iii) শক্তিশালী চুম্বকের কাছে একটি লোহার দণ্ড আনলে দণ্ডটির নিকট প্রান্তে — মেরু আর দূর প্রান্তে — মেরুর সৃষ্টি হয়। (iv) একটি চুম্বক-শলাকাকে পৃথিবীর উত্তর মেরুর কাছে নিয়ে গেলে শলাকার — মেরুটি নিচের দিকে ও — মেরুটি উপরের দিকে মুখ করে থাকে।

2. **সঠিক উত্তরগুলিতে '√' চিহ্ন দাও ঃ**

(i) একটি দণ্ড-চুম্বকের মেরুকে বিকর্ষণ করে। এতে প্রমাণ হয় দণ্ডটি চৌম্বক পদার্থ/চুম্বক। (ii) চৌম্বক পদার্থের প্রত্যেকটি অণুই হল চুম্বক/চৌম্বক পদার্থ। (iii) দক্ষিণ মেরুতে চুম্বক-শলাকার উত্তর মেরু নিচের দিকে/উপরের দিকে মুখ করে থাকে। (iv) কোন চুম্বকের একটিমাত্র মেরু থাকতে পারে/পারে না। (v) সমমেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে/বিকর্ষণ করে। (vi) চুম্বকের সব জায়গায় চৌম্বকত্ব সমান/মাঝখানে বেশী/উত্তর মেরুতে বেশী/মেরু দুটিতে বেশী। (vii) চুম্বকের আণবিক তত্ত্বের প্রবক্তা গিলবার্ট/ওয়েবার। (viii) ভূ-চুম্বকের উত্তর মেরু এবং ভৌগোলিক উত্তর মেরু একই জায়গায়/ভৌগোলিক উত্তর মেরুর পশ্চিমে অবস্থান করে। (ix) চুম্বক-রক্ষক হল একটি চুম্বক/লোহার পাত। (x) একটি দণ্ড-চুম্বককে একটি লোহার দণ্ডের কাছে আনলে নিকট প্রান্তে সমমেরু/বিপরীত মেরুর সৃষ্টি হয়।



অষ্টম অধ্যায়

স্থির-তড়িৎ (STATICAL ELECTRICITY)

8.1 স্থির-তড়িৎ (Statical Electricity)

বর্ষাকাল। কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে ; হঠাৎ তীব্র এক আলোর ঝলক কালো মেঘের বুক চিরে ঝরে পড়লো। পরক্ষণেই কান ফাটানো আওয়াজে পৃথিবীর মাটি কেঁপে উঠলো। এই হল তড়িৎ বা বিদ্যুৎ—এই বিদ্যুৎ-ই মানব-সভ্যতায় এনেছে এক যুগান্তর। এখন থেকে প্রায় 2,500 বছর আগে গ্রীসের বিজ্ঞানী থেল্‌স দেখেন যে অ্যাম্বারকে পশম দিয়ে ঘর্ষণ করলে ঐ পদার্থটি (অ্যাম্বার) কাগজের ছোট টুকরা, কর্কের টুকরা, পাখির পালক ইত্যাদি হালকা বস্তুকে আকর্ষণ করতে পারে। তোমার প্ল্যাস্টিকের কলমটিকে পশম দিয়ে ঘর্ষণ করে ছোট ছোট কাগজের কুচির কাছে নিয়ে গেলে দেখবে কাগজের টুকরাগুলি লাফিয়ে উঠে কলমে আটকে যাচ্ছে। কতকগুলি বিশেষ বস্তুকে, বিশেষ কতকগুলি বস্তু দ্বারা ঘর্ষণ করলে এবং সঠিক সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা সম্পন্ন করলে প্রায় সব বস্তুর মধ্যে এই রকম আকর্ষণী শক্তির সঞ্চার হয়।

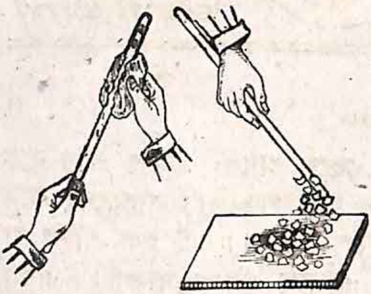
সুতরাং দেখা গেল, ঘর্ষণের ফলে বস্তুর মধ্যে একটি শক্তির সঞ্চার হয় যার ফলে ঐ বস্তুর মধ্যে আকর্ষণী ধর্মের সৃষ্টি হয়। এই শক্তিকে বিজ্ঞানীরা **তড়িৎ-শক্তি** বলেন এবং বস্তুর ঐ বিশেষ অবস্থাকে বস্তুটির **তড়িতায়িত অবস্থা** বলেন।

একটি **এবোনাইট** দণ্ডকে পশম দিয়ে জোরে ঘর্ষণ করলে মৃদু শব্দ উৎপন্ন হয়। ঘর্ষণের সময় খুব ছোট ছোট বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টির জন্য এই রকম শব্দের সৃষ্টি হয়।

তড়িৎকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; যথা—(1) **স্থির-তড়িৎ**, (2) **প্রবাহী-তড়িৎ**।

যে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ কোন বস্তুর একটি অংশে আবদ্ধ থাকে, অন্য কোন অংশে সঞ্চালিত হয় না, তাকে স্থির-তড়িৎ বলে। বিশেষ কয়েকটি পদার্থকে পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষণ করলে স্থির-তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাই একে **ঘর্ষণ-তড়িৎও** বলে।

●**পরীক্ষা** 1ঃ (i) একটি এবোনাইট দণ্ড ও একটুকরো পশমের কাপড় রোদের মধ্যে রেখে ভাল করে শুকিয়ে নেওয়া হল। (ii) টেবিলের উপর ছোট-ছোট পাতলা কাগজের টুকরো রাখা হল। (iii) এখন এবোনাইট দণ্ডটিকে কাগজ টুকরোগুলির খুব কাছে আনা হল—দেখা গেল কাগজের টুকরোগুলি এবোনাইট দণ্ড দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছে না। (iv) এইবার এবোনাইট দণ্ডটিকে একপ্রান্তে ধরে, অন্য প্রান্তে ঐ পশমের টুকরো দিয়ে কয়েকবার বেশ জোরে ঘর্ষণ করে, দণ্ডটিকে টেবিলের উপরে রাখা ছোট ছোট কাগজের টুকরোর উপর ধরা হল। (v) অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল—কাগজের টুকরোগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে এবোনাইট দণ্ডের গায়ে এসে আটকে যাচ্ছে। অথচ পশম দিয়ে ঘর্ষণ করার আগে এবোনাইট দণ্ডটি কিন্তু কাগজের টুকরোগুলিকে আকর্ষণ করতে পারেনি। (vi) একটি **কাচের দণ্ডকে সিল্ক দিয়ে ঘষে** ঐ কাচ দণ্ডটিকে কাগজের টুকরোগুলির কাছে ধরলে একই ব্যাপার ঘটে।



স্থির-তড়িৎ দ্বারা আকর্ষণ।

● **পরীক্ষা** 2ঃ শীতকালে রবার বা **প্ল্যাস্টিকের** চিরুনি দিয়ে শুকনো চুল আঁচড়াবার সময় কয়েকবার জোরে আঁচড়ালে দেখবে কেমন পট্ পট্ আওয়াজ হচ্ছে, আর চুলগুলিকে চিরুনি আকর্ষণ করার ফলে চুলগুলি খাড়া হয়ে উঠছে।

চিরুনি দিয়ে কয়েকবার জোরে চুল আঁচড়ে চিরুনিটিকে কাগজের টুকরোর কাছে ধরলে দেখা যাবে, চিরুনিটি কাগজগুলিকে আকর্ষণ করছে।



স্থির-তড়িৎ দ্বারা আকর্ষণ।

পরীক্ষাঃ 3ঃ (i) একটি দণ্ডের সঙ্গে সুতার সাহায্যে আটকানো একটি **শোলার বল** টেবিলের উপর রাখা হল। (ii) এইবার একটি কাচদণ্ডকে রেশমের টুকরো দিয়ে কয়েকবার ঘষে অথবা একটি এবোনাইট দণ্ডকে পশম দিয়ে ঘষে পৃথক পৃথক ভাবে ঐ শোলার বলের কাছে আনলে দেখা গেল কাচদণ্ড অথবা এবোনাইট দণ্ড—প্রত্যেকেই শোলার

বলটিকে আকর্ষণ করছে। (iii) কাচদণ্ড বা এবোনাইট দণ্ডটি দ্বারা বলটিকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বলটি ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে।



ঘর্ষণের ফলে স্থির তড়িতের উৎপত্তি।

ব্যাখ্যাঃ এইসব ঘটনার কারণ হল এই যে, **কতকগুলি শুষ্ক পদার্থের কোন অংশে অন্য পদার্থ দিয়ে ঘর্ষণ করলে ঘর্ষিত অংশে তড়িতের সঞ্চার হয়—যার ফলে পদার্থগুলির আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করার ক্ষমতা জন্মে। এই তড়িৎ কিন্তু বস্তুটির অন্য কোন অংশে ছড়িয়ে পড়ে না। এইভাবে ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট তড়িৎকে স্থির-তড়িৎ বলে।**

এবোনাইট, কাচ, রবার, গাটাপার্চা, গালা ইত্যাদি পদার্থকে যথাক্রমে **পশম, সিল্ক, শুকনো চুল বা পশমসমেত বিড়ালের চামড়া** দিয়ে ঘষলে খুব সহজে স্থির-বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। স্থির-বিদ্যুতের আকর্ষণ-ক্রিয়া দেখাবার জন্য **কর্ক বা শোলার ছোট টুকরা, শুকনো চুল, কাগজের টুকরা** নেওয়া হয়।

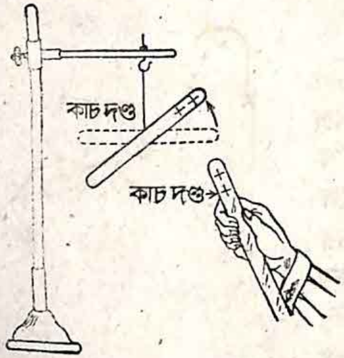
নিজে করে দেখো—বাথরুমে কলের মুখটি এমনভাবে খুলে দাও যেন কলের মুখ দিয়ে খুব সরু ধারায় জল পড়তে থাকে। এইবার প্লাস্টিকের চিরুনিকে পশম দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘর্ষণ কর। লক্ষ্য রাখবে যেদিকে চিরুনির দাঁত নেই সেই দিকটা পশম দিয়ে ঘর্ষণ করবে। এইবার ঐ ঘর্ষণ করা চিরুনির অংশটিকে কলের ঐ সরু জলধারার কাছে নিয়ে এসো। দেখবে ঐ জলধারা চিরুনি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে চিরুনির দিকে চলে আসছে।

8.2 পজিটিভ এবং নেগেটিভ তড়িৎ (Positive and negative Electricity)

স্থির-তড়িৎ দুই রকম ; যথা—(i) **পজিটিভ বা ধনাত্মক স্থির-তড়িৎ** এবং (ii) **নেগেটিভ বা ঋণাত্মক স্থির-তড়িৎ**। নিচের পরীক্ষাটি করলে এটা বোঝা যায়।

● **পরীক্ষাঃ** একটা কাচদণ্ড নিয়ে ওর একপ্রান্ত সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘর্ষণ করে ঐ প্রান্তে তড়িৎ সৃষ্টি করে একটি সিল্কের সুতা দিয়ে কাচদণ্ডটিকে একটি দণ্ডের সঙ্গে অনুভূমিক অবস্থায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এইবার আর একটি কাচদণ্ডকে সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ করে, ওর

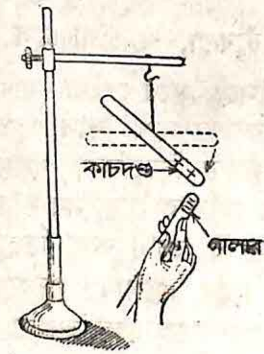
মধ্যে স্থির-তড়িৎ সৃষ্টি করার পর ঐ ঝোলানো কাচদণ্ডের যেদিকে সিল্ক দিয়ে ঘষা হয়েছিল তার কাছে আনা হল। দেখা গেল, দ্বিতীয় কাচদণ্ডটির তড়িৎগ্রস্ত প্রান্তটিকে ঝোলানো কাচদণ্ডের তড়িৎগ্রস্ত প্রান্তের কাছে আনার সঙ্গে সঙ্গে ঝোলানো কাচদণ্ডের প্রান্তটি বিকর্ষিত হয়ে দূরে সরে গেল।



সমজাতীয় স্থির-তড়িৎ দ্বারা বিকর্ষণ।

এইবার **একটি গালার দণ্ড নিয়ে ওর একপ্রান্তে পশম দিয়ে ঘর্ষণ করে** ঐ প্রান্তে স্থির-তড়িৎ সৃষ্টি করার পর ঐ প্রান্তটিকে, আগের ঝোলানো সিল্ক দিয়ে ঘষা কাচদণ্ডের তড়িৎগ্রস্ত প্রান্তের কাছে আনা হল। দেখা গেল, ঐ প্রান্তটি আকৃষ্ট হয়ে গালার তৈরি দণ্ডের কাছে সরে এলো।

সিদ্ধান্তঃ (i) পরীক্ষায় দেখা গেল, কাচদণ্ডের তড়িৎ অপর কাচদণ্ডের তড়িৎকে বিকর্ষণ করছে। এর থেকে বোঝা যায়, ঝোলানো কাচদণ্ডকে সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণের ফলে ওর মধ্যে যে জাতীয় তড়িতের সঞ্চার হয়, অপর কাচদণ্ডকে সিল্ক দিয়ে ঘষলে ঐ জাতীয় তড়িতের সঞ্চার হয়। এইজন্য ঝোলানো কাচদণ্ডের কাছে অপর কাচদণ্ডটি আনলে পরস্পরের মধ্যে বিকর্ষণ ঘটে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, **সমজাতীয় তড়িৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।**



(ii) কাচদণ্ডকে সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণের ফলে কাচদণ্ডের ঐ প্রান্তে যে জাতীয় তড়িৎ সঞ্চারিত হয়, গালার দণ্ডকে পশম দিয়ে ঘর্ষণ করলে তার বিপরীত জাতীয় তড়িৎ ঐ প্রান্তে সঞ্চারিত হয়। এইজন্য কাচদণ্ডের তড়িৎগ্রস্ত প্রান্তের কাছে গালার তড়িৎগ্রস্ত প্রান্ত আনলে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ ঘটে, ফলে ঝোলানো কাচদণ্ডটি কাছে সরে আসে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে বিপরীত জাতীয় তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

(iii) এই পরীক্ষায় বোঝা যায় যে, স্থির-তড়িৎ দুই রকমের ; বিজ্ঞানী **ফ্রাঙ্কলিন** ওদের নাম দেন—(a) **পজিটিভ তড়িৎ** এবং (b) **নেগেটিভ তড়িৎ।**

(a) কাচদণ্ডকে সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ করলে কাচদণ্ডে যে তড়িৎ পাওয়া যায়, তাকে **পজিটিভ** (+ve) **তড়িৎ** বলে, আবার গালা বা এবোনাইটকে পশম দিয়ে ঘর্ষণ করলে গালা বা এবোনাইট দণ্ডে যে তড়িৎ পাওয়া যায়, তাকে **নেগেটিভ** (−ve) **তড়িৎ** বলে।

• **উপরের পরীক্ষায় প্রমাণিত হল**—(i) **সমজাতীয় তড়িৎ পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করে,** যেমন—দুটি কাচদণ্ডের পজিটিভ (+ve) তড়িৎ পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করলো।

(ii) **বিপরীত জাতীয় তড়িৎ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে ;** যেমন—কাচদণ্ডের পজিটিভ (+ve) তড়িৎ এবং গালার দণ্ডের নেগেটিভ (−ve) তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করলো।

নানা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, দুটি বিভিন্ন বস্তুকে পরস্পর ঘর্ষণ করে পৃথক করলে, ওদের একটিতে পজিটিভ তড়িৎ ও অন্যটিতে নেগেটিভ তড়িতের সঞ্চার হয়। নিচের তালিকায় কতকগুলি পদার্থকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, ওদের যে-কোন দুটিকে পরস্পর ঘর্ষণ করলে ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে আগেরটিতে পজিটিভ (+ve) তড়িৎ ও পরেরটিতে নেগেটিভ (−ve) তড়িতের সঞ্চার হয়।

1 পশম	4 সিল্ক	7 ধাতু	10 অ্যাম্বার
2 কাচ	5 কাঠ	8 এবোনাইট	11 রজন
3 কাগজ	6 মানুষের দেহ	9 গালা	12 সেলুলয়েড

[একটি কাগজের ফালিকে পশম দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘর্ষণ করা হল। এইবার কাগজের ফালিটিকে দু ভাঁজ করে টান করা সুতার উপর থেকে ঝুলিয়ে দাও। দেখা গেল, কাগজটির ফালি দুটি বিকর্ষিত হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। এর কারণ হল, পশম দিয়ে ঘর্ষণ করায় কাগজের ফালিতে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয়েছে ঐ তড়িৎ সমজাতীয় বলে পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে, তাই ফালি দুটি পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। এখন উপরের তালিকা দেখে বল কাগজের ফালিতে কি জাতীয় তড়িৎ সৃষ্টি হয়েছে।]

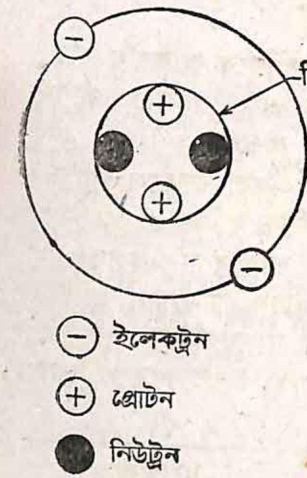
8.3 ইলেকট্রনীয় মতবাদ দ্বারা পজিটিভ ও নেগেটিভ তড়িৎ সঞ্চারের ব্যাখ্যা

কোন বস্তুর মধ্যে কিভাবে নেগেটিভ বা পজিটিভ তড়িতের সঞ্চার হয়, পরমাণুর গঠন জানলে বুঝতে পারা যায়।

সব মৌলিক পদার্থের পরমাণু তিন রকম আদি কণা—(i) **ইলেকট্রন**, (ii) **প্রোটন** এবং (iii) **নিউট্রন** দিয়ে তৈরি। শুধু সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুতে নিউট্রন থাকে না।

(i) **ইলেকট্রনঃ** এই কণাটি **নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত**। এর ভর $=9{\cdot}11\times10^{-28}$ গ্রাম বা একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের $\frac{1}{1837}$ গুণ—অর্থাৎ এই কণার ভর নগণ্য। প্রত্যেক ইলেকট্রনে একক মাত্রার নেগেটিভ তড়িৎ বর্তমান থাকে।

(ii) **প্রোটনঃ** এই আদি কণাটি **পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত**। এর ভর $=1{\cdot}6725\times10^{-24}$ গ্রাম, অর্থাৎ একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের প্রায় সমান। প্রত্যেক প্রোটনে একক মাত্রার পজিটিভ তড়িৎ বর্তমান থাকে।



পরমাণুর গঠন।

ইলেকট্রনে ঠিক যে পরিমাণ নেগেটিভ তড়িৎ থাকে প্রোটনে ঠিক সেই পরিমাণ পজিটিভ তড়িৎ থাকে।

(iii) **নিউট্রনঃ** এই আদি কণাটিও পরমাণুর মধ্যে থাকে। এর ভর $=1{\cdot}675\times10^{-24}$ গ্রাম, অর্থাৎ একটি প্রোটনের ভরের প্রায় সমান কিন্তু এই কণায় কোন তড়িৎ নেই।

পরমাণুর কেন্দ্রে খুব ছোট জায়গায় প্রোটন ও নিউট্রন একসঙ্গে ঠাসাঠাসি অবস্থায় থাকে। একে **নিউক্লিয়াস** বলে। এই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষে ইলেকট্রনগুলি ঘুরতে থাকে। একটি পরমাণুর মধ্যে যতগুলি প্রোটন থাকে, ঠিক ততগুলি ইলেকট্রনও থাকে। সেইজন্য পরমাণু নিস্তড়িৎ।

এখন নিস্তড়িৎ পরমাণুতে কোন প্রক্রিয়া দ্বারা যদি ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যার পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়, তাহলে ঐ পরমাণুতে হয় ইলেকট্রন নতুবা প্রোটনের আধিক্য ঘটবে। এই অবস্থায় পরমাণুটি তড়িৎগ্রস্ত হবে।

(i) যদি কোন পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহলে ঐ পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে যায়, প্রোটনের সংখ্যা কিন্তু একই থাকে। এর ফলে পরমাণুটির মধ্যে **প্রোটন** অর্থাৎ **পজিটিভ তড়িতের আধিক্য ঘটে, ফলে পরমাণুটি পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত** কণায় পরিণত হয়।

(ii) বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রনগুলি যদি কোন নিস্তড়িৎ পরমাণুতে যুক্ত হয়, **তাহলে ঐ পরমাণুতে ইলেকট্রনের আধিক্য ঘটে। ফলে পরমাণুটি নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত হয়।** এইরকম তড়িৎগ্রস্ত পরমাণুর নাম **আয়ন।** পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত পরমাণুকে **ক্যাটায়ন** ও নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত পরমাণুকে **অ্যানায়ন** বলে।

(iii) তাহলে বোঝা গেল যে, কোন **বস্তুর পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত হওয়ার কারণ হল ওর মধ্যে ইলেকট্রনের ঘাটতি আর নেগেটিভ তড়িৎ-গ্রস্ত হওয়ার কারণ হল ওর মধ্যে ইলেকট্রনের আধিক্য।**

• ইলেকট্রনীয় মতবাদ অনুসারে ঘর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন স্থির-তড়িতের ব্যাখ্যা ঃ

প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুর মধ্যে প্রোটনের আকর্ষণে ইলেকট্রনগুলি পরমাণুতে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু প্রোটন ও ইলেকট্রনের মধ্যে এই আকর্ষণ বল সব পরমাণুতে সমান নয়। এখন দুটি বিভিন্ন বস্তুকে পরস্পর ঘর্ষণ করলে, যে বস্তুর পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম, সেই বস্তু থেকে কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন, যে বস্তুর পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন ও প্রোটনের আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত বেশী তার মধ্যে চলে যায়। এর ফলে যে বস্তু থেকে ইলেকট্রন চলে যায় তাতে ইলেকট্রনের ঘাটতি হওয়ায় বস্তুটি পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত হবে, আর যার মধ্যে ইলেকট্রন যায় সেই পদার্থে ইলেকট্রনের আধিক্য ঘটায় বস্তুটি নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত হয়। একটি বস্তু থেকে যত সংখ্যক ইলেকট্রন মুক্ত হয়, ঠিক সেই সংখ্যক ইলেকট্রন অপরটিতে যুক্ত হয়। কাজেই একটির পজিটিভ তড়িৎ আর একটির নেগেটিভ তড়িতের পরিমাণ সমান হবে।

যেমন, (i) সিল্কের তুলনায় কাচের মধ্যস্থ পরমাণুতে প্রোটন ইলেকট্রনের আকর্ষণ কম। এখন একটুকরা সিল্ক দিয়ে একটি কাচ-দণ্ডকে ঘষলে, কাচের মধ্যস্থ পরমাণু থেকে কিছু সংখ্যক আলগা ইলেকট্রন সিল্কের মধ্যে চলে যায়। **ফলে কাচদণ্ডটি পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত এবং সিল্ক নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত হয়।**

(ii) পশম দিয়ে একটা এবোনাইটের দণ্ডকে ঘষলে, পশমের মধ্যস্থ পরমাণুর আলগা ইলেকট্রনগুলি এবোনাইট দণ্ডের মধ্যে চলে আসে—এর ফলে **এবোনাইট দণ্ডটি নেগেটিভ এবং পশম পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত** হয়।

• পেট্রোলবাহী গাড়ীর পিছন দিকে একটি লোহার শিকল মাটিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কেন?

পেট্রোলবাহী গাড়ী চলার সময় পেট্রোল এদিক-ওদিক নড়াচড়ার জন্য পেট্রোলের সঙ্গে আধারের লোহার ঘর্ষণ হয়, ফলে স্থির-তড়িৎ

উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন স্থির-তড়িতের পরিমাণ বেশী হলে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়ে পেট্রোলে আগুন ধরে যেতে পারে। এই বিপদ এড়াবার জন্য গাড়ী থেকে একটি লোহার শিকল মাটিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে ঘর্ষণে তড়িৎ উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে চলে যায়।

8.4 পরিবাহী ও অন্তরক

পরিবাহীঃ কতকগুলি পদার্থ আছে যাদের কোন অংশে তড়িতের সঞ্চার হলে কিংবা কোন অংশে একটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তু স্পর্শ করালে সেই তড়িৎ, পদার্থটির সব জায়গায় ছড়িয়ে যায়। যে পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎ এইভাবে পদার্থটির অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাকে পরিবাহী বলে।

রূপা সবচেয়ে ভাল পরিবাহী, তারপরেই আসে **তামা।** প্রায় সব **ধাতুই পরিবাহী।** অধাতুর মধ্যে **গ্রাফাইট, গ্যাসকার্বন** তড়িৎ পরিবাহী। অ্যাসিড, লবণ এবং ক্ষারের জলীয় দ্রবণ তড়িৎ পরিবহণ করে।

• **অন্তরকঃ কতকগুলি পদার্থ আছে যাদের কোন অংশে তড়িতের সঞ্চার হলে বা কোন অংশে একটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তু স্পর্শ করালে সেই তড়িৎ, পদার্থটির সেই অংশেই আবদ্ধ হয়ে থাকে, অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে না। এইরকম পদার্থকে অন্তরক বলে।** যেমন—কাচ, এবোনাইট, অভ্র, রবার, চীনামাটি, গন্ধক প্রভৃতি অন্তরক পদার্থ।

পরীক্ষাঃ (i) একটি কাচদণ্ডকে সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ করে পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত করা হল। এইবার কাচদণ্ডটিকে হাতে ধরে কাগজের টুকরার কাছে নিয়ে এলে দেখা যাবে, কাচদণ্ডটি কাগজের টুকরাগুলিকে আকর্ষণ করছে। কাচ অন্তরক পদার্থ তাই সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণের ফলে যেখানে সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ করা হয়েছে শুধু সেই অংশেই ঐ পজিটিভ তড়িৎ আটকে থাকে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে না। এই আবদ্ধ তড়িৎ কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করে। কাচদণ্ডের অন্যান্য অংশে কিন্তু এইরকম আকর্ষণ দেখা যাবে না অর্থাৎ অন্যান্য অংশে তড়িৎ থাকে না।



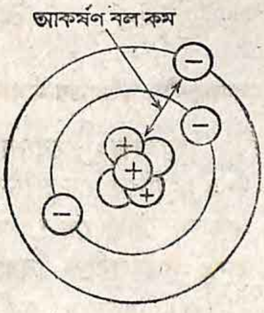
• **পিতলের দণ্ডকে হাতে ধরে সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ করলে ওর মধ্যে তড়িৎ সঞ্চার হয় না কেন?ঃ** একটা পিতলের দণ্ডকে হাত দিয়ে ধরে সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ করার পর কাগজের টুকরাগুলিকে কাছে নিয়ে এলে

দেখা যাবে যে, কাগজের টুকরাগুলিকে পিতলের দণ্ড আকর্ষণ করছে না। এর কারণ পিতল তড়িৎ-পরিবাহী। সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ করার ফলে ওর মধ্যে যে তড়িতের সঞ্চার হয়েছিল, সেই তড়িৎ, পিতলের দণ্ড ও হাতের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়ে মাটিতে চলে যায়। তার ফলে পিতলের দণ্ডে কোন তড়িৎ থাকে না। এই পরীক্ষায় যদি একটি অপরিবাহী পদার্থ যেমন কাঠের হাতল দিয়ে পিতলের দণ্ডটিকে ধরে সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ করে কাগজ টুকরার কাছে আনা হত, তাহলে দেখা যেত, পিতলের দণ্ডটি কাগজকে আকর্ষণ করছে। কাঠ অপরিবাহী বলে পিতলে সঞ্চারিত তড়িৎ কাঠের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়ে মাটিতে যেতে পারে না, পিতলের দণ্ডেই থেকে যায়।

সিদ্ধান্তঃ যে সব পদার্থের মধ্য দিয়ে সহজে তড়িৎ প্রবাহিত হয়, সেই সব পদার্থকে পরিবাহী বলে। আর যে পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয় না, তাদের অন্তরক পদার্থ বলে।

8.5 পরিবাহী এবং অপরিবাহীর ইলেকট্রনীয় ব্যাখ্যা

সব পদার্থের পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলি, নিউক্লিয়াসের মধ্যস্থ প্রোটনের আকর্ষণের ফলে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষে আবর্তন করে। এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাদের পরমাণুর মধ্যে প্রোটন ও সর্ব বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণ-বল কম। ফলে ঐ পদার্থের পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে পদার্থের অণুগুলির ফাঁকে ফাঁকে আলগাভাবে ঘুরে বেড়ায়। **পরিবাহী পদার্থগুলির মধ্যে এইরকম আলগা ইলেকট্রন থাকে বলে তারা তড়িৎ পরিবহণ করতে পারে।**



ইলেকট্রন ও প্রোটনের মধ্যে আকর্ষণ।

এইরকম পদার্থের সঙ্গে অতিরিক্ত ইলেকট্রন যোগ করলে, ইলেকট্রনগুলি পরস্পরের বিকর্ষণে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে নেগেটিভ তড়িৎ পরিবাহিত হয়। মনে রেখো, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের প্রোটন কখনো স্থান ত্যাগ করতে পারে না—মুক্ত ইলেকট্রনগুলিই চলাফেরা করতে পারে।

অপরিবাহী পদার্থের পরমাণুর মধ্যে নিউক্লিয়াসের প্রোটন ও বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণ তীব্র থাকায় **ঐ পদার্থে আলগা ইলেকট্রন থাকে না, ফলে ওকে তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর সংস্পর্শে আনলে ঐ তড়িৎ ছড়িয়ে পড়ে না।**

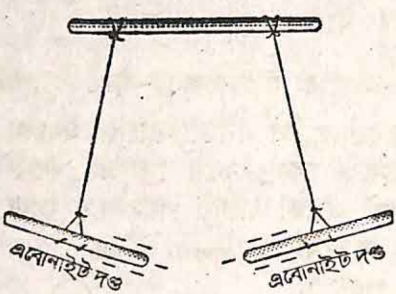
অ্যাসিড, ক্ষার ও লবণ জাতীয় পদার্থের জলীয় দ্রবণের মধ্যে দু রকম আয়ন থাকে—পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত ক্যাটায়ন ও নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত অ্যানায়ন। এই দু রকম আয়নই একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। সেইজন্য এইসব পদার্থও তড়িৎ-পরিবাহী।

8.6 দুটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল

দুটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তুকে পাশাপাশি রাখলে ঐ দুটি বস্তুর মধ্যে হয় আকর্ষণ নতুবা বিকর্ষণ হবে।

(i) **দুটি বস্তুর তড়িৎ যদি একই জাতীয় হয়, তাহলে ঐ দুটি বস্তুর মধ্যে বিকর্ষণ হবে।** (ii) **দুটি বস্তুর তড়িৎ যদি বিপরীত জাতীয় হয়, তাহলে বস্তু দুটির মধ্যে আকর্ষণ হবে।**

পরীক্ষাঃ (i) দুটি এবোনাইটের দন্ড ও একটুকরা ফানেলকে রোদে শুকনো করে নেওয়া হল। এইবার এবোনাইট দন্ড দুটিকে ফানেল দিয়ে ঘর্ষণ করে, সিল্কের সুতা দিয়ে দন্ড দুটিকে উপর থেকে এমনভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হল যেন ঘষা প্রান্ত দুটি পরস্পরের মুখোমুখি ও পরস্পর থেকে সামান্য দূরে থাকে। দেখা গেল যে, দন্ড দুটি পরস্পর পরস্পরকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, অর্থাৎ দুটির মধ্যে বিকর্ষণ হচ্ছে।

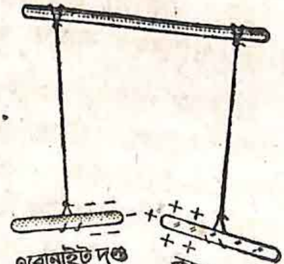


সমজাতীয় তড়িতের মধ্যে বিকর্ষণ।

সিদ্ধান্তঃ এবোনাইট দন্ড দুটিকে ফানেল দিয়ে ঘর্ষণ করার ফলে দন্ড দুটিতে নেগেটিভ তড়িতের সঞ্চার হয়।

এখানে দেখা গেল, **সমজাতীয় তড়িৎগ্রস্ত বস্তু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।**

(ii) এইবার একটি এবোনাইট দন্ড সরিয়ে সেই জায়গায় একটি কাচদন্ডকে সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ করে সিল্কের সুতা দিয়ে উপর থেকে এবোনাইট দন্ডের কাছে এমনভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হল যেন ঘষা প্রান্ত দুটি মুখোমুখি থাকে। দেখা গেল দন্ড দুটি পরস্পরের কাছে সরে এলো—অর্থাৎ আকর্ষণ হল।



বিপরীত জাতীয় তড়িতের মধ্যে আকর্ষণ।

সিদ্ধান্তঃ সিল্ক দিয়ে কাচদন্ডকে ঘর্ষণের ফলে কাচদন্ডটি পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত হয়। একে নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত এবোনাইট দন্ডের কাছে

আনার ফলে পরস্পর আকর্ষণ হল। **বিপরীত জাতীয় তড়িৎগ্রস্ত বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।**

● **নিজে কর :** দুটি রবারের বেলুনকে ফুলিয়ে সুতা দিয়ে বেঁধে একসঙ্গে ঝুলিয়ে দাও। দেখবে দুটি বেলুন পরস্পরকে স্পর্শ করে ঝুলছে। এইবার একটি পশম দিয়ে ঐ দুটি বেলুনকে ভাল করে ঘর্ষণ করে দেখ—দেখবে দুটি বেলুন বিকর্ষিত হয়ে পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়ে ঝুলছে।

প্রথমে বেলুন দুটি নিস্তড়িৎ ছিল, তাই পরস্পরের গায়ে ঠেকে ঝুলছিল। পশম দিয়ে ঘর্ষণ করায় বেলুন দুটি নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত হল। দুটি বেলুনেই সমজাতীয় তড়িৎ থাকায় পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, তাই দূরে সরে যায়।

8.7 কুলম্বের সূত্র—দুটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের পরিমাণ

দুটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের পরিমাণ নিচের দুটি নিয়ম অনুযায়ী হয়। এই নিয়ম দুটি **কুলম্বের সূত্র** নামে পরিচিত।

(i) দুটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কাজ করে তার পরিমাণ, বস্তু দুটির মধ্যে তড়িতের পরিমাণের গুণফলের সমানুপাতিক (বস্তু দুটির মাঝের দূরত্ব স্থির থাকলে)।

উপরের পরীক্ষায় দূরত্ব স্থির রেখে এবোনাইটদণ্ড দুটিতে নেগেটিভ তড়িতের পরিমাণ যদি বেশী হত তাহলে পরস্পরের মধ্যে বিকর্ষণ আরো বেশী হত।

পরীক্ষাটির দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত কাচদণ্ড ও নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত এবোনাইটদণ্ডের মধ্যে যে আকর্ষণ বলের সৃষ্টি হয়, তা নির্ভর করবে বস্তু দুটির মধ্যে যে তড়িৎ আছে তার পরিমাণের উপর। উভয়ের দূরত্ব স্থির রেখে, বস্তু দুটির মধ্যে তড়িতের পরিমাণ আরো বেশী হলে, দুটির মধ্যে আকর্ষণ আরো বেশী হবে। যেমন, দূরত্ব স্থির রেখে বস্তু দুটিতে তড়িতের পরিমাণ একটির 2 গুণ এবং অপরটির 4 গুণ বাড়ালে বস্তু দুটির মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল আগের চেয়ে $2 \times 4 = 8$ গুণ বৃদ্ধি পাবে।

(ii) দুটি বস্তুর মধ্যে যে পরিমাণ তড়িৎ আছে তা স্থির রেখে, বস্তু দুটির মাঝের দূরত্ব যদি বাড়ানো হয়, তবে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কমে যাবে, আর দূরত্ব যদি কমানো যায়, তবে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল বেড়ে যাবে। অর্থাৎ, দুটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল বস্তু দুটির দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হয় (বস্তু দুটির তড়িৎ পরিমাণ স্থির)।

নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত এবোনাইট দণ্ড দুটির মাঝের দূরত্ব একটু

বাড়িয়ে দিলে দেখা যাবে বিকর্ষণ কম হচ্ছে—আরো বাড়ালে বিকর্ষণ দেখাই যাবে না। ঠিক ঐভাবে পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত কাচদণ্ড ও নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত এবোনাইট দণ্ডের মাঝের দূরত্ব কমালে দেখা যাবে আকর্ষণ বেশী হচ্ছে, আর দূরত্ব বাড়ালে আকর্ষণও কমে যাবে। দেখা গেছে, দুটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর তড়িৎ পরিমাণ স্থির রেখে, ওদের মধ্যে দূরত্ব, আগের দূরত্বের দ্বিগুণ বা তিনগুণ হলে, বস্তু দুটির মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের পরিমাণ যথাক্রমে পূর্বের $\frac{1}{4}$ বা $\frac{1}{9}$ অংশ হবে।

(iii) যে মাধ্যমে বস্তু দুটি অবস্থান করে **সেই মাধ্যমের প্রকৃতির উপরও বস্তু দুটির মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল নির্ভর করে।**

[দুটি বস্তুর মধ্যে যদি যথাক্রমে q_1 এবং q_2 পরিমাণ তড়িৎ থাকে এবং বস্তু দুটির মধ্যের দূরত্ব$=r$ হলে, কুলম্বের সূত্রানুযায়ী এদের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের পরিমাণ $F = \frac{K q_1 q_2}{r^2}$ হবে।

K একটি ধ্রুবক। এর মান বস্তু দুটি যে মাধ্যমে আছে তার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। শূন্য মাধ্যমে $K = 1$]

বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী **কুলম্ব, টর্শন তুলা** (Torsion balance) নামে একপ্রকার তুলাযন্ত্রের সাহায্যে দুটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে তড়িতের পরিমাণ ও তাদের মধ্যে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কাজ করে, তার পরিমাণ নির্ণয় করেন।

● **তড়িৎ পরিমাণের একক**ঃ বায়ু মাধ্যমের মধ্যে দুটি সমপরিমাণ একজাতীয় তড়িৎগ্রস্ত বস্তুকে পরস্পর থেকে একক দূরত্বে (এক সেণ্টিমিটার) রাখলে ওদের মধ্যে যদি একক বিকর্ষণ বল সৃষ্টি হয়, তাহলে ঐ বস্তু দুটির যে কোন একটির তড়িৎ পরিমাণকে স্থির তড়িতের একক পরিমাণ তড়িৎ বলে। এই একক **ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইউনিট বা e.s.u. নামে পরিচিত**। তড়িৎ পরিমাণের ব্যবহারিক একক হল কুলম্ব। 1 কুলম্ব $= 3 \times 10^9$ e.s.u.

8.8 চার্লস অগাস্টিন দ্য কুলম্ব (Charles Augastine Da Coulomb)

চার্লস কুলম্ব 1736 খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের অ্যাঙ্গুলেমে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের পড়া শেষ করার পর তিনি এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে শুরু করেন। পরে তিনি পদার্থবিদ্ এবং এঞ্জিনিয়ার হন। চুম্বকের ধর্ম বিষয়ে গবেষণা করে তিনি একাডেমি পুরস্কার পান। তড়িৎ আধান এবং চুম্বক মেরুর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ বল সম্বন্ধে নানা সূত্র আবিষ্কার করেন। চুম্বক ও তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ

ও বিকর্ষণ বলের পরিমাপ নির্ণয় করার জন্য তিনি একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করেন ; এই যন্ত্রকে **টর্শন তুলা** বলে। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি আবার একাডেমি পুরস্কার পান। তাঁরই আবিষ্কৃত 'কুলম্বের সূত্র' তড়িৎ-বিজ্ঞানে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। 1781 খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ একাডেমির সদস্য হন। 1806 খ্রীষ্টাব্দে এই বিজ্ঞানী মারা যান।

প্রশ্নাবলী

[A] জ্ঞানমূলক ঃ

(i) স্থির তড়িৎ কি ?
(ii) ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন কি ? ইলেকট্রন এবং প্রোটনের ভর কত ?
(iii) ইলেকট্রন এবং প্রোটনে কত পরিমাণ এবং কি জাতীয় তড়িৎ বর্তমান থাকে ?
(iv) পরিবাহী কাকে বলে—কয়েকটি পরিবাহীর নাম কর। সবচেয়ে ভাল পরিবাহী কি ?
(v) অন্তরক কি—দুটি অন্তরক পদার্থের নাম কর।
(vi) বিজ্ঞানী কুলম্ব কোন্ দেশের লোক ? কুলম্বের সূত্র বিবৃত কর।
(vii) সমজাতীয় তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ না বিকর্ষণ করে ?
(viii) ইলেকট্রন এবং প্রোটন পরস্পরকে আকর্ষণ বিকর্ষণ করবে ?
(ix) ইলেকট্রো স্ট্যাটিক ইউনিট কি ?
(x) কুলম্বীয় বল কি ?
(xi) টর্শন তুলাযন্ত্র কি—কে আবিষ্কার করেন ?
(xii) পরমাণুর কেন্দ্রককে কি বলে ? এর মধ্যে কি কি কণা থাকে ?
(xiii) দুটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে যে বল কাজ করে সেই বল কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?
(xiv) পরমাণু কোন্ কোন্ কণা দ্বারা গঠিত ? কোন্ পরমাণুতে নিউট্রন কণা নাই ?
(xv) পরমাণুর গঠন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
(xvi) দুটি অর্ধ পরিবাহীর নাম কর।

[B] বোধমূলক ঃ

(i) শীতকালে তেলহীন চুলে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ালে পট্ পট্ শব্দ করে কেন ?
(ii) একটি বস্তু থেকে কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন দ্বিতীয় বস্তুতে চলে গেলে প্রথম এবং দ্বিতীয় বস্তুতে কি জাতীয় তড়িৎ উৎপন্ন হবে ?
(iii) পশম দিয়ে এবোনাইট দণ্ডকে ঘর্ষণ করলে এবোনাইটে কি জাতীয় তড়িৎ উৎপন্ন হবে ?
(iv) কাচদণ্ডে রেশম দিয়ে ঘষলে কি হবে ? কোন্ বস্তুতে ইলেকট্রনের আধিক্য হলে কি হবে ?

(v) একটি বস্তুর মধ্যে প্রোটনের আধিক্য ঘটলে কি হবে?
(vi) স্থির-তড়িৎ কয় প্রকার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
(vii) ঘর্ষণে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয় সে বিষয়ে ইলেকট্রনীয় মতবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।
(viii) ইলেকট্রনীয় মতবাদের ভিত্তিতে পরিবাহী এবং অন্তরকের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
(ix) 'বিকর্ষণই তড়িৎ-এর অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ'—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
(x) একটি কাগজের ফালিকে পশম দিয়ে ঘর্ষণ করে কাগজটিকে ভাঁজ করে ঝুলিয়ে রাখলে কি দেখবে?—কারণ ব্যাখ্যা কর।

[C] প্রয়োগমূলক :

(i) পেট্রোলবাহী গাড়ীতে লাগানো একটি লম্বা লোহার শিকল মাটিতে ঝুলতে থাকে কেন?
(ii) দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ হলেই কি বুঝতে হবে যে বস্তু দুটি তড়িতাহিত? তোমার উত্তর যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
(iii) একটি পিতলের দণ্ডকে হাতে ধরে পশম দিয়ে ঘর্ষণ করলে দণ্ডটি কি তড়িতাহিত হবে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
(iv) দুটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে দূরত্ব বাড়লে ওদের মধ্যে আকর্ষণ বল কমবে না বাড়বে?
(v) নিচে দুটি করে বস্তু দেওয়া আছে। এদের পরস্পর ঘর্ষণ করলে কোন্‌টিতে কি জাতীয় তড়িৎ উৎপন্ন হবে এবং কেন?
(a) রেশম ও কাচদণ্ড (b) গালা এবং কাচ (c) পশম এবং তামার দণ্ড (d) রেশম এবং কাঠ।
(vi) দুটি বেলুনকে সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দিলে ওরা পাশাপাশি পরস্পরকে স্পর্শ করে ঝুলতে থাকে। বেলুন দুটিকে পশম দিয়ে ঘর্ষণ করার পর কি দেখবে?—কারণ ব্যাখ্যা কর।
(vii) শুষ্ক আবহাওয়ায় লবণের দানার সঙ্গে লঙ্কার গুঁড়া মিশে গেল। তোমার কাছে একটি প্লাস্টিকের চিরুনি আছে। লঙ্কার গুঁড়াকে লবণ থেকে পৃথক করতে পারবে কি?
(viii) একটি কাচের টেস্ট-টিউবকে রেশম দিয়ে ঘর্ষণ করার পর টেস্ট টিউবটিকে কাগজ টুকরোর কাছে আনা হল। কি দেখবে?—কারণ বল।
(ix) কল থেকে খুব সরু জলের ধারা পড়ছে। একটি প্লাস্টিকের চিরুনি দিয়ে মাথার চুলের মধ্যে কয়েকবার ঘর্ষণ করে ঐ জলধারার কাছে আনলে জলের ধারাটি বেঁকে যায় কেন বুঝিয়ে দাও।
(x) একটি ধাতুখণ্ড হাতে ধরে ঘর্ষণ দ্বারা তড়িতাহিত করা যায় না কেন? ধাতুদণ্ডটিকে আহিত করতে হলে কি পদ্ধতি অবলম্বন করবে?

(xi) একটি শোলার বলকে সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে ওর কাছে একটি তড়িতাহিত এবোনাইট দণ্ডকে আনলে বলটি আকৃষ্ট হয়ে কাছে আসে। এবোনাইট দণ্ড দিয়ে ওকে স্পর্শ করলে দূরে সরে যায় কেন ?

[D] দক্ষতামূলক :

(i) প্রয়োজনীয় চিত্র সহ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর যে বিপরীত জাতীয় তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং সমজাতীয় তড়িৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।

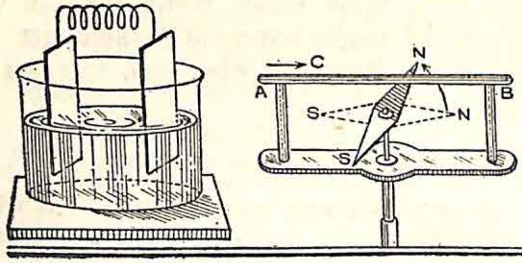
(ii) একটি পরমাণুর চিত্র এঁকে ইলেকট্রন, প্রোটন, এবং নিউট্রনের অবস্থান দেখাও।

(iii) একটি বস্তু তড়িতাহিত না নিস্তড়িৎ জানার জন্য কি পরীক্ষা করবে চিত্র সহ বর্ণনা কর।

Objective type Questions :

1. শূন্যস্থান পূরণ কর :
(i) কাচকে সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ করলে — তড়িতের সৃষ্টি হয়। (ii) পরিবাহীর পরমাণুগুলির মধ্যে প্রোটন ইলেকট্রনের আকর্ষণ — —। (iii) সমজাতীয় তড়িতের মধ্যে — — হয়। (iv) হাইড্রোজেন পরমাণুতে — নেই। (v) ধাতুর মধ্যে — সবচেয়ে ভাল তড়িৎ-পরিবাহী। (vi) টর্শন তুলা — আবিষ্কার করেন।

2. সঠিক উত্তরে '√' চিহ্ন দাও :
(i) এবোনাইটের দণ্ডকে পশম দিয়ে ঘষলে এবোনাইট দণ্ডে নেগেটিভ/পজিটিভ তড়িতের সৃষ্টি হয়। (ii) দুটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে দূরত্ব বাড়ালে তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল কমবে/বাড়বে। (iii) কাচকে সিল্ক দিয়ে ঘর্ষণ করলে কাচ নেগেটিভ/পজিটিভ তড়িৎ পায়, আর সিল্ক পজিটিভ/নেগেটিভ তড়িৎ পায়। (iv) সমজাতীয় তড়িতের মধ্যে আকর্ষণ/বিকর্ষণ হয়। (v) পরমাণুর কেন্দ্রে ইলেকট্রন/প্রোটন অবস্থান করে।



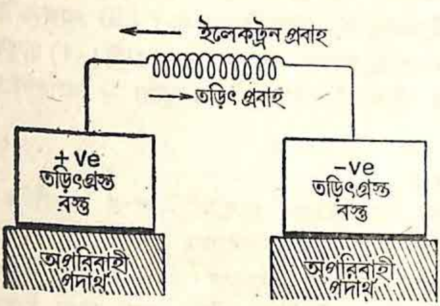
নবম অধ্যায়

প্রবাহী-তড়িৎ
(ELECTRIC CURRENT)

9.1 তড়িৎ-প্রবাহ (Electric Current)

কোটি কোটি জলের কণা কোন কারণে কোন একদিকে ছুটে চললে সৃষ্টি হয় জল-প্রবাহের। ঠিক এইভাবে কোটি কোটি তড়িৎগ্রস্ত কণা কোন কারণে যখন কোন এক নির্দিষ্ট দিকে চলতে শুরু করে, তখনই সৃষ্টি হয় তড়িৎ-প্রবাহের।

পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত কোন বস্তুর সঙ্গে নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত একটি বস্তুকে পরিবাহী তার দিয়ে যোগ করলে, পরিবাহীর মধ্যে যে আলগা ইলেকট্রনগুলি থাকে, সেগুলি পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর দিকে যায়—তাদের শূন্য-স্থান পূরণ করার জন্য ছুটে আসে নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর বাড়তি ইলেকট্রনগুলি। এর ফলে পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহ হয়, অর্থাৎ পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে তড়িদ্বাহী কণার প্রবাহ হয়, ফলে পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ হয়।



● **তড়িৎ-প্রবাহঃ কোন বল দ্বারা** (এই বলকে তড়িচ্চালক বল বলে) **তড়িদ্বাহী কণাগুলিকে (ইলেকট্রন বা আয়ন*) কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কোন নির্দিষ্ট দিকে চালনা করলে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়।** সুতরাং বলা যায়, পরিবাহীর মাধ্যমে তড়িৎগ্রস্ত কণাগুলির কোন নির্দিষ্ট অভিমুখে চলার ফলেই তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

---

* **আয়ন** ঃ পরমাণু নিস্তড়িৎ। কোন পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বর্জিত হলে পরমাণুটি পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত কণায় পরিণত হয়। এটিকে পজিটিভ আয়ন বা ক্যাটায়ন বলে। আবার কোন পরমাণুতে এক বা একাধিক ইলেকট্রন গৃহীত হলে পরমাণুটি নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত কণায় পরিণত হয়। একে অ্যানায়ন বলে।

• **তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখঃ কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন বা নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত কণা অর্থাৎ অ্যানায়নগুলি যে অভিমুখে চলে, তার বিপরীত দিকে তড়িৎ-প্রবাহ হয় বলে ধরা হয়।**

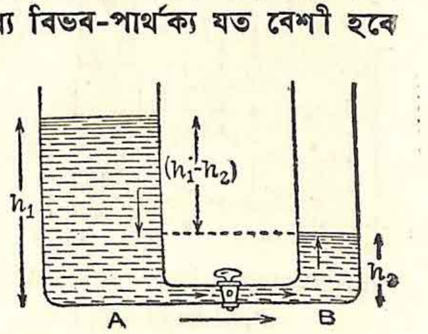
9.2 তড়িৎ-বিভব ও বিভব-পার্থক্য (Potential and Potential difference)

• **তড়িৎ-বিভবঃ** কোন পরিবাহীকে তড়িৎগ্রস্ত করলে, পরিবাহীটি অন্য বস্তুকে হয় তড়িৎ দিতে পারে বা অন্য কোন বস্তু থেকে তড়িৎ নিতে পারে। পদার্থটির এইরকম তড়িৎ-অবস্থাকে ওর **তড়িৎ-বিভব** বলে।

• **উচ্চ বিভবঃ যে শক্তির জন্য কোন পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত বস্তু** নিজের পজিটিভ তড়িৎকে কোন নিস্তড়িৎ বস্তু বা কোন নেগেটিভ বস্তুর মধ্যে সঞ্চালিত করে, সেই শক্তিকে **উচ্চ বিভব** বলে।

• **নিম্ন বিভবঃ যে শক্তির জন্য** কোন নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত বস্তু নিজের নেগেটিভ তড়িৎকে অন্য কোন পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত বস্তু বা নিস্তড়িৎ বস্তুতে সঞ্চালিত করে, তাকে **নিম্ন বিভব** বলে।

দুটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে বিভবের যে পার্থক্য হয়, তাকে **বিভব-পার্থক্য** বলে। উচ্চ বিভব ও নিম্ন বিভবযুক্ত দুটি বস্তুকে একটি পরিবাহী তার দিয়ে যোগ করলে ঐ পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ হবে। এই **প্রবাহের অভিমুখ হবে উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে**। তার মানে নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে যে বাড়তি ইলেকট্রন আছে সেইগুলি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে আসবে। এইভাবে পরিবাহীর মধ্যে ইলেকট্রনের প্রবাহ হবে, এর ফলে তড়িৎ-প্রবাহ ঘটবে। **দুটি বস্তুর মধ্যে বিভব-পার্থক্য যত বেশী হবে তড়িৎ-প্রবাহ তত বেশী হবে।** যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তু দুটির মধ্যে বিভব-পার্থক্য বজায় থাকবে, ততক্ষণই এই প্রবাহ চলতে থাকবে **—বিভব-পার্থক্য শূন্য হলেই প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে।**



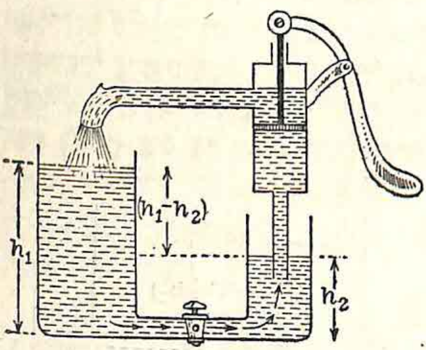
জলপ্রবাহের সঙ্গে তড়িৎ-প্রবাহের তুলনা।

অনেকক্ষণ ধরে সমপরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ পেতে হলে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্য সমভাবে বজায় থাকে। নিচে জলপ্রবাহ সংক্রান্ত দুটি উদাহরণ দিয়ে এটা বোঝানো হল।

(i) A এবং B দুটি পাত্র। পাত্র দুটি একটি অনুভূমিক নল দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত আছে। A পাত্রের জলের উচ্চতা (h_1), B পাত্রের জলের উচ্চতার (h_2) চেয়ে বেশী। এখন নলের স্টপ ককটি খুলে দিলে A পাত্র থেকে B পাত্রের দিকে নলের মধ্য দিয়ে জলের প্রবাহ হবে। এর ফলে A পাত্রের জলের উচ্চতা ক্রমে কমবে, আর B পাত্রের জলের উচ্চতা ক্রমে বাড়বে। শেষ পর্যন্ত দুই পাত্রে জলতলের উচ্চতা এক হয়ে গেলে নলের মধ্য দিয়ে জলপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে।

বিভব-পার্থক্য বিশিষ্ট দুটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তুকে একটি পরিবাহী তার দিয়ে যোগ করলে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যে তড়িৎ-প্রবাহ হয় সেটি অনেকটা ঐ নলের মধ্য দিয়ে জলপ্রবাহের মত। তড়িৎ-প্রবাহের ক্ষেত্রে পাত্র দুটির জলতলের উচ্চতার পার্থক্যকে বিভব-পার্থক্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়। **নলের মধ্য দিয়ে জলপ্রবাহ নির্ভর করে পাত্র দুটির জলতলের উচ্চতার পার্থক্যের উপর। ঠিক ঐভাবে কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ নির্ভর করে পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্যের উপর।**

(ii) এখন B পাত্রে যদি একটি পাম্প লাগানো হয়, আর নলের মধ্য দিয়ে A পাত্র থেকে B পাত্রে যে হারে জল আসে, ঠিক সেই হারে যদি পাম্পের হাতল দিয়ে B পাত্র থেকে জল তুলে A পাত্রে ফেলা হয়, তাহলে দুই পাত্রে জলতলের উচ্চতার পার্থক্য সর্বদা একই থাকবে। ফলে সব সময় নলটির মধ্য দিয়ে একই হারে জলপ্রবাহ হবে। এখানে হাতলের যান্ত্রিক-শক্তি জলতলের উচ্চতার পার্থক্য বজায় রাখছে। ঠিক এইভাবে কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালু রাখতে হলে অন্য কোন শক্তি প্রয়োগ করে পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্য বজায় রাখতে হবে। তড়িৎ-কোষে এইভাবে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যায়—যার রাসায়নিক শক্তি পরিবাহীর দুই প্রান্তের এই বিভব-পার্থক্য বজায় রাখে। ডায়নামোতে যান্ত্রিক শক্তি বিভব-পার্থক্য বজায় রেখে তড়িৎ-প্রবাহ চালু রাখে।

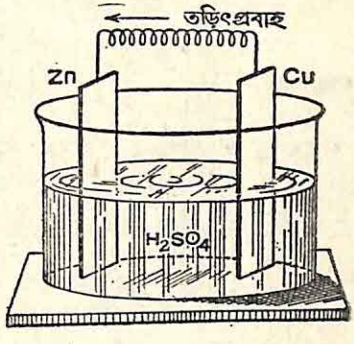


হাতলে প্রযুক্ত যান্ত্রিক-শক্তি জলতলের পার্থক্য বজায় রাখে।

9.8 সরল ভোল্টীয় কোষ (Simple voltaic cell)

• সংজ্ঞাঃ যে ব্যবস্থার সাহায্যে রাসায়নিক শক্তিকে তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, তাকে তড়িৎ-কোষ বলে।

বর্ণনাঃ একটি কাচপাত্রের মধ্যে **সালফিউরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ** রাখা হয়। একটি তামার পাত ও একটি জিঙ্কের পাতকে পরস্পরের সঙ্গে স্পর্শ না করিয়ে আংশিকভাবে ঐ দ্রবণের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। এর ফলে পাত দুটির মধ্যে আয়নের আদান-প্রদান চলে। এইভাবে আয়ন আদান-প্রদান করার জন্য তামার পাতটি উচ্চ বিভব বা পজিটিভ বিভব পায় আর জিঙ্কের পাতটি নিম্ন বিভব বা নেগেটিভ বিভব পায়।



সরল ভোল্টীয় কোষ।

• কোষের তড়িৎ-চালক বলঃ তামার পাত এবং জিঙ্কের পাত দুটিকে পরিবাহী তার দিয়ে যোগ না করলেও রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য তড়িৎ-কোষের এই পাত দুটির মধ্যে যে বিভব-পার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তাকে কোষের তড়িৎ-চালক বল বলে।

• ক্রিয়াঃ (i) লঘু H_2SO_4 জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে H^+ এবং $SO_4^=$ আয়নে পরিণত হয়। $H_2SO_4 \rightleftharpoons 2H^+ + SO_4^=$

(ii) অ্যাসিডে ডুবে থাকা অংশে জিঙ্কের পরমাণুগুলি, **জিঙ্ক** পাতে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে জিঙ্ক আয়নরূপে (Zn^{++}) অ্যাসিডের মধ্যে চলে আসে। $Zn + 2e \rightarrow Zn^{++}$। এর ফলে জিঙ্কের পাতটি কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়তি ইলেকট্রনে ভর্তি হয়ে নেগেটিভ বিভব পায়।

(iii) জিঙ্কের আয়নগুলি ইলেকট্রন ত্যাগ করার ফলে **পজিটিভ** তড়িৎগ্রস্ত হয়ে যায়, এদের বিকর্ষণে অ্যাসিডের মধ্যে পজিটিভ **তড়িৎ**-গ্রস্ত হাইড্রোজেন আয়নগুলি (H^+) বিকর্ষিত হয়ে তামার পাতের কাছে চলে যায়। এর ফলে তামার পাতটি পজিটিভ বিভব পায়।

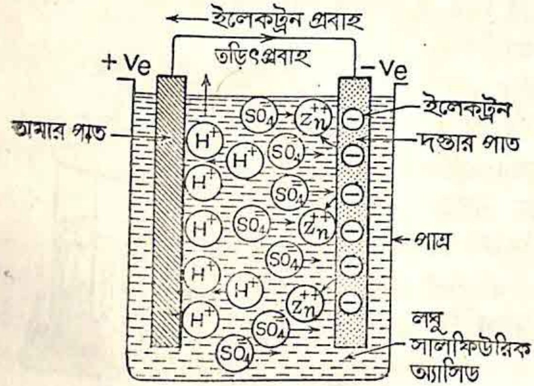
(iv) এখন পাত দুটিকে একটি পরিবাহী তার দিয়ে যোগ করলে জিঙ্কের পাত থেকে তামার পাতের দিকে ইলেকট্রন-প্রবাহ হবে।

(v) ফলে **তামার পাত থেকে জিঙ্কের পাতের দিকে তড়িৎ-প্রবাহ** হবে। সরল ভোল্টীয় কোষের **তড়িৎ-চালক বল** $= 1\cdot08$ **ভোল্ট হয়।**

(vi) এই **প্রবাহের অভিমুখ কোষের বাইরে হবে তামার পাত থেকে**

জিঙ্কের পাতের দিকে। আর কোষের ভেতরে হবে জিঙ্কের পাত থেকে তামার পাতের দিকে।

(vii) এখানে তামার পাতটিকে কোষের **পজিটিভ মেরু** ও জিঙ্কের পাতকে কোষের **নেগেটিভ মেরু** বলে। তড়িৎ-প্রবাহের এই সম্পূর্ণ পথকে **তড়িৎ-বর্তনী** বলে। এই গোটা বর্তনীর যে অংশ কোষের বাইরে থাকে, তাকে **বহির্বর্তনী** বলে, আর যে অংশ কোষের ভেতরে থাকে, তাকে **অন্তর্বর্তনী** বলে।



(iii) **তড়িৎ-কোষের দুটি তড়িৎ-দ্বারকে বহির্বর্তনীর সঙ্গে যোগ করলে তড়িৎদ্বার** দুটির মধ্যে যে বিভব-পার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তাকে **বিভব-পার্থক্য** বলে।

● **সরল ভোল্টীয় কোষের ত্রুটিঃ** এইরকম কোষের দুটি দোষ আছে—একটির নাম **স্থানীয় ক্রিয়া** ও আর একটির নাম **ছদন**।

(i) **স্থানীয় ক্রিয়াঃ** জিঙ্কের সঙ্গে অশুদ্ধি হিসাবে আয়রন, টিন, কার্বন, লেড ইত্যাদি থাকে। H_2SO_4-এর সংস্পর্শে এসে এই অশুদ্ধিগুলি পজিটিভ মেরুর কাজ করে। এর ফলে জিঙ্ক পাতের উপর দুটি ভিন্ন ধাতু থাকার ফলে, জিঙ্ক এবং অশুদ্ধিগুলি মিশে ছোট ছোট অনেকগুলি কোষের সৃষ্টি করে। H^+ আয়নগুলি কপার পাতে না গিয়ে এই অশুদ্ধিগুলির উপর জমা হয়। এর ফলে জিঙ্ক এবং কপার পাতের মধ্যে সংযোগ না করলেও এই অশুদ্ধিগুলির সঙ্গে জিঙ্কের সংযোগ থাকায় স্থানীয় তড়িৎ-প্রবাহ হতে থাকে। এর ফলে বহির্বর্তনীতে তড়িৎ-প্রবাহ না হলেও জিঙ্ক ক্ষয় পেতে থাকে। কোষের এই দোষকে **স্থানীয় ক্রিয়া** বলে।

প্রতিকারঃ এই দোষের জন্য কোষের জিঙ্কের পাতটি খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় আর সেই সঙ্গে অ্যাসিডের শক্তিও কমে যায়। এই দোষ মুক্ত করাতে হলে জিঙ্কের পাতটির উপর পারদের প্রলেপ দিতে হয়।

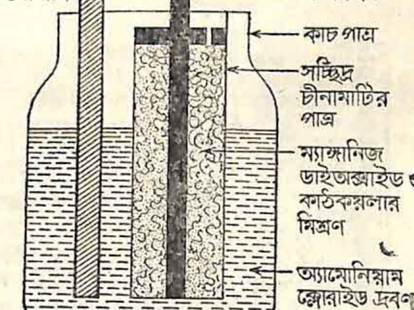
(ii) **ছদনঃ** তামার ও জিঙ্কের পাত একটি পরিবাহী তার দিয়ে যোগ করলে তড়িৎ-প্রবাহ হওয়ার ফলে তামার পাতের উপর হাইড্রোজেন গ্যাস জমে যায়। অনেকটা হাইড্রোজেন জমে গেলে ঐ হাইড্রোজেন গ্যাসের

স্তরকে ভেদ করে হাইড্রোজেন আয়নগুলি আর তামার পাতের সংস্পর্শে আসতে পারে না, ফলে তামার পাতটির পজিটিভ বিভব কমে যায় ; তাই কোষের তড়িৎ-চালক বল কমে যায়। ফলে তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। কোষের এই দোষকে **ছদন দোষ** বলে।

প্রতিকারঃ কোষের এই দোষ দূর করতে হলে একরকম রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করতে হয়। এই পদার্থ তামার পাতের উপর জমে থাকা হাইড্রোজেন গ্যাসকে জলে পরিণত করে। লেক্লান্স কোষে এই প্রক্রিয়ায় ছদন দোষ নিবারিত হয়।

9.4 লেক্লান্স কোষ (Leclanche cell)

● **বর্ণনাঃ** (i) এই কোষে একটি সচ্ছিদ্র চীনামাটির পাত্র থাকে। এই পাত্রের মাঝখানে একটি কার্বন-দণ্ডকে খাড়াভাবে দাঁড় করিয়ে বাকী জায়গায় ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড ও গ্রাফাইট গুঁড়ার মিশ্রণ দিয়ে ভর্তি করা থাকে। (ii) চীনামাটির পাত্রটির উপরের মুখে পিচ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। গ্যাস বেরোবার জন্য পিচের মধ্যে একটা ছোট ছিদ্র রাখা হয়। (iii) এই চীনামাটির পাত্র ও পারদের প্রলেপ দেওয়া একটা জিঙ্কের দণ্ডকে একটা বড় কাচপাত্রের মধ্যে রাখা **অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের** মধ্যে আংশিক ডুবিয়ে রাখা হয়।



লেক্লান্স কোষ।

(iv) **কার্বন-দণ্ডটি এই কোষে পজিটিভ মেরু** ও জিঙ্কের দণ্ডটি **নেগেটিভ মেরু** হবে। (v) এখন কার্বন ও জিঙ্কের দণ্ড দুটিকে একটি তামার তার দিয়ে যোগ করলে কার্বন-দণ্ড থেকে জিঙ্ক-দণ্ডের দিকে তড়িৎ-প্রবাহ হবে।

ত্রুটির প্রতিকারঃ এই কোষে (i) **ছদন দোষ বন্ধ করার জন্য ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করা হয়।** আর (ii) **স্থানীয় ক্রিয়া বন্ধ করার জন্য জিঙ্কের উপর পারদের প্রলেপ দেওয়া হয়।**

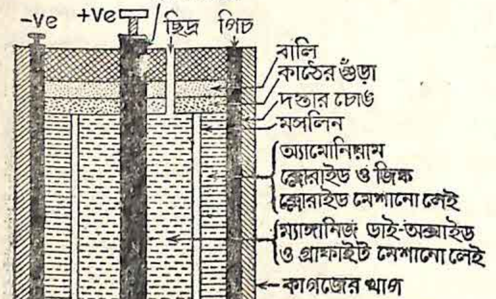
এই কোষের তড়িৎ-চালক বল 1·4 **ভোল্ট।**

● **ব্যবহারঃ** যেখানে বিরতিযুক্ত তড়িৎ-প্রবাহ দরকার সেই সব জায়গায় এই কোষ ব্যবহার করা হয়। তাই এই কোষ টেলিফোন,

টেলিগ্রাফ, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা এবং ল্যাবরেটরিতে নানা পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়। অবিরাম তড়িৎ-প্রবাহের দরকার হলে এই কোষ ব্যবহার করা যায় না, কারণ এই কোষ থেকে একটানা অনেকক্ষণ ধরে তড়িৎ-প্রবাহ নিলে প্রবাহ ক্রমশ কমে আসতে থাকে।

9.5 নির্জল কোষ (Dry cell)

● **বর্ণনাঃ** এই কোষের গঠন লেক্লান্স কোষেরই মত। (i) এই কোষে একটা জিঙ্কের তৈরি চোঙ থাকে। চোঙটির ভেতরের তলদেশটি একটি অন্তরক (আলকাতরা-মাখানো কাগজ) দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। (ii) জিঙ্কের চোঙের মাঝখানে একটা কার্বন-দণ্ড খাড়াভাবে দাঁড় করানো থাকে। কার্বন-দণ্ডটির তলদেশটি অন্তরক আলকাতরা-মাখানো কাগজটির উপর বসানো থাকে। (iii) কার্বন-দণ্ডের চারপাশে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড ও গ্রাফাইট চূর্ণ মেশানো একটা লেই তৈরি করে মাখানো থাকে। ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড ও গ্রাফাইট চূর্ণের এই লেই-কে একটি মসলিনের পর্দা দিয়ে জিঙ্কের দেওয়াল থেকে পৃথক করা থাকে। (iv) জিঙ্কের চোঙ ও মসলিনের মধ্যে যে অংশ থাকে, সেই অংশটি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, কাঠের গুঁড়া, সামান্য জিংক ক্লোরাইড ও জল মিশিয়ে তৈরি করা একটি লেই দিয়ে ভর্তি করা থাকে। (v) কোষের উপরের অংশে কাঠের গুঁড়ার স্তরের উপর বালির স্তর রেখে, পিচ গলিয়ে কোষের মুখটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভেতরের গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এর মধ্যে একটি ছিদ্র রাখা হয়। কার্বন-দণ্ডের উপর প্রান্তটি পিচের উপর বের করা থাকে। (vi) **এই কোষে কার্বন-দণ্ড পজিটিভ মেরু ও জিঙ্কের চোঙটি নেগেটিভ মেরু** হবে। (vii) জিঙ্কের চোঙটিকে একটি মোটা কাগজের মোড়কের মধ্যে রাখা হয়। এই কোষে কোন তরল থাকে না বলে একে **নির্জল কোষ** বলে। (viii) **এই কোষের তড়িৎ-চালক বল 1·4 ভোল্ট।**



নির্জল কোষ।

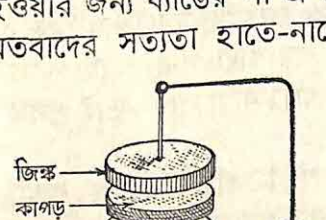
ব্যবহারঃ টর্চ লাইট, সাইকেলের আলো, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং রেডিওতে এই কোষ ব্যবহার করা হয়।

9.6 আলেকসান্দ্রো ভোল্টা

ইতালির **কোমো** শহরে বিখ্যাত বিজ্ঞানী **আলেকসান্দ্রো ভোল্টা** 1745 খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার পর তিনি বিজ্ঞানের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। 1779 খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হন।



বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক **গ্যালভানি** এই সময় একদিন সদ্য চামড়া-ছাড়ানো কতকগুলি ব্যাঙকে তামার হুকে আটকে একটি লোহার দণ্ড থেকে ঝুলিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, যখনই বাতাসে দোল খেতে খেতে ব্যাঙের পা লোহার দণ্ড স্পর্শ করছে তখনই বৈদ্যুতিক শক্ খেলে যেমন হয়, তেমনিভাবে ব্যাঙের পা হঠাৎ ছিটকে যাচ্ছে। তিনি ভাবলেন—এই কারণ হল বিদ্যুৎ—আর ব্যাঙের শরীরেই বিদ্যুৎ আছে। অধ্যাপক ভোল্টা কিন্তু গ্যালভানির এই মত সমর্থন করলেন না। তিনি বললেন—যখন দুটি বিভিন্ন ধাতু পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন ওদের সংযোগস্থলে একটা বিভব-পার্থক্যের সৃষ্টি হয়, ফলে তড়িৎ-প্রবাহ হয়। ব্যাঙের শরীর তড়িৎ-পরিবাহী—ওর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ হওয়ার জন্য ব্যাঙের পা ঐ রকম ছিটকে সরে গিয়েছিল। তিনি তাঁর মতবাদের সত্যতা হাতে-নাতে প্রমাণ করে দেখালেন। কপার এবং জিঙ্কের অনেকগুলি পাত নিয়ে এমনভাবে সাজালেন যেন কপার ও জিঙ্কের পাতগুলি পর পর সাজানো থাকে। প্রতি কপার ও জিঙ্কের পাতের মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিড ভেজানো কাপড় রেখে কপার ও জিঙ্কের পাতগুলিকে পরস্পর থেকে পৃথক রাখা হল। এই-ভাবে যে স্তূপটি তৈরি করলেন তাতে সবচেয়ে উপরে জিঙ্কের পাত ও সবচেয়ে নিচে কপার পাত রইল। এইবার উপরে জিঙ্কের পাতের সঙ্গে নিচের কপার পাত একটা পরিবাহী তার দিয়ে যোগ করে দেখালেন যে ঐ তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ হচ্ছে। এইটি



হল প্রথম তড়িৎ-কোষ সৃষ্টি। তড়িৎ-কোষে রাসায়নিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে পরিণত হয়। তাঁর এই আবিষ্কারের জন্য সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁকে উচ্চ সম্মান দেন। 1827 খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক ভোল্টা পরলোকগমন করেন।

9.7 পরিবাহীর রোধ এবং তড়িৎ-প্রবাহের উপর রোধের প্রভাব

তোমরা আগেই দেখেছ, একটা নলের দুই প্রান্তে উচ্চতার পার্থক্য থাকলে নলটির মধ্য দিয়ে জলপ্রবাহ হয়, এক সেকেণ্ডে ঐ নলের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ জল প্রবাহিত হয়, তাকেই জলপ্রবাহের মাত্রা বলে। যেমন—দেখা গেল স্নানের ঘরে কলের মুখ দিয়ে এক সেকেণ্ডে 5 গ্রাম জল পড়ছে, তবে বলা যায় যে, কলের মধ্যে জলপ্রবাহের মাত্রা 5 গ্রাম/সেকেণ্ড।

জলপ্রবাহের মাত্রার মত, পরিবাহীর কোন বিন্দুর মধ্য দিয়ে এক সেকেণ্ডে যে পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তাকে তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা বলে। **এক সেকেণ্ডে এক কুলম্ব [তড়িৎ-পরিমাণের একক] তড়িৎ প্রবাহিত হলে তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রাকে এক অ্যাম্পিয়ার** (ampere) বলে।

এখন জলতলের উচ্চতার পার্থক্য একই রেখে, নলটিকে মোটা, সরু বা লম্বা করলে দেখা যাবে, জলপ্রবাহের মাত্রা একই রকম হচ্ছে না—নলটি মোটা হলে জলপ্রবাহ বাধা কম পায়—তাই জলপ্রবাহ বেশী হয়। নলটি সরু বা লম্বা হলে বাধা বেশী হওয়ার জন্য জলপ্রবাহ কম হবে।

নলের মধ্য দিয়ে জলপ্রবাহের মত, কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ, **পরিবাহীর উপাদান, দৈর্ঘ্য** এবং **প্রস্থচ্ছেদের** উপর নির্ভর করে। মোটা তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ কম বাধা পায়—তাই প্রবাহ বেশী হয় এবং সরু তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহ বেশী বাধা পায়—তাই প্রবাহ কম হয়।

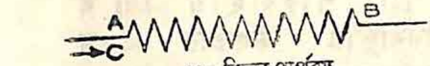
• **সংজ্ঞাঃ যে ধর্মের জন্য কোন পরিবাহী তড়িৎ-প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে, তাকে ঐ পরিবাহীর রোধ বলে।** রোধের **একককে ওহ্‌ম** (Ohm) বলে। এটি হল পরিবাহীর একটি বিশেষ ধর্ম।

পরিবাহীর রোধ কম হলে ঐ পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ বেশী হয়। পরিবাহীর রোধ বেশী হলে ওর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ কম হয়। কোন পরিবাহীর রোধ খুব বেশী হলে ওর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ হতেই পারে না—এইরকম পদার্থই হল **অন্তরক**।

কোন পরিবাহীর দুই প্রান্তে বিভব-পার্থক্য ঘটলে ঐ পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ হয়।

• **ওহ্‌মের সূত্র (Ohm's law) : পরিবাহীর উপাদান এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ ওর দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্যের সমানুপাতিক হয়।**

AB একটি পরিবাহী, A প্রান্তে উচ্চ বিভব এবং B প্রান্তে নিম্ন বিভব থাকে। ধরি A এবং B প্রান্তের বিভব-পার্থক্য $= V$, AB পরিবাহীর মধ্য দিয়ে C প্রবাহ হচ্ছে। তাহলে ওহ্‌মের সূত্রানুযায়ী পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্য V, তড়িৎ-প্রবাহ C-এর সমানুপাতিক হবে। অর্থাৎ, $V = CR$, R ধ্রুবক



$\frac{V}{C} = R$, এই ধ্রুবক হল পরিবাহীর রোধ।

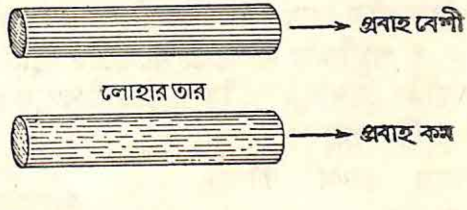
ধরি দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্য $= 15$ ভোল্ট, পরিবাহীর মধ্য দিয়ে 3 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ-প্রবাহ হয়। তাহলে পরিবাহীর রোধ,

$$R = \frac{V}{C} = \frac{15}{3} = 5 \text{ ওহ্‌ম}$$

9.8 পরিবাহীর রোধ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে

কোন পরিবাহীর রোধ নিচের বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে?

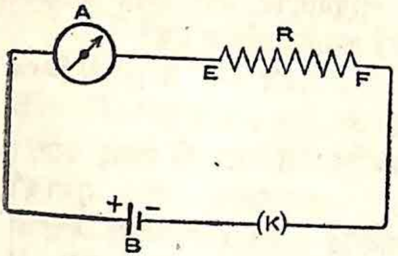
(i) **পরিবাহীর রোধ পরিবাহীর উপাদানের উপর নির্ভর করে :**
কোন পরিবাহীর উষ্ণতা, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদ স্থির রেখে যদি ওর উপাদান বিভিন্ন করা হয় তবে তার রোধও বিভিন্ন হবে।



যেমন, একই দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থচ্ছেদের রূপার তারের চেয়ে লোহার তারের রোধ বেশী।

• **পরীক্ষা : একটি তড়িৎ-কোষ (B), একটি রোধ (R), একটি** চাবি (K) ও তড়িৎ-প্রবাহ মাপবার যন্ত্র (A) (যাকে অ্যামিটার বলে) পর পর যোগ করে একটি বর্তনী গঠন করা হল। বর্তনীর মধ্য দিয়ে যে প্রবাহ হবে তা অ্যামিটার যন্ত্র থেকে পাওয়া যাবে। এখন বর্তনীর E ও F প্রান্তের সঙ্গে একই দৈর্ঘ্যের ও প্রস্থচ্ছেদের প্রথমে লোহার তার ও পরে তামার তার যোগ করে চাবি টিপে বর্তনীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করা হল। অ্যামিটার যন্ত্রে দেখা যাবে তামার তারের ক্ষেত্রে তড়িৎ-প্রবাহ বেশী হচ্ছে, আর লোহার তারের ক্ষেত্রে প্রবাহ কম হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ এই পরীক্ষায় বোঝা গেল, তামার তারের রোধ কম ও লোহার তারের রোধ বেশী। এর দ্বারা প্রমাণিত হল, রোধ পরিবাহীর উপাদানের উপর নির্ভর করে।



(ii) **পরিবাহীর রোধ পরিবাহীর উষ্ণতার উপর নির্ভর করেঃ** পরিবাহীর উষ্ণতা বাড়লে রোধ বেড়ে যায় [কার্বনের উষ্ণতা বাড়লে ওর রোধ কমে যায়]।

● **পরীক্ষাঃ** উপরের চিত্রে বর্ণিত তড়িৎ বর্তনীর E F প্রান্তের সঙ্গে একটি তামার তার যোগ করে ঘরের উষ্ণতায় ওর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করা হল ও অ্যামিটারের পাঠ নেওয়া হল। এইবার তামার তারটিকে বার্নার দিয়ে গরম করে ঐ অবস্থায় ওর মধ্যে প্রবাহ চালনা করা হল ও অ্যামিটারের পাঠ নেওয়া হল। দেখা গেল যে, প্রথম ক্ষেত্রে অ্যামিটারের পাঠ বেশী হচ্ছে ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পাঠ কম হচ্ছে। তার মানে তামার তারটি যখন শীতল ছিল ওর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ বেশী হয়েছে, কিন্তু উত্তপ্ত অবস্থায় প্রবাহ কম হয়েছে—অর্থাৎ, উত্তপ্ত অবস্থায় ওর রোধ বেড়ে গেছে।

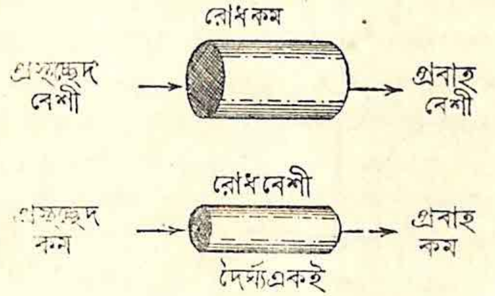
(iii) **পরিবাহীর রোধ পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিকঃ** কোন পরিবাহীর উপাদান, উষ্ণতা ও প্রস্থচ্ছেদ স্থির রেখে দৈর্ঘ্য বাড়ালে, পরিবাহীর রোধ বাড়ে, দৈর্ঘ্য কমালে রোধ কমে যায়।

● **পরীক্ষাঃ** একই প্রস্থচ্ছেদের দুটি তামার তার নেওয়া হল। প্রথম তারটির দৈর্ঘ্য দ্বিতীয় তারের দ্বিগুণ। উপরে বর্ণিত তড়িৎ-বর্তনীর E F প্রান্তের সঙ্গে প্রথমে প্রথম তারটি যোগ করে ওর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করা হল, পরে তারটিকে সরিয়ে E F প্রান্তের সঙ্গে দ্বিতীয় তারটি যোগ করে আবার তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করা হল। অ্যামিটারের পাঠ দেখা যাবে প্রথম তারের চেয়ে দ্বিতীয় তারের ক্ষেত্রে প্রায় দ্বিগুণ হচ্ছে। তার মানে প্রথম তারের ক্ষেত্রে যে প্রবাহ হচ্ছিল, দ্বিতীয় তারের ক্ষেত্রে তার দ্বিগুণ প্রবাহ হচ্ছে। অতএব বোঝা গেল, লম্বা তারের রোধ বেশী, কম লম্বা তারের রোধ কম।



(iv) পরিবাহীর রোধ পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদের ব্যস্তানুপাতিক: **কোন পরিবাহীর উপাদান, উষ্ণতা ও দৈর্ঘ্য স্থির রেখে ওর প্রস্থচ্ছেদ বাড়ালে রোধ কম হয়, আর প্রস্থচ্ছেদ কম হলে রোধ বেড়ে যায়।**

● **পরীক্ষা:** একই দৈর্ঘ্যের দুটি তামার তার নেওয়া হল। একটির প্রস্থচ্ছেদ অপরটির দ্বিগুণ। এখন পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রে বর্ণিত তড়িৎ বর্তনীর E F প্রান্তের সঙ্গে তার দুটিকে একটির পর আর একটি যোগ করে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করলে দেখা যাবে, যে তারটির প্রস্থচ্ছেদ বেশী তার মধ্য দিয়ে বেশী তড়িৎ-প্রবাহ



হচ্ছে, আর যেটির প্রস্থচ্ছেদ কম তার মধ্য দিয়ে কম প্রবাহ হচ্ছে। অতএব বোঝা গেল, পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ বাড়লে রোধ কমে যায়, আর প্রস্থচ্ছেদ কমলে রোধ বেড়ে যায়।

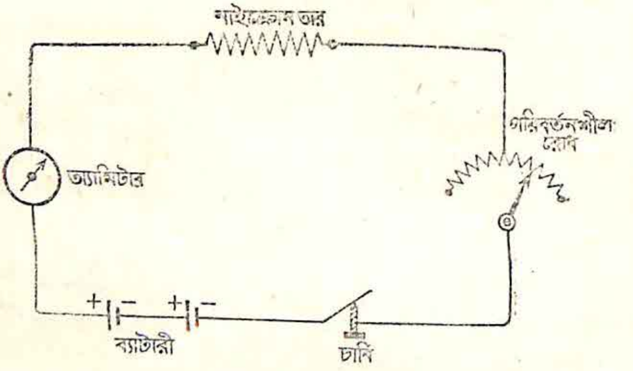
9.9 তড়িৎ-প্রবাহের তাপীয় ফল

তোমার পড়ার টেবিলে টেবিলল্যাম্প জ্বলছে—বাল্‌বটিতে হাত দিয়ে দেখ, কেমন গরম লাগছে। মা তো হিটারে প্রায়ই দুধ গরম করেন। ইলেকট্রিক ইস্ত্রি দিয়ে জামা-কাপড় ইস্ত্রি করা হয়। এইগুলি সবই হল তড়িৎ-প্রবাহের তাপীয় ফল। কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ হলে, তড়িৎ-শক্তির কিছু অংশ তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পরিবাহীর মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ হলে, তাপ উৎপন্ন হয়, একেই তড়িৎ-প্রবাহের তাপীয় ফল বলে।

● **পরীক্ষা:** পরপৃষ্ঠার ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ঐভাবে একটি তড়িৎ-বর্তনী তৈরি করা হল। দুটি তড়িৎ-কোষ শ্রেণী-সমবায় যোগ করে তড়িৎ-কোষের পজিটিভ এবং নেগেটিভ প্রান্তের সঙ্গে পর পর একটি অ্যামিটার, একটি নাইক্রোম তার, পরিবর্তনশীল রোধ এবং একটি চাবি যোগ করা হল।

অ্যামিটার থেকে বর্তনীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহমাত্রা পাওয়া যায়, পরিবর্তনশীল রোধ দিয়ে বর্তনীর মধ্যে প্রবাহ বাড়ানো বা কমানো যায়। চাবি দিয়ে বর্তনীর মধ্যে প্রবাহ চালু করা যায়। (i) পরিবর্তনশীল রোধের মান সবচেয়ে বাড়িয়ে চাবি টিপে বর্তনীর মধ্যে প্রবাহ চালু করা হল। কিছুক্ষণ পর নাইক্রোম তারে হাত দিয়ে দেখ তারটি একটু গরম

হয়েছে। (ii) এইবার পরিবর্তনশীল রোধের মান ক্রমশ কম করলে দেখা যাবে, নাইক্রোম তারটি ক্রমশ বেশী উত্তপ্ত হচ্ছে। (iii) পরে



পরিবর্তনশীল রোধের মান সবচেয়ে কম করলে বর্তনীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রবাহ হবে—অ্যামিটার যন্ত্রে এটা দেখা যাবে। এই অবস্থায় নাইক্রোম তারটি উত্তপ্ত হয়ে লাল হয়ে উঠে। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হল, তড়িৎ-প্রবাহমাত্রা বাড়ালে উৎপন্ন তাপ বাড়বে।

জুলের সূত্রঃ পরিবাহীতে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে যে তাপের সৃষ্টি হয় তা **তড়িৎ প্রবাহমাত্রা, পরিবাহীর রোধ এবং প্রবাহ চলার সময়ের উপর** নির্ভর করে। কোন পরিবাহীর রোধ যদি R হয় এবং ওর মধ্য দিয়ে t সময় ধরে C প্রবাহমাত্রা প্রবাহিত হয় তাহলে জুলের সূত্রানুযায়ী—

(1) **পরিবাহীতে উৎপন্ন তাপ (H) প্রবাহমাত্রার বর্গের সমানুপাতিক হয়, যখন পরিবাহীর রোধ এবং প্রবাহের সময় স্থির থাকে।** যেমন, রোধ ও প্রবাহের সময় স্থির রেখে পরিবাহীর মধ্যে প্রবাহ 3 গুণ করলে উৎপন্ন তাপ 9 গুণ হবে। অর্থাৎ $H \propto C^2$ যখন R এবং t স্থির।

(2) **পরিবাহীতে উৎপন্ন তাপ (H), প্রবাহ যতক্ষণ ধরে চলে, সেই সময়ের সমানুপাতিক হয়, যখন পরিবাহীর রোধ এবং প্রবাহ স্থির থাকে।** যেমন, পরিবাহীর রোধ এবং প্রবাহ স্থির রেখে প্রবাহ চালনার সময় দ্বিগুণ করলে উৎপন্ন তাপও দ্বিগুণ হবে। অর্থাৎ $H \propto t$ যখন R এবং C স্থির।

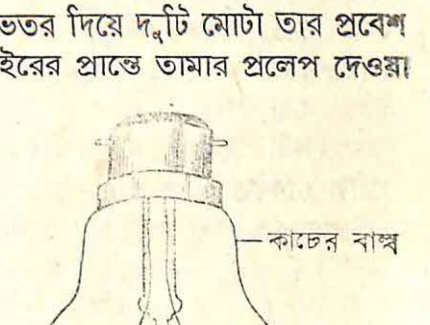
(3) **পরিবাহীতে উৎপন্ন তাপ (H) পরিবাহীর রোধের সমানুপাতিক হয়, যখন প্রবাহ চলার সময় এবং প্রবাহ স্থির থাকে।** যেমন, প্রবাহ এবং প্রবাহ চলার সময় স্থির রেখে পরিবাহীর রোধ দ্বিগুণ করলে উৎপন্ন তাপও দ্বিগুণ হবে। অর্থাৎ $H \propto R$ যখন C এবং t স্থির।

9.10 তড়িৎ-প্রবাহের তাপীয় ফলের ব্যবহারিক প্রয়োগ (Practical use of heating effect of current)

পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করলে তাপ উৎপন্ন হয়। এই উৎপন্ন তাপকে আমরা নিজেদের নানা কাজে ব্যবহার করি। নিচে এইরকম কয়েকটি জিনিসের বর্ণনা দেওয়া হল।

(i) **বিজলী বাতি**ঃ 1879 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী এডিসন সর্বপ্রথম এই বাতি তৈরি করেন। বায়ুশূন্য একটি কাচের বাল্বের মধ্যে কার্বনের তৈরি সরু তারের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করে তিনি আলো উৎপন্ন করেন। বর্তমানে যে বিজলী বাতি আমরা ব্যবহার করি তাতে একটি কাচের বাল্ব আছে। এই বাল্বের মধ্যে নাইট্রোজেন বা নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গন ভরা থাকে।

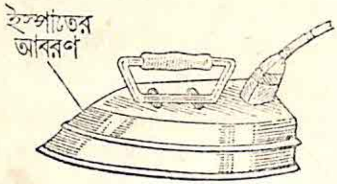
বাল্বটির বায়ুনিরুদ্ধ মুখের ভেতর দিয়ে দুটি মোটা তার প্রবেশ করানো থাকে। এই তার দুটির বাইরের প্রান্তে তামার প্রলেপ দেওয়া থাকে আর ভেতরটা নিকেল স্টীল দিয়ে তৈরি। মোটা তার দুটির প্রান্তে টাংস্টেনের খুব সরু কুণ্ডলী-পাকানো তার যোগ করা থাকে। এই সরু তারের কুণ্ডলীকে ফিলামেণ্ট বলে। বর্তমানে ফিলামেণ্টটি টাংস্টেন, আয়রন এবং ম্যাঙ্গানিজের এক মিশ্র ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়। এই সংকর ধাতুটির নাম উলফ্রেমাইট। ফিলামেণ্ট খুব সরু এবং লম্বা হওয়ায়, ওর রোধ খুব বেশী হয়, ফলে লাইনের সঙ্গে বাল্বটি যোগ করলে কুণ্ডলী-পাকানো তারটির মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ হওয়ার ফলে তারটি শ্বেততপ্ত হয়, ফলে ঐ তার থেকে আলো বিকীর্ণ হয়। যে ফিলামেণ্টের রোধ বেশী, সেই ফিলামেণ্ট বেশী উত্তপ্ত হয়, ফলে বেশী আলো উৎপন্ন হয়।

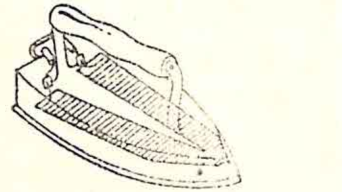


• **বর্তমানে বিজলী বাতি বায়ুশূন্য না করে ওর মধ্যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস ভর্তি করা হয় কেন?**ঃ বাল্বটি বায়ুশূন্য হলে ফিলামেণ্টটি ক্রমে বাষ্পীভূত হয় এবং ভেতরে কাচের দেওয়ালে পাতলা আবরণ সৃষ্টি করে, ফলে বাল্বের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়। তাই আধুনিক বিজলী বাতির বাল্বের মধ্যে আর্গন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাস ভর্তি করা হয়।

(ii) **ইলেকট্রিক ইস্ত্রি**ঃ এর বাইরের আবরণটি স্টেইনলেস স্টীলের

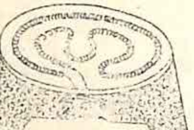
তৈরি ; এর ভেতরে তাপসহ এবং তড়িৎ অপরিবাহী পদার্থের, যেমন—অভ্রের একটি প্লেট থাকে। এই প্লেটের গায়ে নাইক্রোমের সরু তার জড়ানো





থাকে। এই প্লেটটির ওপরে এবং নিচে অন্তরক অভ্রের পাত দিয়ে ঢেকে লোহার আবরণের মধ্যে অন্তরিত অবস্থায় রাখা হয়। মেন লাইন থেকে তারের কুণ্ডলীর মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করলে, কুণ্ডলী লোহিততপ্ত হয়ে ওঠে, ফলে লোহার আবরণটিও উত্তপ্ত হয়। লোহার এই আবরণটির নিচের তল খুব মসৃণ। এই নিচের তল দিয়ে জামা-কাপড় ইস্ত্রি করা হয়।

(iii) **ইলেকট্রিক স্টোভঃ** এর মধ্যে ফায়ার-ক্লে দ্বারা তৈরি একটি গোল চাকতি থাকে। এই চাকতির মধ্যে কুণ্ডলীপাকানো গর্ত থাকে। এই গর্তের মধ্যে নাইক্রোম তার-কুণ্ডলী রাখা থাকে। নাইক্রোম তারের



রোধ খুব বেশী—তাই নাইক্রোম তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলেই, তারটি খুব গরম হয়ে স্টোভটিকে উত্তপ্ত করে। চাকতির উপর কোন বস্তু রাখলে গরম হয়ে ওঠে।

এছাড়া তড়িৎ-শক্তি কাজে লাগিয়ে তাপ উৎপাদনের জন্য যে সব যন্ত্র আছে তাদের মধ্যে তড়িৎ চুল্লী, বৈদ্যুতিক কেটলি, ঝালাইয়ের জন্য বৈদ্যুতিক তাপক, ইলেকট্রিক ওয়েলডিং যন্ত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

9.11 তড়িৎ-প্রবাহের চুম্বকীয় ফল (Magnetic effect of current)

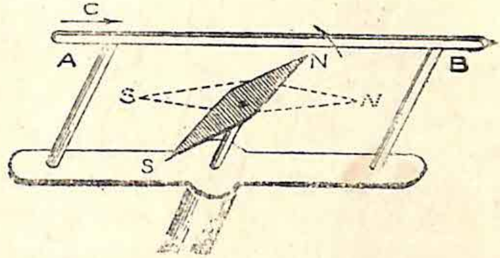
কোন পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ হলে তারটিকে ঘিরে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। একেই তড়িৎ-প্রবাহের চুম্বকীয় ফল বলে।

তড়িৎ-প্রবাহের চুম্বকীয় ফল বিজ্ঞানী ওরেস্টেড্ প্রথম লক্ষ্য করেন। তিনি যে পরীক্ষাটি করেন তা নিচে দেওয়া হলঃ

• **ওরেস্টেডের পরীক্ষাঃ**

(1) AB একটি পরিবাহী তারকে উ ্-দক্ষিণ বরাবর আটকানো

হল। তারটির নিচে একটি চুম্বক-শলাকা রাখা হল। এই অবস্থায় দেখা যাবে, চুম্বক-শলাকাটি তারের সঙ্গে সমান্তরালভাবে উত্তর-দক্ষিণমুখী হয়ে অবস্থান করছে। এখন তারের মধ্য দিয়ে A থেকে B-এর দিকে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করা হল। সঙ্গে সঙ্গে চুম্বক-শলাকার বিক্ষেপ দেখা গেল। প্রবাহ চালানোর সঙ্গে সঙ্গে শলাকাটি ঘুরে তারের সঙ্গে



প্রায় লম্বভাবে অবস্থান করে। ছবিতে কাটা রেখা দিয়ে চুম্বক-শলাকার প্রথম অবস্থান, আর পরিবাহীতে প্রবাহ চললে চুম্বক-শলাকার অবস্থান কেমন হয় গভীর রেখা দিয়ে দেখানো হয়েছে।

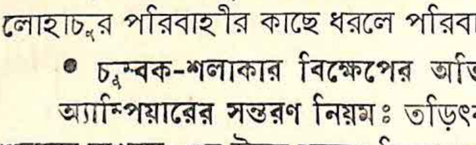
এখন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে B থেকে A-এর দিকে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করা হল। দেখা গেল, চুম্বক-শলাকার বিক্ষেপ পূর্বের বিপরীত দিকে হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, কোন **পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ হলে পরিবাহীকে ঘিরে একটি চৌম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়।**

কারণ চৌম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাব ছাড়া চুম্বক-শলাকার বিক্ষেপ হয় না। আরো দেখা গেছে, তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট এই চৌম্বক-ক্ষেত্র দ্বারা পরিবাহী নিজে চুম্বকিত হয় না। তড়িৎ-প্রবাহ চলার সময় কিছু লোহাচুর পরিবাহীর কাছে ধরলে পরিবাহী দ্বারা আকৃষ্ট হয় না।

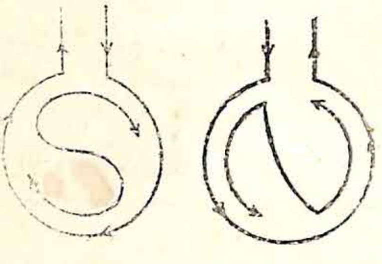
● **চুম্বক-শলাকার বিক্ষেপের অভিমুখ নির্ণয়ঃ**

অ্যাম্পিয়ারের সন্তরণ নিয়মঃ তড়িৎবাহী পরিবাহীর কাছে চুম্বক-শলাকা রাখলে, ওর উত্তর মেরুর বিক্ষেপ কোন্ দিকে হবে, অ্যাম্পিয়ারের সন্তরণ নিয়ম থেকে জানা যায়।



ধরি, একজন লোক তড়িৎবাহী তারের উপর দিয়ে প্রবাহের অভিমুখে সাঁতার কেটে যাচ্ছে। লোকটি মুখ চুম্বক-শলাকার দিকে আছে। এই অবস্থায় ঐ লোকটির বাম হাত যে দিকে থাকবে, সেই দিকে চুম্বক-শলাকার উত্তর মেরুর বিক্ষেপ হবে।

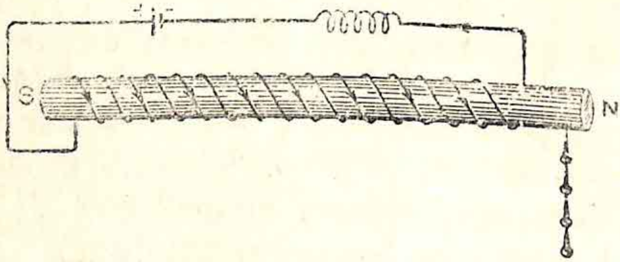
(2) বৃত্তাকার পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহ হলে ওর কেন্দ্রের চারদিকে সামান্য জায়গায় চৌম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এই চৌম্বক-ক্ষেত্র বৃত্তাকার তারের সমতলের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থান করে।



বৃত্তাকার তারের কেন্দ্রের দিকে যে পাশ থেকে তাকালে, বৃত্তাকার তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে হয়, সেই পাশে দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হয় এবং ওর বিপরীত দিকে উত্তর মেরুর সৃষ্টি হয়। যে পাশ থেকে তাকালে, প্রবাহ ঘড়ির কাঁটার অভিমুখের বিপরীত দিকে হয়, সেই পাশে উত্তর মেরুর সৃষ্টি হয় এবং বিপরীত দিকে দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হয়।

9.12 তড়িৎ-প্রবাহের চুম্বকীয় ফলের ব্যবহারিক প্রয়োগ

তড়িৎ-চুম্বকঃ একগাছা অন্তরিত তার দিয়ে একটি কাঁচা লোহার দণ্ডকে জড়িয়ে ঐ তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করলে ঐ দণ্ডটি



শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয়। ওর দুই প্রান্তে দুটি মেরুর সৃষ্টি হয়। তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে লোহার দণ্ডটি চুম্বকত্ব হারিয়ে ফেলে।

• **এইভাবে তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে কোন চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করা হলে, সেই চুম্বককে তড়িৎ-চুম্বক বলে।**

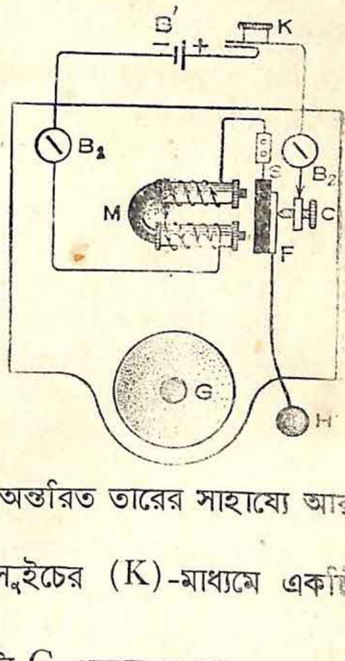
জোরালো তড়িৎ-চুম্বক তৈরি করতে হলে কাঁচা লোহার দণ্ডকে ইংরেজী U-আকারের করে ওর বাহুর উপর অন্তরিত তার জড়িয়ে সলিনয়েড গঠন করা হয়। চুম্বক অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

9.13 বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (Electric bell)

তড়িৎ-চুম্বকের ব্যবহারিক প্রয়োগ হল বৈদ্যুতিক ঘণ্টা।

এই যন্ত্রের চারটি বিভিন্ন অংশ আছে। একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বিভিন্ন অংশগুলি নিচের ছবিতে দেখানো হল।

● বর্ণনাঃ (i) একটি কাঠের পাটাতনের উপর একটি অশ্বখুরাকৃতি তড়িৎ-চুম্বক (M) আটকানো থাকে। এর গায়ে যে অন্তরিত তামার তার জড়ানো থাকে, ঐ তারের একপ্রান্ত সংযোজক-স্ক্রু (B_1)-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। অপর প্রান্তটি একটি স্প্রিং S-এর সঙ্গে যুক্ত।



(ii) এই তড়িৎ-চুম্বকের মেরু দুটির সামনে, স্প্রিং S-এর সঙ্গে একটি কাঁচা লোহার পাত (F) আটকানো থাকে। একে **আর্মেচার** বলে।

(iii) F-এর অন্য প্রান্তে একটি হাতুড়ি (H) লাগানো থাকে।

(iv) যখন তড়িৎ-প্রবাহ হয় না তখন আর্মেচারসহ স্প্রিংটি একটি স্ক্রু C-কে স্পর্শ করে থাকে। স্ক্রু C আবার অন্তরিত তারের সাহায্যে আর একটি সংযোজক স্ক্রু B_2-এর সঙ্গে যুক্ত।

(v) স্ক্রু B_1 B_2-এর সঙ্গে টেপা সুইচের (K)-মাধ্যমে একটি ব্যাটারির দুই মেরু যোগ করা থাকে।

(vi) H হাতুড়ির সামনে একটি ঘণ্টা G এমনভাবে বসানো থাকে যেন তড়িৎ-চুম্বক আর্মেচারকে আকর্ষণ করে নিজের দিকে টানলে, সেই টানে হাতুড়িটি ঘণ্টায় আঘাত করে।

● **কার্যপ্রণালীঃ** (i) K টেপা সুইচ টিপলে বর্তনীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চলে। এর ফলে তড়িৎ-চুম্বক (M) সক্রিয় হয়ে ওঠে আর কাঁচা লোহার আর্মেচার (F)-কে নিজের দিকে টেনে আনে, সেই সঙ্গে স্প্রিং-এর সঙ্গে যুক্ত H হাতুড়ি ঘণ্টা G-কে আঘাত করে, ফলে ঘণ্টা বেজে ওঠে। (ii) কিন্তু স্প্রিং এইভাবে তড়িৎ-চুম্বকের দিকে সরে আসার ফলে স্প্রিং ও C স্ক্রুর মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, ফলে বর্তনীর মধ্যে প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। (iii) এর ফলে তড়িৎ-চুম্বক নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তখন স্প্রিং S আবার C স্ক্রু-এর দিকে সরে তাকে স্পর্শ করে। তখন আবার বর্তনীর মধ্যে প্রবাহ হয়, ফলে তড়িৎ-চুম্বক আবার সক্রিয় হয়ে

ওঠে আর আর্মেচারকে নিজের দিকে টেনে আনে, যার ফলে হাতুড়ি আবার ঘণ্টায় আঘাত করে। এই প্রক্রিয়াটি এত দ্রুত ঘটে যে ঘণ্টার শব্দ বিরামহীন মনে হয়।

9.14 জেমস প্রেসকট জুল (James Prescott Joule)

বিজ্ঞানী জুল ইংলণ্ডে চেস্টারের কাছে স্যালফোর্ডে 1818 খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী জন ডাল্‌টনের কাছে শিক্ষা নেন। তারপর তিনি নিজেই বিজ্ঞান-চর্চা শুরু করেন।

(i) পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ হলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তা তিনি প্রথম লক্ষ্য করেন এবং এই বিষয়ে তিনটি সূত্র প্রকাশ করেন।



(ii) 1843 খ্রীষ্টাব্দে তিনি যান্ত্রিক উপায়ে উৎপন্ন তাপের সঙ্গে সম্পাদিত কার্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করেন।

(iii) বিজ্ঞানী টমসনের সঙ্গে কাজ করে তিনি আবিষ্কার করেন যে, খুব বেশী চাপের মধ্যে রাখা কোন গ্যাসকে সরু ছিদ্রের মধ্য দিয়ে হঠাৎ কম চাপের মধ্যে ছেড়ে দিলে গ্যাসটি খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এই আবিষ্কারের ফলে অনেক গ্যাসকে তরলে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে।

(iv) নানা আবিষ্কারের জন্য ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটি থেকে তিনি কোপলে মেডেল ও রয়্যাল মেডেল নামে দুটি পদক পান। তিনি রয়্যাল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য শক্তি এবং কার্যের ব্যবহারিক এককের নাম 'জুল' রাখা হয়েছে। 1884 খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

9.15 মাইকেল ফ্যারাডে

লণ্ডনে 1791 খ্রীষ্টাব্দে এক গরীব কামারের বাড়ীতে বিখ্যাত বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে জন্মগ্রহণ করেন। টাকা-পয়সার অভাবে তের বছর বয়সে তাঁকে ইস্কুল ছেড়ে একটি বই-এর দোকানে কাজ নিতে হয়। তাঁকে যে কাজ দেওয়া হত তিনি তা প্রাণপণে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করতেন। এতে খুশি হয়ে মালিক তাঁকে নিজের বাড়ীতে রেখে বই বাঁধাই-এর কাজ দিলেন। এই কাজ করতে করতে তিনি অনেক বই পড়ে ফেলেন। এই সময় এক ঘটনা ঘটলো। বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার হামফ্রে ডেভি এসেছেন রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনে বিজ্ঞান-বিষয়ে বক্তৃতা দিতে। গরীবের

ছেলে ফ্যারাডে এককোণে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনলেন। তারপর কয়েকদিন পরে এই বক্তৃতার সারাংশ তিনি সুন্দরভাবে লিখে ডেভির কাছে পাঠিয়ে দিলেন, আর অনুরোধ জানালেন যেন তাঁকে ঐ বিখ্যাত বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। স্যার হামফ্রে তাঁর বক্তৃতার সুন্দর সারাংশ দেখে খুব খুশি হলেন, আর ফ্যারাডেকে রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনে ল্যাবোরেটরি অ্যাসিস্টেণ্টের কাজ দেন। এইখানে কাজ করতে করতে তিনি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের অনেক নতুন বিষয় আবিষ্কার করে সবাইকে অবাক করে দেন।



তিনি **তড়িৎ-বিশ্লেষণ সূত্র, তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ সূত্র, বৈদ্যুতিক মোটর এবং ডায়নামোর কার্যনীতি** আবিষ্কার করে বিখ্যাত হন। 1826 খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য হন। বর্তমান তড়িৎ-বিজ্ঞান, ফ্যারাডের বিভিন্ন আবিষ্কারের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

1867 খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানী দেহত্যাগ করেন। তাঁর নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য, নির্দিষ্ট পরিমাণ তড়িৎকে একক ধরে, তড়িৎ পরিমাণের এককের নাম 'ফ্যারাডে' রাখা হয়েছে।

1 ফ্যারাডে = 96,540 কুলম্ব।

9.16 আঁদ্রে ম্যারি অ্যাম্পিয়ার

ফ্রান্সের লায়ন্স শহরে এক শিক্ষিত বণিক পরিবারে 1775 খ্রীষ্টাব্দে অ্যাম্পিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র 11 বছর বয়সে তিনি ল্যাটিন ভাষা শিখে ফেলেন ও ক্যালকুলাস নামে গণিতের কয়েকটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। এই সময় তাঁর জীবনে দুঃখ ঘনিয়ে আসে। ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয়। তাঁর বাবাকে বিপ্লবীরা তাঁর সামনেই মেরে ফেলে। ফলে চরম দারিদ্র্য নেমে আসে তাঁদের পরিবারে। পয়সার অভাবে তাঁকে ছাত্র পড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। এই সময়ে লায়ন্স শহরে এক ইস্কুলে তিনি শিক্ষকের কাজ পান। পরে তিনি প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। এই সময় তিনি ক্যালকুলাস, রসায়ন, আলোক-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞানের



নানা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। 1823 খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্ব সম্বন্ধে এক বিখ্যাত নিবন্ধ প্রকাশ করেন। 1836 খ্রীষ্টাব্দে এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী মারা যান। এক একক তড়িৎ-প্রবাহকে এক অ্যাম্পিয়ার নাম দিয়ে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় করা হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

[A] **জ্ঞানমূলক :**

(i) তড়িৎ-প্রবাহ কি? তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখ কোন দিকে?
(ii) তড়িৎ-বিভব বলতে কি বোঝ? উচ্চ-বিভব এবং নিম্ন-বিভব বলতে কি বোঝ?
(iii) সরল ভোল্টীয় কোষ কাকে বলে? সরল ভোল্টীয় কোষের পজিটিভ এবং নেগেটিভ মেরু কোন্‌টি?
(iv) লেক্লান্স কোষে তড়িৎদ্বার রূপে কি ব্যবহার করা হয়? এই কোষের ত্রুটি কি কি? এই কোষে ছদন দোষ প্রতিকারের জন্য কি ব্যবহার করা হয়?
(v) কোষের তড়িৎ-চালক বল বলতে কি বোঝ?
(vi) ড্রাই সেলের তড়িৎ-চালক বল কি? কি কাজে ড্রাই সেল ব্যবহৃত হয়?
(vii) তড়িৎ কোষে কোন্‌ শক্তি কোন্‌ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?
(viii) সরল ভোল্টীয় কোষের বর্ণনা দাও।
(ix) পরিবাহীর রোধ কি? ওহ্‌মের সূত্রটি বিবৃত কর।
(x) ইলেকট্রিক স্টোভের ভিতর কি তার থাকে?
(xi) পরিবাহীর রোধ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
(xii) তড়িৎ প্রবাহের একক কি? রোধের একক কি?
(xiii) তড়িৎ প্রবাহের ফলে পরিবাহীতে উৎপন্ন তাপ সংক্রান্ত জুলের সূত্রগুলি বিবৃত কর।
(xiv) বৈদ্যুতিক বাতির মধ্যে কিসের তৈরি ফিলামেণ্ট থাকে?
(xv) অ্যাম্পিয়ারের সন্তরণ নিয়মটি বিবৃত কর।
(xvi) তড়িৎ-চুম্বক কাকে বলে? তড়িৎ-চুম্বক ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি যন্ত্রের নাম কর।
(xvii) তড়িৎ-বিশ্লেষণ সূত্রটি কে আবিষ্কার করেন?
(xviii) মাইকেল ফ্যারাডে এবং আঁদ্রে ম্যারি অ্যাম্পিয়ারের জীবনী লেখ।
(xix) একটি লেক্লান্স সেলের বর্ণনা দাও।
(xx) একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বিবরণ দাও।

[B] **বোধমূলক :**

(i) কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কি করে তড়িৎ প্রবাহ হয়?
(ii) একটি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে অ্যানায়নগুলি বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে তড়িৎ প্রবাহ কোন্‌ দিকে হবে?

(iii) তড়িৎ-চালক বল এবং বিভব-পার্থক্যের মধ্যে পার্থক্য কি ?

(iv) পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ হয় অথচ অপরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহ হয় না কেন ?

(v) সরল ভোল্টীয় কোষে কি করে তড়িৎ প্রবাহ হয় বুঝিয়ে দাও।

(vi) সরল ভোল্টীয় কোষের ত্রুটিগুলি উল্লেখ কর এবং ত্রুটিগুলি কিভাবে সংশোধন করা যায় ?

(vii) লেক্লান্স সেলে ছদন দোষ কি করে নিবারণ করা যায় ?

(viii) একটি নলের মধ্য দিয়ে জলপ্রবাহের সঙ্গে একটি পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের কি সাদৃশ্য আছে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(ix) অনেকক্ষণ ধরে তড়িৎ প্রবাহের প্রয়োজন হলে লেক্লান্স কোষ ব্যবহার করা যায় কি ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

(x) ওহ্‌মের সূত্রটি বুঝিয়ে দাও। এই সূত্র থেকে রোধের সংজ্ঞা কিভাবে পাওয়া যায় বুঝিয়ে দাও।

(xi) বৈদ্যুতিক ঘণ্টার কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

(xii) পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্য, তড়িৎ প্রবাহ এবং পরিবাহীর রোধের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

(xiii) পরিবাহীর উষ্ণতা বাড়ালে ওর রোধ বাড়বে না কমবে ?

(xiv) বৈদ্যুতিক বাতির মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ হলে ফিলামেণ্টটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কেন ?

(xv) হিটারে নাইক্রোম তারটিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা হয় কেন।

(xvi) একটি পরিবাহীর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ হলে পরিবাহীটি কি নিজে চুম্বকিত হয় ?

[C] প্রয়োগমূলক :

(i) AB একটি পরিবাহী, A প্রান্তের বিভব উচ্চ এবং B প্রান্তের বিভব নিম্ন। পরিবাহীর কোন্ প্রান্ত থেকে কোন্ প্রান্তে তড়িৎ প্রবাহ হবে? পরিবাহীর মধ্যে ইলেকট্রন প্রবাহ কোন্ দিকে হবে ?

(ii) সরল ভোল্টীয় কোষে তামা এবং জিঙ্ক পাত দুটিকে পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত না করলে পাত দুটির মধ্যে বিভব-পার্থক্য সৃষ্টি হবে কি ?—এই অবস্থায় পাত দুটির মধ্যে যে বিভব-পার্থক্যের সৃষ্টি হয় তাকে কি বলে ?

(iii) সরল ভোল্টীয় কোষে তামা এবং জিঙ্কের বদলে দুটি তামার পাত ব্যবহার করলে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যাবে কি ?

(iv) লেক্লান্স সেলে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করা হয় কেন? জিঙ্ক দণ্ডের গায়ে পারদের প্রলেপ দেওয়া হয় কেন ?

(v) একটি কোষের তড়িৎ-চালক বল = 1·4 ভোল্ট বলতে কি বোঝ ?

(vi) একটি পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্য 15 ভোল্ট, পরিবাহীর মধ্যে 3 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ হলে পরিবাহীর রোধ কত ?

নানা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। 1823 খ্রীষ্টাব্দে **বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্ব সম্বন্ধে এক বিখ্যাত নিবন্ধ প্রকাশ করেন।** 1836 খ্রীষ্টাব্দে এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী মারা যান। **এক একক তড়িৎ-প্রবাহকে এক অ্যাম্পিয়ার নাম দিয়ে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় করা হয়েছে।**

প্রশ্নাবলী

[A] **জ্ঞানমূলক :**

(i) তড়িৎ-প্রবাহ কি ? তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখ কোন দিকে ?
(ii) তড়িৎ-বিভব বলতে কি বোঝ ? উচ্চ-বিভব এবং নিম্ন-বিভব বলতে কি বোঝ ?
(iii) সরল ভোল্টীয় কোষ কাকে বলে ? সরল ভোল্টীয় কোষের পজিটিভ এবং নেগেটিভ মেরু কোন্‌টি ?
(iv) লেক্লান্স কোষে তড়িৎদ্বার রূপে কি ব্যবহার করা হয় ? এই কোষের ত্রুটি কি কি ? এই কোষে ছদন দোষ প্রতিকারের জন্য কি ব্যবহার করা হয় ?
(v) কোষের তড়িৎ-চালক বল বলতে কি বোঝ ?
(vi) ড্রাই সেলের তড়িৎ-চালক বল কি ? কি কাজে ড্রাই সেল ব্যবহৃত হয় ?
(vii) তড়িৎ কোষে কোন্ শক্তি কোন্ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ?
(viii) সরল ভোল্টীয় কোষের বর্ণনা দাও।
(ix) পরিবাহীর রোধ কি ? ওহ্‌মের সূত্রটি বিবৃত কর।
(x) ইলেকট্রিক স্টোভের ভিতর কি তার থাকে ?
(xi) পরিবাহীর রোধ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?
(xii) তড়িৎ প্রবাহের একক কি ? রোধের একক কি ?
(xiii) তড়িৎ প্রবাহের ফলে পরিবাহীতে উৎপন্ন তাপ সংক্রান্ত জুলের সূত্রগুলি বিবৃত কর।
(xiv) বৈদ্যুতিক বাতির মধ্যে কিসের তৈরি ফিলামেণ্ট থাকে ?
(xv) অ্যাম্পিয়ারের সন্তরণ নিয়মটি বিবৃত কর।
(xvi) তড়িৎ-চুম্বক কাকে বলে ? তড়িৎ-চুম্বক ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি যন্ত্রের নাম কর।
(xvii) তড়িৎ-বিশ্লেষণ সূত্রটি কে আবিষ্কার করেন ?
(xviii) মাইকেল ফ্যারাডে এবং আঁদ্রে ম্যারি অ্যাম্পিয়ারের জীবনী লেখ।
(xix) একটি লেক্লান্স সেলের বর্ণনা দাও।
(xx) একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বিবরণ দাও।

[B] **বোধমূলক :**

(i) কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কি করে তড়িৎ প্রবাহ হয় ?
(ii) একটি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে অ্যানায়নগুলি বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে তড়িৎ প্রবাহ কোন্ দিকে হবে ?

(iii) তড়িৎ-চালক বল এবং বিভব-পার্থক্যের মধ্যে পার্থক্য কি ?

(iv) পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ হয় অথচ অপরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহ হয় না কেন ?

(v) সরল ভোল্টীয় কোষে কি করে তড়িৎ প্রবাহ হয় বুঝিয়ে দাও।

(vi) সরল ভোল্টীয় কোষের ত্রুটিগুলি উল্লেখ কর এবং ত্রুটিগুলি কিভাবে সংশোধন করা যায় ?

(vii) লেক্লান্স সেলে ছদন দোষ কি করে নিবারণ করা যায় ?

(viii) একটি নলের মধ্য দিয়ে জলপ্রবাহের সঙ্গে একটি পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের কি সাদৃশ্য আছে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(ix) অনেকক্ষণ ধরে তড়িৎ প্রবাহের প্রয়োজন হলে লেক্লান্স কোষ ব্যবহার করা যায় কি ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

(x) ওহ্মের সূত্রটি বুঝিয়ে দাও। এই সূত্র থেকে রোধের সংজ্ঞা কিভাবে পাওয়া যায় বুঝিয়ে দাও।

(xi) বৈদ্যুতিক ঘণ্টার কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

(xii) পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্য, তড়িৎ প্রবাহ এবং পরিবাহীর রোধের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

(xiii) পরিবাহীর উষ্ণতা বাড়ালে ওর রোধ বাড়বে না কমবে ?

(xiv) বৈদ্যুতিক বাতির মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ হলে ফিলামেণ্টটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কেন ?

(xv) হিটারে নাইক্রোম তারটিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা হয় কেন।

(xvi) একটি পরিবাহীর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ হলে পরিবাহীটি কি নিজে চুম্বকিত হয় ?

[C] প্রয়োগমূলক ঃ

(i) **AB** একটি পরিবাহী, **A** প্রান্তের বিভব উচ্চ এবং **B** প্রান্তের বিভব নিম্ন। পরিবাহীর কোন্ প্রান্ত থেকে কোন্ প্রান্তে তড়িৎ প্রবাহ হবে? পরিবাহীর মধ্যে ইলেকট্রন প্রবাহ কোন্ দিকে হবে ?

(ii) সরল ভোল্টীয় কোষে তামা এবং জিঙ্ক পাত দুটিকে পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত না করলে পাত দুটির মধ্যে বিভব-পার্থক্য সৃষ্টি হবে কি ?—এই অবস্থায় পাত দুটির মধ্যে যে বিভব-পার্থক্যের সৃষ্টি হয় তাকে কি বলে ?

(iii) সরল ভোল্টীয় কোষে তামা এবং জিঙ্কের বদলে দুটি তামার পাত ব্যবহার করলে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যাবে কি ?

(iv) লেক্লান্স সেলে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করা হয় কেন? জিঙ্ক দণ্ডের গায়ে পারদের প্রলেপ দেওয়া হয় কেন ?

(v) একটি কোষের তড়িৎ-চালক বল = 1·4 ভোল্ট বলতে কি বোঝ ?

(vi) একটি পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্য 15 ভোল্ট, পরিবাহীর মধ্যে 3 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ হলে পরিবাহীর রোধ কত ?

(vii) একই দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থচ্ছেদের একটি রূপার তার এবং একটি লোহার তারের দুই প্রান্তে একই বিভব-পার্থক্য সৃষ্টি করলে কোন্ তারে বেশী তড়িৎ প্রবাহ হবে এবং কেন?

(viii) একই দৈর্ঘ্যের কপারের একটি মোটা তার এবং একটি সরু তার আছে। বিভব-পার্থক্য স্থির থাকলে কোন্‌টির মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ বেশী হবে এবং কেন হবে?

(ix) দুটি তারের একটির রোধ 5 ওহম এবং অপরটির রোধ 10 ওহম। তার দুটির মধ্যে একই সময়ের জন্য 4 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ চালনা করলে কোন্‌টি বেশী উত্তপ্ত হবে কারণসহ উত্তর দাও।

(x) দুটি সমান দৈর্ঘ্যের তামার তারের, একটির প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল অপরটির দ্বিগুণ। তার দুটির দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্য একই হলে কোন্‌টিতে বেশী প্রবাহ হবে এবং কেন?

(xi) একই প্রস্থচ্ছেদের দুটি তামার তারের একটির দৈর্ঘ্য অপরটির তিনগুণ হলে এবং তার দুটির দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্য একই হলে, কোন্‌টিতে বেশী প্রবাহ হবে?

(xii) তড়িৎ-চুম্বকে এবং বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় তড়িৎ-প্রবাহের চুম্বকীয় ফল কিভাবে প্রযুক্ত হয়েছে বুঝিয়ে দাও।

(xiii) একটি চুম্বক-শলাকার উপরে, ওর দৈর্ঘ্য বরাবর একটি তামার তার রেখে—উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহ পাঠান হলে চুম্বকটির উত্তর মেরুর বিক্ষেপ কেমন হবে?—এই বিক্ষেপ হয় কেন? উত্তর মেরুটির বিক্ষেপের অভিমুখ কোন্ নিয়ম প্রকাশ করে?—নিয়মটি বল।

(xiv) তড়িৎ-কোষে, বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় এবং তড়িৎ-চুম্বকে কোন্ শক্তি কোন্ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়? হিটারে তাপশক্তির সৃষ্টি হয় কিভাবে?

(xv) বৈদ্যুতিক বাল্‌বে তড়িৎ-প্রবাহের কোন্ ফল প্রকাশ পায়?

[D] **দক্ষতামূলক :**

(i) সরল ভোল্টীয় কোষের একটি চিত্র অঙ্কন কর এবং তড়িদ্বার দুটিকে পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করে তড়িৎ-প্রবাহ ও ইলেকট্রন প্রবাহের অভিমুখ দেখাও।

(ii) একটি নির্জল কোষের ছবি এঁকে ওর বিভিন্ন অংশ লেবেল কর।

(iii) চিত্রসহ তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফল দেখাবার জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

(v) তড়িৎ-প্রবাহের চুম্বকীয় ফল দেখাবার জন্য চিত্রসহ একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

(v) একটি পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে বৈদ্যুতিক বাল্‌বের বিভিন্ন অংশগুলি দেখাও।

(vi) একটি লেক্লান্স সেলের চিত্র অঙ্কন করে ওর বিভিন্ন অংশগুলি দেখাও।

(vii) একটি চিত্রসহ বৈদ্যুতিক ঘণ্টার গঠন বর্ণনা কর।